শ্রদ্ধা-সিংহাসনারূঢ় হ'য়ে সঙ্গীতচর্চায় মেতে ছিলেন তখন তিনি ঘুণাক্ষরেও ভাবেন নি যে কাশীর বাসা উঠিয়ে কোলকাতায় এসে তাঁকে 'সঙ্গীত ভবন' খুলতে হবে। সনাতনী পন্থায় তাঁর আধুনিক কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করতে গিয়ে তাঁকে যে এত নাকাল হ'তে হবে এও তাঁর কল্পনাতীত ছিল। ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠল সুতরাং।

চিরকালই হচ্ছে। বামপন্থী ছেলেমেয়েদের হিতাকাঙ্ক্ষায় উদ্বাহু পিতামাতার দল চিরকালই ছুটে চলেছেন দক্ষিণ পথে। নাগাল পাচ্ছে না কেউ কারও। কিন্তু আকর্ষণ আছে, দুর্ণিবার আকর্ষণ......

ব্যাপারটাকে জটিলতর করে' তুলেছে বন্ধুবান্ধবের দল। দিবসের ট্রাম ড্রাইভার বন্ধু কিরণ, সূর্যকান্তের প্রধান মন্ত্রী গোবিন্দ, গহনচাঁদের আত্মীয় চুনীলাল না থাকলে এই দুই পরস্পর-আকৃষ্ট অথচ বিভিন্নমুখী দল হয়তো একটু কম দিশাহারা হতেন। কিন্তু এঁরা চিরকাল আছেন এবং থাকবেন। এবং থাকবেন সেই সব অনাত্মীয়-অথচ-পরম-আত্মীয় ব্যক্তিগণ। (সৌদামিনী এবং দিবসের সেই সাহেব প্রফেসারের মতো) যাঁরা অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে হাজির হবেন ঊনপঞ্চাশবায়ু-বাহিত হয়ে এবং আরও দিশাহারা করে' দেবেন ধূসরের দলকে।

আরও থাকবেন তাঁরা যাঁরা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, স্বার্থের স্নেহের অথবা খেয়ালের প্রেরণায় সেতু-নির্মাণের প্রয়াস পান দুই দলের মধ্যে। এ হিসেবে মেসের বাসিন্দা অঘোর-গোবর্দ্ধন-হরিদাস-ধূর্জ্জটির দলের সঙ্গে সারেঙ্গী রমজান বা তবলচি সীতারাম অথবা মকোর্দমা-প্রিয় হরলালের বিশেষ তফাৎ নেই। কিন্তু একটা মজার কথা এই যে এরা সেতু বাঁধতে গিয়ে পরিখা খনন করে' বসেন প্রায়ই। আঘাত করতে গিয়ে জাগিয়ে তোলেন সুর, সুর বাজাতে গিয়ে করে' ফেলেন আঘাত।

রঙ্গনা যেটাকে আঘাত বলে ভেবেছিল সেটা সুর হয়ে বেজে

উঠল তার জীবনে। ঊর্মি যেটাকে সুর বলে ভেবেছিল সেটা হয়ে গেল আঘাত।

সুরই আঘাত হয়ে বাজল এই কাহিনীরও প্রাথমিক পর্বে। সেই সরোদটা। তীরের মতো এসে বিঁধল যেন, সূক্ষ্ম ফাটল দিয়ে প্রবেশ করল অব্যর্থ-সন্ধী আলোক রেখার মতো বদ্ধ অন্ধকার ঘরে। শিউরে উঠল ঘরটা, চমকে উঠল, চটে' গেল শেষে। 'তুমি বদ্ধ তুমি অন্ধকার'—আলোক রেখার এই নিঃসন্দিগ্ধ নীরব বাণী অসহ্য হয়ে উঠল যেন তার পক্ষে। সে বদ্ধ? সে অন্ধকার? মিছে কথা। সত্যিই তার মনে হল মিছে কথা। মনে হল ওরা বাহাদুরি করছে, মনে হল ওরা হেরে যাবে, ভুল পথে চলছে, বাধা দেওয়াটা কর্তব্য তার। মনে হল……।

সুরটা শুনেও উকীল সূর্যকান্তবাবু তাঁর বিদেশাগত মক্কেল হরলালকে মকোর্দমা সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়ে যেতে লাগলেন, যেন কিছুই হয় নি। যেন-কিছুই-হয়-নি ভাবটা মুখভাবে প্রস্ফুট রাখিবার কৌশল (বা দক্ষতা) সূর্য চৌধুরির এমন আয়ত্ত ছিল যে তাঁর নিতান্ত পরিচিত গোবিন্দ সাণ্ডেল এবং পুরাতন ভৃত্য ব্রজও সে ভাব-ব্যূহ ভেদ করে' তাঁর মানস-লোকে প্রবেশ করতে পারত না সব সময়।

"দেখুন এ মকোর্দমা জিততে হলে গোটা কয়েক মিথ্যে সাক্ষী জোগাড় করতে হবে।"

ফাইলে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে যন্ত্রচালিতবৎ বলে' গেলেন তিনি কথাগুলো। হরলালের চোখে মুখে শৃগাল-সুলভ যে ভাবটা ফুটে উঠল তা লক্ষ্য করলেন না তিনি। বরং পরমুহূর্তেই চোখ তুলে উন্মুক্ত বাতায়ন পথে তাঁর দৃষ্টি যা দেখতে পেল (ওটা অনেকদিন থেকেই আছে, এতদিন

দেখতে পান নি তিনি) এবং তাঁর মনে যে চিন্তাধারার পত্তন করল তার সঙ্গে হরলাল বা তার মকোর্দমার কোনও সম্পর্ক নেই। আবার তাঁর দৃষ্টি ফাইলে নিবদ্ধ হল যদিও কিন্তু তিনি যা দেখতে লাগলেন এবার তা ফাইলের লেখা নয়। যে সবুজ কচি অশ্বথ চারাটা চোখে পড়েছিল তাঁর ক্ষণকাল পূর্বে সেইটের সঙ্গে ভিত্তি-বিদারী একটা ফাটলের ছবিও ফুটে উঠেছিল তাঁর মানসপটে। তিনি সংকিত দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন সেই ফাটলটার দিকে। যে ভিত্তির উপর তাঁর এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের কীর্তিসৌধ মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে আছে প্রায় এক শতাব্দী ধরে', পাশ্চাত্য সভ্যতার পাকা ইঁট আর বাঙালী প্রতিভার সিমেণ্টে দুর্ভেদ্য মনে হয়েছিল যে বস্তুটাকে, যার উপর উঠেছে কত রকম ইমারত, চাকরির, পেশার, বিদ্যার, বুদ্ধির—হঠাৎ সেই ভিত্তিটার একধারে ফাটল দেখা দিয়েছে······সুরটা বাজতেই লাগল পাশের ঘরে······মনে হ'তে লাগল সুর নয়, অশ্বথ চারা, ছোট, কচি, কিন্তু শক্তিমান······

"উপড়ে ফেলতে হবে"—কথাগুলো উচ্চারণ করেই লজ্জিত হয়ে পড়লেন সূর্য চৌধুরি।

—"আজ্ঞে ?"—বিস্মিত হরলাল প্রশ্ন করলেন আবার।

—"মিথ্যে সাক্ষী চাই কয়েকটা।"

—"মিথ্যে সাক্ষী ?"

—"হ্যাঁ, মশাই। অনেক সময় মিথ্যে সাক্ষী না দিলে সত্যি কথাও প্রমাণ করা যায় না আদালতে।"

অনাবশ্যক জোর দিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করেই আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন সূর্য চৌধুরি। জানলা দিয়ে আবার চাইলেন বাইরের দিকে। অশ্বথ চারাটা হাসছে যেন হাওয়ায় দুলে দুলে।

হঠাৎ মনে হল দিবসকে চেনেন না তিনি। রোজ দেখছেন তবু

চেনেন না। চেনবার কোনও চেষ্টাই করেন নি এতদিন, প্রয়োজন হয় নি। মাটির উপর রোজ নিশ্চিন্ত-চিত্তে চলা-ফেরা করে সবাই। মাটিকে চেনবার তাগিদ থাকে না, প্রয়োজন থাকে না তার নিচে কি আছে জানবার। ভূমিকম্প হয়ে যাবার পর সে আগ্রহটা জাগে। আবিষ্কৃত হয় ধৈর্যের প্রতিমূর্তি আপাত-শীতল মাটির বুকের ভিতরও আগুন আছে, আকাশচুম্বী পর্বতশিখরের দুর্ভেদ্য শিলাকে চৌচির করে' মূর্ত হয়ে উঠতে পারে যা আগ্নেয়-গিরিতে যে কোনও মুহূর্তে……

……পথ চলতে চলতে অপ্রত্যাশিতভাবে বৃষ্টি এসে পড়লে গম্ভীর পথিকও যেমন বিব্রত হয়ে ছুটতে থাকে (বিশেষত ছাতা না থাকে যদি) সূর্য চৌধুরি তেমনি মনে মনে ছুটছিলেন, হোঁচট খেলেন হঠাৎ এক-জায়গায়।……কিরণ, দিবসের বন্ধু কিরণ, কোথায় থাকে ছোকরা তাও তো জানি না, ছোকরা কবি শুনেছি, দিবসের সঙ্গে পড়ত, কিরণই দিবসকে সরোদের হুজুকে মাতিয়েছে…এই ধরনের নানা এলোমেলো চিন্তা প্রস্তরীভূত হয়ে উঠল যেন হঠাৎ, হোঁচট খেলেন তাতে।…… তারপর সন্তর্পণে অন্ধকার একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন যেন নামহীন অবাস্তব একটা ঘরের দিকে যেখানে দিবস ষড়যন্ত্র করছে প্রচলিত ভিত্তির বিরুদ্ধে…সঙ্গে কিরণ আছে কি?…তৈরি করছে সুরের হাতুড়ি!

……হঠাৎ মনে পড়ল গোবিন্দ সাণ্ডেলকে, তাঁর আবাল্য বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলকে যাঁর চতুর্ভুজাকৃতি চিবুকের নিম্নতম বাহুটি উভয় দিকে প্রসারিত হয়ে কর্ণস্পর্শী হয়ে উঠেছে প্রায়। আপদে বিপদে যে গোবিন্দ সাণ্ডেল নির্ভরযোগ্য পরামর্শ দিয়ে এসেছেন এতকাল, তাঁর বলিষ্ঠ মুখটা মনে পড়ল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সুইচ টিপে দিলেন হরলাল আবার।

—"ক'টা মিথ্যে সাক্ষী চাই?"

"—গোটা তিনেক অন্তত।"

—"আচ্ছা, তাই চেষ্টা করি গিয়ে তাহলে। কোর্টে কি বলতে হবে তাদের ?"

—"সে আমি শিখিয়ে দেব। আপনি তাঁদের এইখানেই নিয়ে আসবেন।"

—"আচ্ছা তাই আনব। আমি উঠি এবার ?"

—"আপনি উঠেছেন কোথায় ?"

—"যে মেসটায় আমি বরাবর উঠি তাতেই উঠেছি।"

—"অসুবিধা হলে এখানেও থাকতে পারেন।"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে জোর তো আছেই।"

......সরোদটা বাজছিল পাশের ঘরে, সূর্য চৌধুরি আবার ছুটছিলেন মনে মনে, হঠাৎ ঊর্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলেন তিনি। সুরের শিলাবৃষ্টি হয়ে গেল যেন। দুনে উদ্দাম হয়ে উঠল গৎটা।

মুচকি হেসে সমঝদারের মতো মাথা নেড়ে হরলাল খোশামোদ করবার প্রয়াস পেলেন একটু।

—"দিবুবাবু বাজাচ্ছেন বুঝি, বাঃ, খাশা হাত হয়েছে তো !"

আশানুরূপ ফল কিন্তু ফলল না। সূর্য চৌধুরির কুঞ্চিত ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল এবং নাসারন্ধ্রপথে যে 'হুঁ'টি ছট্‌কে বেরিয়ে এল সেটি তপ্তগুলির মতো মনে হল হরলালের। নমস্কারান্তে ছাতাটি বগলে নিয়ে স্লুট করে' বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সূর্য চৌধুরি গুম্ হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হচ্ছিল যে তিনি ফী'য়ের টাকাগুলোর দিকেই সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কিন্তু আসলে ঢুকে পড়েছিলেন তিনি 'গ্রীনরুমে' অর্থাৎ সাজঘরে, নিজের অজ্ঞাতসারেই। অপমানিত অভিভাবকের ভূমিকায় অভিনয় করতে হলে যে ধরণের সাজসজ্জা প্রয়োজন তাই নিয়েই ব্যস্ত

হয়ে পড়েছিলেন। আমরা সকলেই যে স্বপ্নরঙ্গমঞ্চে অভিনেতা মাত্র এই বৈদান্তিক বোধ সব সময়ে আমাদের মনে জাগরূক থাকে না সম্পূর্ণরূপে, সূর্য চৌধুরিরও তা ছিল না। তাছাড়া এক্ষেত্রে আর একটা গোল হল। যে সরোদ নিয়ে দিবসকে মাতামাতি করতে মানা করেছেন তিনি—সেই সরোদে এই দুপুর বেলা পাশের ঘরে বসে অমন একটা তুফান-তোলা গৎ বাজানোর অর্থ তাঁকে অপমান করা এই অলীক ধারনার ঢিলটা অহংকার-সর্পের গায়ে লাগবামাত্রই ফোঁস করে উঠল সেটা এবং সেই তর্জনের নেশায় নিমেষে এমন অভিভূত হয়ে পড়লেন তিনি যে স্বকীয় অন্তর্নিহিত আসল সত্তাটার (যে সত্তা বহির্জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপকে স্বপ্ন বলেই জানে) দিকে মনোযোগ দেবার আর অবসর পেলেন না। অর্থাৎ অজ্ঞাতসারেই রঙ্গমঞ্চে নূতন ভূমিকায় নেবে পড়লেন এবং রুষ্টকণ্ঠে হাঁক দিলেন—"ব্রজ—"

তাঁর অন্তর্নিহিত আসল সত্তাটার সম্বন্ধে তিনি যে বরাবর উদাসীন থাকতে পারেন নি এর বহু প্রমাণ পরে পাওয়া যাবে, কিন্তু তাঁর এই রুষ্ট কণ্ঠস্বরের মধ্যেই ব্রজ কি করে' যে সে সত্তার আমেজ পেলে তা ব্রজই জানে। পুরাতন ভৃত্যদের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে বোধ হয় যা দিয়ে তারা মনিবের স্বরূপটা ঠিক ধরতে পারে যে কোনও অবস্থায়।

রুষ্ট আহ্বানের উত্তরে ব্রজ তাই হন্তদন্ত হয়ে এল না। খুব ধীরে-সুস্থেই এল।

—"কিছু বলছ?"

ব্রজ সূর্য চৌধুরির বাপের আমলের চাকর। সূর্যকে বালক অবস্থায় দেখেছে, মাতৃহীন দিবসকে মানুষ করেছে। সুতরাং সূর্য চৌধুরিকে অসঙ্কোচে সে 'তুমি' বলে।

—"দিবুই বাজন! বাজাছে নাকি ও-ঘরে?"

—"হ্যাঁ।"

—"কলেজ যায় নি ?"

—"কই না তো। খায়ও নি সকাল থেকে কিছু। কি যে এক বাজনা কিনে দিয়েছ ওকে, দিনরাত ওই নিয়ে আছে।"

—"কলেজ যায় নি কেন ?"

—"ও তো বলছে কলেজে আর যাবে না, উকীল হওয়ার ওর ইচ্ছে নেই।"

—"ইচ্ছেটা কি তাহলে ?"

—"তা তো জানি না !"

যেমন নির্বিকারভাবে এসেছিল তেমনি নির্বিকারভাবে চলে গেল ব্রজ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল, রিটায়ার্ড গভর্নমেণ্ট অফিসার গোবিন্দ সাণ্ডেল। তাঁর ধারনা তিনি সূর্যকান্তের বন্ধু ও বিবেক-রক্ষক। বর্ণ-চোরা আম বলে' যাঁরা এ জাতীয় লোকেদের বর্ণনা করেন তাঁরা ঠিক সুবিচার করেন না। আমের প্রতিও না এঁদের প্রতিও না। কড়া পাকের সন্দেশ বললেও ঠিক হয় না। এদের পাকটা যে কড়া সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এরা ঠিক সন্দেশ নন। এঁরা মাধুর্যের অধিকারী (না হলে সূর্যকান্তের মতো লোক আকৃষ্ট হয়েছেন কেন) কিন্তু তা সরল মিষ্টতা নয়। কড়া সিগার বা বিলিতি চীজের সঙ্গে উপমিত করলে এঁর চরিত্রের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়, তাও ঠিক পাওয়া যায় না, কারণ এঁদের উপমা এঁরা নিজেরাই। মেকি চার্চিল-মার্কা উদ্ধত মনোভাবের মুখে বহু সাহেবের পাদুকা প্রহারের চিহ্ন ঢাকবার জন্যে যাঁরা মুখোস পরেছেন নানারকম সারা জীবন ধরে', যাঁদের শাস্ত্রে বাঙালীত্ব বজায় রাখবার একমাত্র মন্ত্র অবাঙালীদের তাচ্ছিল্য করা, নিজের মহত্ত্ব বজায় রাখবার উপায় অপরকে হীন চক্ষে দেখা এবং কথায় কথায়

প্রতিবেশীদের উপর টেক্কা দিয়ে ঈর্ষার বীজ বপন করা, মূর্খ হয়েও যারা সবজান্তা সেজে কাটিয়েছেন, নির্ধন হয়েও ধনীর চাল বজায় রেখেছিলেন যাঁরা চাকরি-জীবনে এবং চাকরি-শেষে সে চাল বজায় না রাখতে পেরে নির্মম বাজেটের দাঁড়িপাল্লার উপর সন্তর্পণে চড়ে' বসে আছেন যাঁরা, এক কথায় তাঁদের বর্ণনা করা শক্ত। ইংরেজি 'চীজ' বললে যা বোঝায় তা এরা নন ঠিক, হিন্দি চীজ 'শব্দটি' বরং বেশী লাগসই এঁদের সম্বন্ধে। খুব বেশী লোকের সঙ্গে সত্যিকার বন্ধুত্ব এঁদের হয় না। কারণ এঁদের চরিত্রের নিগূঢ় মাধুর্য অধিকাংশ লোকেরই মর্মগোচর হয় না, তাছাড়া এঁদের চারিদিকে এমন একটা বর্ম থাকে যা অধিকাংশ লোকের পক্ষে দুর্ভেদ্য। কিন্তু যদি কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে' যায় এঁদের দৈবাৎ, তাহলে বিলিতি পাকা রঙের মতোই নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে তা। সূর্য চৌধুরির সঙ্গে গোবিন্দ সাণ্ডেলের বন্ধুত্ব জমেছিল।

দিবস উকীল হ'তে চায় না ব্রজর মুখে এই কথা শুনেই সব গুলিয়ে গিয়েছিল সূর্য চৌধুরির। যে সম্ভাবনাটা মনের ভিতর লুকিয়ে ছিল সেটা হঠাৎ মূর্ত হয়ে উঠল যেন—'হায় হায় কেটে গেল বুঝি ঘুড়িটা অমন মানজা দেওয়া সত্ত্বেও' গোছের একটা সংকিত ক্ষোভের দাপটে তাঁর সমস্ত চিন্তাধারা নিরবয়ব হয়ে পড়ল যেন মুহূর্তের মধ্যে। গোবিন্দ সাণ্ডেলকে পেয়ে বেঁচে গেলেন তিনি যেন, মনে মনে ছুটে এলেন তাঁর দিকে, অকুল সমুদ্রে ভেলা দেখতে পেলেন যেন একটা। ছুটে আসবার আর একটা কারণও ছিল, নিমিষের মধ্যে আর এক কাণ্ডও করেছিলেন তিনি, অতীতে ফিরে গিয়েছিলেন, নিজের সেই অর্ধবিস্মৃত যৌবনলোকে···রাজপুত্র প্রবীরের দিকে চেয়েছিলেন সবিস্ময়ে, মাথায় উষ্ণীষ, গায়ে জরিদার মখমলের পোষাক, বাম স্কন্ধে বিলম্বিত ধনু, ললাটে তিলক···। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য কথা,

তিনিই প্রবীর সেজেছিলেন একদিন পিতার নিষেধ তুচ্ছ করে'। অবলুপ্ত ছবিটার দিকে অবিশ্বাস ভরে' চেয়েছিলেন তিনি, স্নিগ্ধরস ধারায় কোমল হয়ে আসছিল মনটা, এই সময় গোবিন্দ সাণ্ডেল না এসে স্বয়ং দিবস যদি আসত তাহলে এ কাহিনীর চেহারা অন্য রকম হয়ে যেত হয়তো। কিন্তু গোবিন্দ সাণ্ডেল এলেন এবং তাঁকে দেখেই সূর্য চৌধুরি পালিয়ে এলেন স্বপ্নলোক থেকে।

……পাশের ঘরে সরোদটা তখনও বাজছিল, যে সরোদের ভগ্ন-মূর্তি পরে ব্যথিত করেছিল ব্রজকে, লুকোচুরিতে প্রবৃত্ত করেছিল গম্ভীর সূর্যকান্তকেও, সেই সরোদটা বেজে চলেছিল তখনও…

গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখে নয় চোখে ফুটে উঠল একটা ভাষা। 'ও বাবা একি আবার'-গোছ ভাবের সঙ্গে সকৌতুক বিদ্রূপই শুধু ছিল না তাতে 'বেফাঁস কিছু না বলে' চুপটি করে' মজা দেখা যাক দূর থেকে দাঁড়িয়ে'—এই ধরনের একটা আভাসও ফুটে উঠেছিল ভাষাভরা সে অপরূপ চাহনিতে। দিবসের আধুনিক চাল-চলন সম্বন্ধে যতটুকু সংবাদ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন (এবং বেশ কিছু করেছিলেন; কারণ পরের সম্বন্ধে নানাবিধ রোচক সংবাদ সংগ্রহ করার যে পারদর্শিতা তাঁর ছিল তা আধুনিক যুগের টিকিট সংগ্রহ করার পারদর্শিতার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়) তাতে দূর থেকে দাঁড়িয়ে মজা উপভোগ করবার মতো যথেষ্ট উপকরণ যে নিশ্চয়ই আছে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল।

বাপের কানের পাশে সরোদের গৎ বাজানোটা যে দিবসের আধুনিকতার একটা লক্ষণমাত্র এটা বুঝাতে দেরি হয় নি গোবিন্দ সাণ্ডেলের। সূর্য চৌধুরিরও হয় নি, যদিও তিনি এই অবিশ্বাস্য জ্ঞানটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করছিলেন প্রাণপণে। "পেশা হিসেবে

ওকালতি ব্যাপাটার সার্থকতা আমি আর দেখতে পাচ্ছি না ভবিষ্যৎ সমাজে। ভবিষ্যৎ ভারতের প্রচেষ্টা হবে সব রকম ঝগড়া নিবারণ করা, ঝগড়াকে অবলম্বন করে' পয়সা রোজকার করা নয়"—অনেকদিন-পূর্বে উচ্চারিত দিবসের এই কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু শুনতে চাইছিলেন না। সরোদের গৎ ভেদ করে' তবু ভেসে আসছিল কথাগুলো, রুষ্টতর করে' তুলছিল তাঁকে। তিনি যে দিবসের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে রুষ্ট হচ্ছিলেন তা নয়, রোষের আসল কারণ তিনি অপমানিত বোধ করছিলেন এতে। যে ঠুনকো সম্মানের পোষাক পরে' তিনি সগৌরবে সামাজিক মর্যাদা কুড়িয়ে এসেছেন এতদিন সেই পোষাকটার গায়ে কাদা লাগিয়ে দিয়েছে দিবস যেন তাঁর মনে হচ্ছিল। তিনি কল্পনানেত্রে দেখছিলেন যে দিবস—তাঁর একমাত্র ছেলে দিবস—মুখে না বললেও মনে মনে তাঁকে অশ্রদ্ধা করছে এই ওকালতি পেশার জন্য, যে পেশার ভিত্তি, দিবসের মতে, মনুষ্যত্ব নয়, পশুত্ব। কি মূর্খতা! এই মূর্খতার কথাটা কিন্তু মুখ ফুটে তিনি বলতে পারেন নি দিবসকে, বলবার সাহস সংগ্রহ করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, (সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার এইটেই এবং এইটেই সূর্য চৌধুরির বিশেষত্বও), দিবসকে তিনি জোর করে' ল' ক্লাসে ভরতি করে' দিয়ে মনে মনে অপরাধী হয়েছিলেন যেন। তাঁর বারবার মনে হচ্ছিল নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, বৃদ্ধবয়সে দিবসকে নিজের নির্ভরযোগ্য অবলম্বন করবার জন্য, তিনি যেন তাঁকে তার বিবেকের বিরুদ্ধে আটকে রাখতে চাইছেন জোর করে'। "না না দিবসকে তিনি উকীল করতে চাইছেন তার নিজের ভালর জন্যেই। নিতান্ত ছেলে মানুষ, দুনিয়ার ও বোঝে কি, রিসার্চ করে' ক'টা পয়সা পাবে ও এ বাজারে—তাছাড়া যে দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নানাবিধ সংকীর্ণতার বিষ জর্জরিত করে' রেখেছে আবহাওয়াকে সে দেশে

বিজ্ঞানের গবেষণা হওয়া সম্ভব না কি! এখানে সব জায়গাতেই তো ক্লিক্‌—" এই সব কথা আর একবার মনে মনে আউড়েও সাহস সংগ্রহ করতে পাচ্ছিলেন না তিনি। তাঁর হঠাৎ-ক্রুদ্ধ দৃষ্টির শিখা ম্লান হয়ে আসছিল, এমন সময় প্রিয় বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলের দর্শন পেয়ে অকুল সমুদ্রে কুল পেলেন তিনি যেন সহসা।

—"কি খবর?"

গোবিন্দ সাণ্ডেলের এই তুচ্ছ কথা দু'টিই যেন প্রচুর সাহস সঞ্চার করলে তাঁর মনে। প্রদীপ্ততর হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি।

"—খবর? খবর ওই শোন না"—বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিলেন পাশের ঘরটা।

টং টং টং টং টং মনের আনন্দে সরোদ বেজে চলেছিল। ভাষা-ভরা চক্ষু নিয়ে পাশের কৌচটায় বসলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল। পা দোলাতে লাগলেন সূর্য চৌধুরি। গোবিন্দ সাণ্ডেলের স্থূল উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে' মনে মনে কিন্তু তিনি দিবসের সঙ্গেই কথা বলতে লাগলেন কল্পনায়।

"এটা প্রত্যাশা করি নি তোমার কাছে। আশা করি নি যে লেখা পড়া শিখেও অবাধ্য হবে তুমি।"

"অবাধ্য? কই না! সরোদ বাজাতে আপনি মানা করেন নি তো?"

"ব্রজর কাছে তুমি না কি বলেছ যে উকীল হওয়ার তোমার ইচ্ছে নেই?"

"তা নেই।"

কাল্পনিক কথাবার্তা এর বেশী আর এগোল না। এই কাল্পনিক 'তা নেই'-এর বিরুদ্ধে কল্পনাতে তিনি কিছু বলতে পারলেন না। সরোদটা সমানে বেজে যেতে লাগল।

—"বাবাজি আজকাল বাজনা নিয়ে খুব মেতেছেন বুঝি? ভাল!"

টোপটি ফেলে উৎসুক হয়ে বসে' রইলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল। দিবসের সম্বন্ধে সূর্যকান্তর দুর্বলতার কথা অবিদিত ছিল না তাঁর। সুতরাং বেশী কিছু বলা সমীচীন মনে করলেন না। সরোদ কিনে দিতে আগেই মানা করেছিলেন তিনি। এখন……!

সূর্য চৌধুরি কিন্তু কোনও উত্তর দিলেন না, তিনি কাল্পনিক 'তা নেই'-এর উত্তরটা ভাবছিলেন পা দোলাতে দোলাতে। কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে গোবিন্দ সাণ্ডেল নিজের কেশবিরল মস্তকে হাত বুলোলেন একবার। আড় চোখে সূর্য চৌধুরির দিকে চাইলেনও একবার।

—"আমিই অবশ্য বাজনাটা ওকে কিনে দিয়েছি"—সূর্য চৌধুরি বললেন সে চাউনির উত্তরে।

—"তা তো জানি।"

—"কিন্তু ও যে ও নিয়ে এতটা মেতে উঠবে তা ভাবিনি"—প্রিয় বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখভাবে বিদ্রূপের আভাস দেখে থেমে গেলেন একটু তিনি, তারপর আর একটু থেমে শেষ করলেন কথাটা—"কলেজ না গিয়ে সরোদ বাজাচ্ছে, দেখ দিকি কাণ্ড!"

গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল সহসা বিদ্রূপের আভাসটা। বস্তুত, আভাস রইল না তা আর প্রকাশ হয়ে পড়ল, আর তা লক্ষ্য করবামাত্র সশস্ত্র হয়ে উঠলেন সূর্য চৌধুরি মনে মনে।

—"বাজনা জিনিসটা খারাপ নয়, বুঝলে, কিন্তু মা সরস্বতীর দক্ষিণ হস্তের ওই ব্যাপারটি মা সরস্বতীকেই মানায়। আমাদের মতো সাধারণ লোকেরা ও নিয়ে বেশী মাতামাতি করতে গেলেই আমাদের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটি বন্ধ হয়ে যায়, বিশেষত আমাদের দেশে।"

ঠিক এই মুহূর্তে সূর্য চৌধুরির মনে যা হচ্ছিল তা জানতে পারলে চমকে যেতেন রিটায়ার্ড গভর্নমেণ্ট অফিসার গোবিন্দ সাণ্ডেল। হঠাৎ তাঁর, মানে সূর্য চৌধুরির, অন্তরাত্মা (যা কখনও মরে না, যাতে

কখনও মরচে ধরে না, যা সমস্ত পাঁক পলি ঠেলে কমলের মতো বেরিয়ে পড়ে মাঝে মাঝে) আত্মপ্রকাশ করল তাঁর দৃষ্টির ভিতর দিয়ে। প্রিয় বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলকে তিনি শঠ, জুয়াচোর, ঘুষখোর, মূর্খ, খোশামুদে অহঙ্কারী, পাজি, ঝুনোনারকেল-রূপে প্রত্যক্ষ করলেন সহসা। ক্ষণকালের জন্য কিন্তু। তারপর মুহূর্তেই আবার চলে গেলেন তিনি দিবসের কাছে। ভাবতে লাগলেন দিবস কি···কিন্তু ভাববার দরকার হল না···তিনি নিঃসংশয় হলেন যে দিবসকে নোয়ানো যাবে না, কিছুতেই নিজের মত পরিবর্তন করবে না ও। পুত্রের মুখখানা মানসনেত্রে দেখতে লাগলেন। অসাধারণ নয়, কিন্তু বিশিষ্ট, চরিত্রের ছাপ আছে। নোয়ানো যাবে না। অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগলেন। প্রিয় বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলের দিকে চাইলেন আবার। মনে হল, হোক ঝুনো নারকেল, তবু এই লোকটাই নির্ভরযোগ্য।

"কলেজ না গিয়ে সরোদ বাজাচ্ছে, মানে? ওকালতি আর পড়বে না?"

"না।"

"তার মানে?"

মানেটা কিন্তু স্পষ্ট করে খুলে বলতে পারলেন না সূর্য চৌধুরি। আসল কথাটা চেপে গেলেন। সবুজ প্রাণের দুঃসাহসকে তিনি যে আমল দেন নি, তাকে যে রিসার্চ করতে বাধা দিয়েছিলেন, এ কথাটা ঝুনো নারকেল গোবিন্দ সাণ্ডেলের কাছেও স্বীকার করতে বাধল তাঁর। গোড়াগুড়িই বেধেছিল। গোবিন্দ সাণ্ডেলকে এ কথা তিনি একবারও বলেন নি। প্রিয় বন্ধুর কাছে থেকেও অনেক সময় অনেক কথা গোপন করতে হয়। কিন্তু এই বিশেষ কথাটি গোপন করে' তিনি যে আত্ম-পরিচয় দিয়েছিলেন তা যদি দিবস জানতে পারত তাহলে সে হয়তো অমন হঠকারিতা করত না।

"বুঝলাম না ঠিক, গান বাজনাকেই ও পেশা করতে চায় না কি তাহলে?"

"হয়তো "

ঠিক এইখান থেকেই উপলক্ষটা বড় হয়ে উঠতে লাগল, প্রায় ডাল-পালা বিস্তার করে' ক্রমশ আবৃত করে' ফেলল লক্ষ্যকে। ধূসর-পক্ষ সরোদটাকেই বড় করে' দেখলেন এবং সবুজ-পক্ষের জীবনেও তা ঘটনা-চক্রে বড় হয়ে উঠল কিছুদিনের জন্য। রঙ্গনা প্রভৃতির অভ্যাগমে জটিলও হয়ে গেল একটু। দিবসের আন্তরিক আকুতি ইপ্সিত পথে বাধা পেয়ে ভিন্ন খাতে বইল কিছু দিন।

"দিবুকে তো অত বোকা মনে হয় না"—মন্তব্য করলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল, "উকীল হয়ে বসলে তোমার তৈরি প্র্যাকটিসটা পেত এটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি ওর আছে বলেই তো বিশ্বাস করি।"

"কি জানি ভাই আজকালকার ছেলেদের মতিগতি বুঝতে পারি না" —মামুলি ফরম্যুলাটা আওড়ালেন সূর্য চৌধুরি।

গোবিন্দ সাণ্ডেল মাথায় হাত বুলোলেন। তারপর একটু থেমে বললেন, "ভিতরে অন্য ব্যাপার আছে—নিশ্চয় কিছু। খোঁজ কর।"

"অন্য ব্যাপার মানে?"

"তাতো জানি না, খোঁজ কর সেটা।"

অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়লেন গোবিন্দ সাণ্ডেল। যে দিবসকে তিনি চেনেন তার সঙ্গে ঘটনাটা কিছুতেই মেলাতে পারছেন না যেন।

"কি ধরনের ব্যাপার সন্দেহ করছ তুমি?"—সূর্য চৌধুরির কণ্ঠস্বরে একটু ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেল।

"সন্দেহ?"

উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলেন তিনি একবার বাইরের দিকে, যেন জানলার বাইরেই প্রশ্নটার উত্তর মূর্ত হয়ে আছে। জানলার বাইরে

কেউ নেই দেখে কিন্তু হতাশ হলেন তিনি, আশ্বস্ত হলেন। নিম্নকণ্ঠে বললেন, "দেখ গান-বাজনার সঙ্গে প্রায়ই যে জিনিসটা জড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তা, প্রায়ই, মানে হ্যাপি হয় না। বিশেষত আমাদের মতো মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের পক্ষে। পাখিরা গান গায় কখন জান? ব্রিডিং সিজনে।"

হঠাৎ ধস্ ভেঙে সূর্যকান্ত পড়ে গেলেন যেন খরস্রোতা নদীর আবর্তে। উত্তাল তরঙ্গমালার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তলিয়ে গেলেন যেন ক্ষণকালের জন্য, আবার উঠলেন, আবার সাঁতরাতে লাগলেন প্রাণপণে,—হঠাৎ দূরে দ্বীপ দেখতে পেলেন একটা, চেনা দ্বীপ, সাঁতরে গিয়ে উঠলেন সেখানে। কিরণ।

"মানুষের বেলায় ও কথা সত্যি কি সব সময়ে?"—চেনা দ্বীপে উঠে আশ্বস্ত সূর্যকান্ত বললেন মুখে হাসি টেনে—"তাছাড়া দিবু গান শিখছে তার বন্ধু কিরণের কাছে। তুমি যা ভাবছ তা নয়।"

"কিরণ? কোন কিরণ? সেই ট্রাম ড্রাইভারটা না কি! তার সঙ্গে দিবসের বন্ধুত্ব আছে?"

"কলেজে একসঙ্গে পড়েছিল যে। খুব বন্ধুত্ব দু'জনে। ওই তো সরোদের হুজুকে মাতিয়েছে ওকে।"

ভাষা-ভরা হয়ে উঠল গোবিন্দ সাণ্ডেলের দৃষ্টি। 'এই সেরেছে'র সঙ্গে 'তাহলে-তো-যা-ভাবছিলাম-তাই'-এর একটা হৃষ্ট সম্মিলন জলজ্বল করতে লাগল তাঁর চোখে।

"কিরণ ছেলে কিন্তু খুব ভাল। খুব আত্মসম্মান বোধ আছে, বেশ ভদ্র, তাছাড়া—"

যদিও কিরণের সম্বন্ধে তেমন বিশেষ কিছু জানতেন না তিনি, সে কোথায় থাকে সে ঠিকানাটা পর্যন্ত জানতেন না, তবু যতটুকু জানতেন তাতেই রং চড়িয়ে বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু গোবিন্দ সাণ্ডেলের চোখের

দিকে চেয়ে দমে গেলেন তিনি। থেমে গেলেন। আমতা আমতা করে' কেবল বললেন, "না, না তুমি যা ভাবছ তা নয়।"

"আমি স্বচক্ষে কিন্তু সেটা দেখেছি"—মৃদু হেসে বললেন গোবিন্দ সাণ্ডেল এবং বলেই থেমে গেলেন। অভিজ্ঞ লোকেরা চট করে' পুরো কথাটা বলেন না, অভিজ্ঞতার জটে কথাগুলো আটকে যায় বোধ হয়, এবং যতটুকু বলেন তা অনন্ত সম্ভাবনার ইঙ্গিতে শ্রোতাকে যখন দিশাহারা করে' তোলে তখন জট খুলতে খুলতে সেটা উপভোগও করেন তাঁরা। অর্থাৎ কথা কইতে কইতেও তাঁরা দাবা খেলেন।

গোবিন্দ সাণ্ডেল ওইটুকু বলেই মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। উৎকণ্ঠিত সূর্য চৌধুরি প্রশ্ন করলেন, "কি দেখেছ স্বচক্ষে ?"

জানলার দিকে আর একবার চকিতে দৃষ্টিপাত করে' এবার পুরো উত্তরটাই দিলেন গোবিন্দবাবু। অবশ্য নিম্নকণ্ঠে।

"আমাদের পাড়ায় উর্মি বলে' একটা বখা মেয়ে আছে, নেচে নেচে বেড়ায় চারদিকে। তোমার ওই কিরণের সঙ্গে প্রায়ই দেখতে পাই তাকে পথে ঘাটে। সেদিন দেখি একটা রিকশা চড়ে' আসছে দু'জনে!"

বখা মেয়ে! সর্বনাশ! দিবসের বন্ধু কিরণের সঙ্গে রিকশা চড়ে বেড়ায়? ভীতি-বিহ্বল বিস্ফারিত নেত্রে চেয়েছিলেন যদিও তিনি গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখের দিকে, কিন্তু তাঁর পরবর্তী কথাগুলো আর কানে ঢুকছিল না সূর্য চৌধুরির। তিনি কল্পনায় পুনরায় দিবসের কাছে চলে গিয়ে তার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

"কিরণ না কি উর্মি বলে' একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়?"

"বেড়ায় শুনেছি। তাতে হয়েছে কি!"

"ও রকম ভাবে একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোটা কি ভাল?"

"ক্ষতি কি?"

কল্পনায় দিবসের মুখে এই সম্ভাব্য উত্তরটা শুনে সূর্য চৌধুরির চক্ষু আরও বিস্ফারিত হয়ে গেল। কল্পনাতেও এর প্রতিবাদ করবার মতো জোর খুঁজে পেলেন না তিনি। তাঁরও মনে হল, সত্যিই তো, একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে ক্ষতি কি। তারপর হঠাৎ তিনি শ্রবণশক্তি ফিরে পেলেন আবার। শুনলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল বলে চলেছেন, "ধরে নিলুম না হয় কিরণ ভাল ছেলে এবং দিবস তার কাছেই গান-বাজনা শিখছে, কিন্তু আমি গোড়ায় যে কথাটা বলেছিলুম সেটা তুমি উড়িয়ে দিতে চাইলেও উড়িয়ে দেবার মতো নয়। দিবস যার কাছেই গান বাজনা শিখুক তাতে এসে যায় না কিছু, আমি যে কথাটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে গান-বাজনা জিনিসটাই একটু 'সেক্সি'। অত কথায় কাজ কি, খোদ সরস্বতীর পৌরাণিক কাহিনীটাই মনে ক'রে দেখ না। আমরা গরীব গুরবো মানুষ, আমাদের কি ও সব সরোদ ফরোদ পোষায় ভায়া। শাক ভাতের ব্যবস্থা করতেই নাজেহাল হ'তে হবে আমাদের। আমার পরামর্শ যদি শোন, প্রশ্রয় দিও না ও সব।"

কথাটা খুবই সমীচীন মনে হল' সূর্য চৌধুরির, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দিবসের মুখটা মনে পড়ে গেল···নাঃ, কিছুতেই নোয়ানো যাবে না ওকে।

"কি করব বল"—ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন সূর্য চৌধুরি।

"সিট্ অন্ হিম," হঠাৎ ইংরেজি ভাষায় উপদেশ দিলেন সাণ্ডেল মশাই।

"তাঁর মানে?"

"রাশ টেনে ধর হে। এই সোজা কথাটা বুঝতে পারছ না?"

হঠাৎ একটা অদ্ভুত উপমা মনে এল সূর্য চৌধুরির।

"পারছি না। পাহাড় ফেটে যখন ঝরণা বেরোয় তখন তার রাশ টেনে রাখতে পার তুমি?"

"পারি বই কি"—একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই উত্তর দিলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল—"মানুষ চিরকালই পারছে। বাঁধ দেওয়া ব্যাপারটা খুব নতুন নয় তো।"

বাঁধ! দিবসের চারিদিকে বাঁধ দিতে হবে! বিরাট একটা কংক্রিটের দেওয়াল মূর্ত হয়ে উঠল চোখের সামনে।

"দিবুকে একটা কংক্রিটের বেড়ার মধ্যে বেঁধে রেখে দেব বলছ?"

"মানুষকে যে বেড়ার মধ্যে বেঁধে রাখতে হয় তা যে কংক্রিটের নয় তা তুমিও জান, আমিও জানি। যাক্ ও আলোচনা এখন থাক, একটা মকোর্দমার নথি এনেছি সেইটে দেখ দিকি। চুনীলাল বলে' আমার একটি বন্ধু আছে, ঠিক বন্ধু নয়, বন্ধুর বন্ধু, সে এক ব্যবসা করতে গিয়ে ফেঁসে গেছে। বাঙালীর যা হয়। ম্যানেজিং ডিরেকটার ছিল সে। ক্রিমিনাল কেসে পড়ে গেছে বেচারা। দেখতো এর কোনও উপায় করতে পার কি না।"

সূর্য চৌধুরি সাগ্রহে হাত বাড়ালেন নথিটার দিকে। এই অপ্রিয় আলোচনার ধোঁয়ায় তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল যেন। ধূমায়মান ভিজে ঘুঁটেটা সরিয়ে নেওয়াতে তিনি বাঁচলেন যেন।

নথির দু'এক পাতা উলটেই তিনি বললেন, "ও, এ কেস তো জানি আমি। হরলাল সিংহির সঙ্গে মকোর্দমা তো? আমিই তো হরলালের পক্ষে উকীল, এখুনি তো হরলাল এসেছিল। তোমার চুনীবাবু যদি নির্দ্দিষ্ট দিনে টাকা দাখিল করতে না পারেন জেল হয়ে যাবে।"

"বল কি! জেল হয়ে যাবে?"

"নির্ঘাত!"

ঠিক এই সময়ে ব্রজ এল আবার। এবং ঈষৎ ধমকের সুরেই বললে, "তুমি আর বেলা করছ কেন। এগারোটা বাজে যে—কাছারি যাবে না নাকি আজ?"

"হ্যাঁ যাব বই কি।"

"আমিও উঠি তাহলে এবার"—গোবিন্দ সাণ্ডেল উঠে পড়লেন। সরোদটা তখনও বাজছিল। পাশের ঘরটার দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে চোখ মট্‌কে গোবিন্দ সাণ্ডেল বললেন, "খুব জমিয়েছে দেখছি। আমি বুড়ো মানুষ, আমার বুকের ভেতরটাই খলবল করে' উঠছে"—বলেই চলে গেলেন।

সূর্য চৌধুরি হঠাৎ অপমানিত বোধ করলেন এতে। তাঁর উনবিংশ-শতাব্দী-লালিত আত্মসম্মানের কান লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। ব্রজর দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "কি কাণ্ড !"

"তুমিই তো কিনে দিয়েছ ওকে সরোদ"—নির্ব্বিকার কণ্ঠে বললে ব্রজ। তার মুখের চেহারাটাও এমন ভাব-লেশ-হীন হয়ে উঠল (অনেকটা ঢালের মতো) যেন সে পরবর্তী চিৎকারটা প্রত্যাশাই করেছিল।

"না ওসব বেলেল্লগিরি আমার বাড়িতে চলবে না। ডেকে দাও ওকে"—গর্জন করে' উঠলেন সূর্য চৌধুরি।

ব্রজ চলে গেল। ভ্রূকুঞ্চিত করে' বসে' বসে' পা দোলাতে লাগলেন তিনি। দিবস এল না, মানে ঠিক পরমুহূর্তেই এল না। সূর্য চৌধুরি এতে অযৌক্তিকভাবে আরাম পেলেন একটু। আবার তাঁর মনে হ'ল দিবসকে চেনেন না তিনি। দিবস দিনের আলোর মতই স্পষ্ট অতিশয় স্পষ্ট, তবু তার সবটা তিনি দেখতে পান নি। তার অত্যুজ্জ্বলতাই যে আড়াল করেছে তার সমগ্রতাকে, দিনের আলো যেমন আড়াল করে' রাখে আকাশ ভরা নক্ষত্রের রূপকে, এ তথ্য স্পষ্টরূপে না জানলেও এটা তিনি আবার আবছাভাবে উপলব্ধি করলেন যে দিবসকে চেনেন না তিনি। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা ওলটাতে যে দিবসের ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে ওঠে, সুসজ্জিত বাক্যাবলী-অলংকৃত

নানাবিধ মুখোশের অন্তরালে নানাবিধ রাজনৈতিক দলাদলির নানাবিধ নীচতা বারংবার বিমর্ষ করে' তোলে যে দিবসকে, তথা-কথিত ভদ্র পেশার পোষাকী ছাঁদের অন্তরালে বার-বনিতা-বৃত্তির কদর্য রূপ দেখে শিউরে উঠে যে দিবস, স্বাধীনতার উত্তাল-তরঙ্গ-সমাকুল সংজ্ঞা-সমুদ্রে ডুবে ডুবে একটি মাত্র সত্য মুক্তা আহরণ করেছে যে ধৈর্য সহকারে, যার মন অভাবনীয়ের ভাবনায় মশগুল থাকতে চায়, ধরতে চায় অধরাকে, অজানাকে জানবার আশায় যার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হতে চায় নিউক্লিয়ার এনার্জির নব নব সম্ভাবনার মধ্যে, পাখা মেলতে চায় সুরের আকাশে, তাকে শুধু সূর্য চৌধুরি নয়, কেউ চেনে না। সে নিজেও ভাল করে' চেনে না নিজেকে।

"আমাকে ডাকছেন?"

চমকে উঠলেন সূর্য চৌধুরি। দিবস কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল তা তিনি টের পাননি। দিবসের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ তিনি ভদ্র হয়ে গেলেন। একটু অপ্রস্তুতও হলেন যেন।

"তুমি আজ কলেজ যাওনি?"—বেশ ভদ্রভাবেই প্রশ্ন করলেন। অঙ্কশাস্ত্রের সমস্যায় নিমগ্ন আহত গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস্ আঘাতকারী বিজয়ী রোমান সৈন্যদের দিকে যেমন সবিস্ময়ে চেয়ে ছিলেন ঠিক ততটা বিস্ময় দিবসের চোখে না ফুটলেও সেই জাতীয় বিস্ময় ফুটে উঠল। যে কথা একাধিকবার স্পষ্ট করে' সে বলেছে তা আবার জিজ্ঞাসা করবার মানে কি? দিবসের চোখের এ দৃষ্টিতে ভড়কে গেলেন সূর্য চৌধুরি এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু চটেও গেলেন আবার।

"তুমি আজ কলেজ যাও নি?" দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন।

"না, আমি আর কলেজ যাব না। আগেই বলেছি উকীল হওয়ার ইচ্ছে নেই।"

"কি করবে তাহলে ?"

"যাহোক কিছু করব একটা ।"

"কি সেটা, তাই তো জানতে চাইছি।"

"তা ঠিক করি নি এখনও ।"

"রিসার্চ করার নামে কলেজে গিয়ে আড্ডা দেবে আর বাড়িতে বসে' দিনরাত সরোদ বাজাবে এই যদি তোমার মতলব হয়—"

"এ বছর এখানে রিসার্চ করবার কোনও সুযোগ তো আর পাবো না। অন্য লোক নেওয়া হয়ে গেছে।"

"কি করবে তাহলে এখন ? দিনরাত সরোদ বাজাবে ? রোজকার করবার কোনও চেষ্টা করবে না ? কোনও কাজ করবে না ?"

"কাজ করব বই কি, এমন কাজ যাতে গ্লানি নেই।"

বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কাজ সম্বন্ধে, বাঙালী ছেলে মেয়েদের বেকার জীবনের কারণ সম্বন্ধে, তার যে ধারনাটা মনের তলায় থিতিয়ে ছিল এই আলোড়নে সেটা স্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করল সহসা। নিমেষের মধ্যে তার মনে হল এতদিন যা ভেবেছি তা হাতে-কলমে দেখিয়ে দেবার সুযোগ এসেছে এবার। যে বক্তৃতা সে পরে ছাত্রসভায় দিয়েছিল (এবং যা 'সেন্টিমেণ্টাল' বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন সূর্য চৌধুরি) সেই বক্তৃতার প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করে' তুলল তার সদ্য-জাগ্রত চেতনাকে। তার মনে হল সৃষ্টির যে কোনও প্রকাশের মতোই আত্মপ্রকাশ করতে হবে তাকে, আর কিছু নয়। নিজের বিশিষ্ট প্রেরণায় মহিমায় আত্মপ্রকাশ করতে হবে শুধু। নিমেষের মধ্যে তার দুঃসাহসী চিত্ত দুরূহ দুর্গম পথে যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠল। তার যে কল্পনা উন্মুখ হয়েছিল রিসার্চের ছায়াপথে অভিযান করে' নব নব সৌরলোক আবিষ্কার করবার জন্যে, সক্রিয় হয়েছিল সরোদের সুর-লোকে আনন্দের সন্ধানে আত্মহারা হবার

ছন্দোময় প্রয়াসে, তার সেই কল্পনাই এখন অতি রূঢ় বাস্তবক্ষেত্রেই ফোটাতে লাগল আকশ-কুসুম। এর জন্য কারও কাছে কোনও জবাবদিহি করবার প্রয়োজনও অনুভব করল না সে। তার মনে হল আত্মপ্রকাশ করতে হবে শুধু, এর বেশি তার আর দায়িত্ব নেই। জবাবদিহির নোংরামির মধ্যে তাকেই যেতে হয়, যার প্রকাশটা মুখোশ, আত্মপ্রকাশ নয়। অঙ্কুর যখন বীজ বিদীর্ণ করে' বার হয়, প্রতিদিন আকাশপটে বর্ণকাব্য লেখা হয় যখন মেঘে মেঘে, পাখির কণ্ঠে ঝংকৃত হয়ে ওঠে যখন কলকাকলী, তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করবার কোনও প্রয়োজন অনুভব করে না তারা। কে কি ভাববে এ নিয়ে চিন্তা নেই তাদের। আত্মপ্রকাশের আনন্দেই তারা মশগুল। সেই বা হবে না কেন? সুরসপ্তকের ঘাটে ঘাটে তার আঙুলগুলো যেমন বিদ্যুৎ গতিতে খেলে যায় এই কথাগুলোও রাগিনীর গতের মতো তেমনি বেজে উঠল তার মনে নিমেষের মধ্যে। সে নিজের ঘরে এসে ভাবতে লাগল কি করা উচিত এবার।

"গ্লানি নেই মানে? ওকালতিটা তুমি গ্লানিকর বলতে চাও?" সূর্য চৌধুরি পুত্রের অনুসরণ করেছিলেন।

"গ্লানিকর তো বটেই। আইনের ফাঁদে ফেলে—" এইটুকু বলেই দিবস থেমে গেল, জানলা দিয়ে চাইল বাইরের দিকে। এ নিয়ে তর্ক করতে ইচ্ছে হ'ল না তার। সূর্য চৌধুরি কিন্তু থামলেন না। পুত্রের ভ্রান্ত ধারনাটা অপনোদিত করাটা ঠিক সেই মুহূর্তেই কর্তব্য মনে হ'ল তাঁর, কারণ তিনি চটেছিলেন, তাঁর আত্মসম্মান আহত হয়েছিল।

"মানুষ মাত্রকেই সমাজে বাস করতে হবে, আর সমাজরক্ষা করতে গেলেই আইন চাই। সেটাকে ফাঁদ মনে করবার মানে?"

যেন একটু শ্লেষ টংকৃত হয়ে উঠল সূর্য চৌধুরির কণ্ঠস্বরে। দিবস কিন্তু উত্তর দিলে শান্ত কণ্ঠে।

"কারণ ওতে বোকারা ধরা পড়ে আর গরীবরা সাজা পায়। বুদ্ধিমান কিংবা ধনীদের কিছু করতে পারে না ও আইন। ও পেশা সমাজ রক্ষা করে না, শয়তান ধনীদের রক্ষা করে। ও আমি পারব না।"

কৌশলপূর্ণ যুযুৎসুর প্যাঁচ দেখিয়ে, টপাটপ দেওয়াল ডিঙিয়ে, ফস করে' অপ্রত্যাশিতভাবে কপাট খুলে বা টপ্ করে' সিঁড়ি নাবিয়ে মুখোশপরা একটা শয়তান গুণ্ডা তার সহকারী বন্ধুবান্ধবের সর্ববিধ সংকট থেকে ত্রাণ করছে এই ধরনের একটা রোমাঞ্চকর চলচ্চিত্র কিছুদিন আগে সূর্য চৌধুরি দেখেছিলেন। দিবসের কথা শুনে হঠাৎ সেই চিত্রটা ভেসে উঠল তাঁর মানস-পটে এবং নিজেকে তিনি সেই মুখোশপরা গুণ্ডারূপে কল্পনা করে' আরও চটে উঠলেন। কণ্ঠস্বরে রীতিমত উষ্মা প্রকাশ পেল এবার।

"আমি তাহলে সারাজীবন যা করে' এসেছি তা শয়তানী বলতে চাও তুমি, এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার!"

দিবস চুপ করে রইল।

"কোন্ বিশুদ্ধ পেশা তুমি করবে ঠিক করেছ শুনি?"

"ঠিক করিনি কিছু এখনও।"

বলেই' তার লজ্জা হল, মনে হল কেন সে ঠিক করেনি; যে কোনও মুহূর্তেই তা ঠিক হয়ে যাবে যদিও, কিন্তু সেই মুহূর্তটাকে এতদিন ধরে' পেছিয়ে দেওয়ার মধ্যে তার মানসিক জড়তার একটা প্রমাণ সে দেখতে পেল যেন সহসা। দমকা হাওয়ায় বাথরুমের কপাটটা হঠাৎ খুলে গেলে লোকে যেমন অপ্রস্তুত হয়ে যাহোক একটা কিছু দিয়ে নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করে, দিবসও তেমনি ঢাকতে চেষ্টা করল নিজেকে।

"ঠিক করি নি যদিও, কিন্তু ঠিক করতে দেরি লাগবে না।"

"তবু সেটা কি ধরনের হবে জানতে পারি কি? সরোদ বাজাবে তা বুঝতে পারছি, কিন্তু ও ছাড়া আর কোন্ বিশুদ্ধ পেশা করবে তুমি?"

স্বল্পভাষী দিবস একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে' ফেললে এর উত্তরে। তার মুখ সহসা অনর্গল হয়ে গেল যেন।

"আমি এই বাঁধা ধরা গণ্ডী থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। ভদ্রলোকের ছেলে হলেই যে উকীল ডাক্তার মাষ্টার ইঞ্জিনিয়ার কিংবা কেরানী হতেই হবে এবং তার জন্যে মিথ্যে মুখোশ পরে' পরে' বেড়াতে হবে এ কারাগার থেকে আমি মুক্তি চাই। এই কারাগারের বাইরে যে জগত আছে সেইটের সন্ধানে বেরুতে চাই আমি।"

"মানে?"—সূর্য চৌধুরির ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল, কারণ সত্যিই তিনি বুঝতে পারছিলেন না কিছু।

"মানে সরল পরিশ্রম করে' রোজকার করতে চাই।"

"সরল পরিশ্রম? তার মানে মুটেগিরি করবে?"

"আপত্তি নেই, কিন্তু ঠিক কি করব তা জানি না এখনও।"

সূর্য চৌধুরির বিস্ময় সীমা অতিক্রম করে' গিয়েছিল। রজ্জুকে যে তাঁর সর্পভ্রম হল তা নয়, ফস্ করে সেটা যেন পাখি হয়ে উড়ে গেল। মুটেগিরি করতে করতে সরোদ বাজাবে? দিবসের চোখের দৃষ্টিতে কিন্তু যে দীপ্তি তিনি দেখলেন তা উন্মাদের চোখে দেখা যায় না, তা অস্বস্তিকর, কিন্তু অর্থহীন নয়। তার 'ঠিক-কি-করব-তা-জানি না-এখনও'র আসল অর্থ যে ঠিক কি করব তা জানি ভাল করে' তা সূর্য চৌধুরি যেন পরিষ্কার দেখতে পেলেন এই প্রদীপ্ত দৃষ্টির আলোকে। ঘাবড়ে গেলেন। হতবাক হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। খাঁচার পাখি দরজা খোলা পেয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে যেন। পরমুহূর্তেই নিরুপায় ক্ষোভ অহংকারের ছোঁয়াচ লেগে রূপান্তরিত হল ক্রোধে এবং সেই মুহূর্তে উকীল সূর্য চৌধুরি ধরবার ছোঁবার মতো যে জিনিসটা দেখতে পেলেন সেইটেকেই আঁকড়ে ধরতে গেলেন, যদিও ধরতে গিয়ে যা করে' বসলেন তা করবার কল্পনাও ছিল না তাঁর।

"কবে সেটা জানবে? ক্রমাগত সরোদের গৎ বাজিয়ে গেলেই কি ঠিক হবে সেটা?"

দিবসের জড়তার পাথরটা সহসা ফেটে গেল। নির্ঝর ছুটে বেরুল গিরি বিদারণ করে'। নিঃশঙ্ক আবেগে যাত্রা সুরু হল তার অনির্দিষ্ট পথে অমিত শক্তির সম্ভাবনা নিয়ে। মৌন ভাবাকুলতা ভাষা পেল যেন হঠাৎ।

"আমি চললুম।"

"কোথায়?"

"নিজের পথ নিজেই ঠিক করব এখন থেকে।"

বাইরের দুয়ারটা খুলে দিবস বেরিয়ে যেতে উদ্যত হল। এবং কিং-কর্তব্যবিমূঢ় সূর্য চৌধুরিও অদ্ভুত অচিন্ত্যপূর্ব কাণ্ড করে' বসলেন একটা।

"এটাও নিয়ে যাও না, এ নিয়ে আমি আর কি করব"—পাশের টেবিলে সরোদটা ছিল সেটা তুলে ছুঁড়ে দিলেন তিনি দিবসের দিকে।

ঝন্‌ঝন্ করে' মেজেতে পড়ে' চুরমার হয়ে গেল সেটা।

দিবস ফিরে দেখলে এবং সেই মুহূর্তেই ঠিক করে ফেললে যে সরোদ কিনতে হবে আর একটা। সেই মুহূর্তে সরোদটা ভেঙে না গেলে হয়তো সরোদটা এত প্রবল হয়ে উঠত না অব্যবহিত ঘটনা পরম্পরায়। রঙ্গনাও আসত না হয়তো।

দিবস চলে গেল। পর মুহূর্তেই দ্রুতপদে প্রবেশ করল ব্রজ। সরোদ ভাঙার শব্দটা শুনতে পেয়েছিল সে।

"কি হল, দিবু কোথা?"

"চলে গেল।"

"কোথা?"

"জানি না।"

"সরোদটাকে অমন করে' আছড়ে ভাঙবার কি দরকার ছিল? কি যে কর কাণ্ড!"

হঠাৎ স্বর্য চৌধুরির মনে হল দিবস যদি স্বেচ্ছায় ফিরে না আসে তাহলে তার নাগাল হয়তো আর পাবেন না তিনি। কোলকাতার বিরাট জনসমুদ্রের ছবিটা ভেসে উঠল মানসপটে।

"তেল দাও আমাকে, কোর্টের বেলা হয়ে যাচ্ছে"—অতি ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি ঘর থেকে।

নির্বাক ব্রজ ভাঙা সরোদটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিবস যখন পথে বেরিয়ে পড়ল ঠিক সেই সময়ে আরও কয়েকটা ঘটনাও ঘটল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে হলেও এগুলো যে পরস্পর যুক্ত তা পরে বোঝা যাবে অদৃশ্য যোগসূত্রটা দৃশ্য হয়ে উঠবে যখন। যে কৌশলী রূপকার অদৃশ্য লোকে বসে' সৃষ্টি করেন নিত্য নূতন নট ও নাটক তাঁরই প্ররোচনাতেই হয়তো সেই সময় বাদ্যযন্ত্রের দোকানদার নিতাই নন্দী তাঁর দোকানে সিগারেট-মুখী বিদেশিনী তরুণীর আলেখ্য-অলংকৃত ক্যালেণ্ডারটি টাঙাচ্ছিলেন সানন্দে, স্বপ্নেও তিনি ভাবছিলেন না যে এই ক্যালেণ্ডারকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটবে তার ধাক্কা কোথায় গিয়ে পৌছবে। মহেন্দ্র কুণ্ডুও ঠিক সেই সময়ে মুখ ছুঁচলো করে' সোদামিনীর কাছে শুনছিলেন যে তাঁর বাড়ির কোনও ভাড়াটে পাওয়া যায় নি এবং ভাবছিলেন তাঁর বন্ধু রাখহরি যে ভাড়াটের খোঁজটা দিয়েছিল সে আর এসেছে কি না কে জানে। রাখহরির চায়ের দোকানে একবার খোঁজটা নেবেন ঠিক করলেন তিনি তখনই অন্নদা বিশ্বাসও (ঝোলা গোঁফ, সদা-শুষ্ক-মুখ) ঠিক এই সময়ে যে খবরটি পেলেন তাতে তাঁর মাথায় বজ্র ভেঙে পড়ল যেন এবং তিনি ছুটলেন চুনীলালকে সে খবরটি দিতে। যে বৈদ্যুতিক কারবারের বেড়াজালে ম্যানেজিং ডিরেক্টার চুনীলাল বিদ্যুদ্বেগে হরলাল প্রভৃতিকে ডুবিয়েছিলেন সেই বেড়াজালেই ধরা পড়েছিলেন ক্ষুদ্র-প্রাণ অন্নদা বিশ্বাসও। অন্নদা বিশ্বাস স্ত্রীকে লুকিয়ে পোস্টাফিস থেকে যথাসর্বস্ব বার করে' 'ইলেক্‌ট্রিক গুড্‌স্'-এর ব্যবসায়ে বেশী লাভবান হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ব্যবসা যখন ডুবে গেল তখন তিনি স্বপ্ন-বিবর্জিত সাদা চোখে স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে

হরলাল সিংহির মতো মকোর্দমা করবার সামর্থ তাঁর নেই। তার চেয়ে বরং যে বৈদ্যুতিক দ্রব্য-সম্ভার দোকানে এখনও মজুত আছে সেগুলিকে যদি দাঁও-মাফিক বিক্রি করে' ফেলা যায় তাহলে তাঁর টাকাটা অন্তত উঠে আসবে। সেই চেষ্টাই তিনি করছিলেন এবং বিকাশ বাবুর সন্ধানও পেয়েছিলেন। ধনী বিকাশবাবু একটা নূতন বাড়ি করাবেন, সেখানে অনেক ইলেকট্রিক গুড্‌স্ নাকি দরকার, তাছাড়া ইলেকট্রিক গুড্‌স্-এর একটা দোকান করবারও ইচ্ছা আছে না কি তাঁর। উল্লসিত অন্নদা বিশ্বাস তাঁর কাছে গিয়ে কথাবার্তাও ঠিক করে' ফেলেছিলেন প্রায়, কিন্তু এখন তাঁর বন্ধু সমরেশের কাছে যে খবরটি পেয়ে তাঁর মাথায় প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক আঘাত লাগল (চলতি বাংলায় যাকে বজ্রাঘাত বলে) তার ফলে ছুটলেন তিনি আবার চুনীলালের কাছে। প্রেম নামক স্বর্গীয় বস্তুটি যে এমনভাবে তাঁর সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠতে পারে ছা-পোষা অন্নদা বিশ্বাস তা কল্পনাও করেন নি। এবং ঠিক এই সময়েই গহনচাঁদও রঙ্গনাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে যদি সে আধুনিক গান শুনিয়ে তাঁকে খুশি করতে পারে তাহলে তাকে একটা সেতার উপহার দেবেন। ফ্রেণ্ডস্ মেসের বাসিন্দা-চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রসিক এবং স্বল্পভাষী যিনি সেই হরিদাস বাবুরও 'এন্ডাউমেণ্ট পলিসি'টি মেচিওর হল সেদিন। তিনি টাকাটা বার করে' পোস্টাফিসে রেখে দেবেন ঠিক করলেন। হরিদাসবাবু ব্যাচিলার মানুষ, গভর্নমেণ্ট আপিসে চাকরি করেন, চাকরি-শেষে পেন্সন পাবেন। তাঁর লাইফ ইন্‌সিওরেন্স করবার সার্থকতা কোথায় এ প্রশ্ন যাঁরা করবেন তাঁরা লাইফ ইন্‌সিওরেন্স এজেণ্টদের চেনেন না। বিশেষত এই বিশেষ এজেণ্টটি হরিদাসবাবুর বন্ধু হওয়াতে হরিদাসবাবুকে টোপ গিলতে হয়েছিল। হরিদাসবাবু ঠিক করেছিলেন টাকাটা কোন সৎকার্যে দান করে' যাবেন। কিন্তু ঠিক কোন্ কার্যকে

সংকার্য বলে তা ঠিক করতে না পেরে টাকাটা আপাতত পোস্টাফিসে রেখে দেবেন ভাবলেন বন্ধু অঘোরের পরামর্শ তুচ্ছ করে'। অঘোরের ইচ্ছে টাকাটা কোন ব্যবসাতে খাটুক।

এই ঘটনাপুঞ্জ অদূর ভবিষ্যতে যে পরিবেশ সৃষ্টি করবে তারই অভিমুখে দিবস হেঁটে চলেছিল কিছু না জেনেই। পথের দিকে ভাল করে' না চেয়েই চলেছিল সে। নিজের মনের খবরটাই সে নিচ্ছিল আগে, বিবেকের কষ্টিপাথরে নিজের মতবাদকে বারবার যাচিয়ে আত্ম-সম্মানের প্রকৃত রূপটা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছিল সে। নিত্য-নূতন-এক্স্পেরিমেণ্ট করতে উৎসুক তার যে বিজ্ঞানী মন পরিচিত আবেষ্টনী ত্যাগ করে' অজানা পরিবেশে জীবন নিয়েই এক্স্-পেরিমেণ্ট করতে উদ্যত হয়েছিল সেই মনটারই স্বরূপ দেখবার চেষ্টা করছিল সে নানাভাবে এবং তা করতে গিয়ে তার সমস্ত মন এমন একটা আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিল যে অনিশ্চয়তার আশঙ্কাটাও ভীত করছিল না আর তাকে। যে মুহূর্তে সে আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়ভূমিতে এসে দাঁড়াল সেই মুহূর্তেই নিঃশঙ্ক হল সে। তারপর পথের দিকে চাইবার অবসর পেল।

...বিরাট শহরের কর্মব্যস্ত জনতাকে আজ সে নূতন দৃষ্টিতে দেখল যেন সহসা, দেখে মুগ্ধ হল। প্রথমেই যে দৃশ্যটা তার চোখে পড়ল সে দৃশ্য ইতিপূর্বে সে অনেকবার দেখেছে কিন্তু তা দেখে দেব-দর্শনের আনন্দ সে এই প্রথম পেল। বোঝার ভারে একটা ঝাঁকা-মুটের ঘাড় বেঁকে গেছে, দর দর করে' ঘাম পড়ছে বলিষ্ঠ পিট বেয়ে, তবু সে থামে নি, চলেছে ভিড় ঠেলে। তার পিছু পিছু চলেছে একটা রিক্শওলা। তারপরই প্রকাণ্ড একটা মোষের গাড়ি থেমে গেল হঠাৎ মোড়ের পুলিশের ইঙ্গিতে। দুহাতে রাশ টেনে দাঁড়িয়ে উঠেছে গাড়োয়ানটা। তার পেশীসমৃদ্ধ বলিষ্ঠ দেহটার দিকে মুগ্ধ

দৃষ্টিতে চেয়ে রইল দিবস। লোভীর মত চেয়ে রইল, হিংসা হল তার। ঢং ঢং করে' ঘণ্টা বাজিয়ে একটা ফেরিওলা চানাচুর ফেরি করছে। কাচের প্রকাণ্ড একটা গাড়ি ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে আর একজন, কাচের গাড়িতে নানা রকম মনোহারি জিনিস। সবাই অবাঙালী,— হঠাৎ মনে হল দিবসের। ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল একটা, ড্রাইভার পাঞ্জাবী। ঢং ঢং করে ট্রাম আসছে, ড্রাইভারটার দিকে চেয়ে দেখলে দিবস, উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে,—না কিরণ নয়, ট্রামে ঝুলছে অসংখ্য বাঙ্গালী, আপিস-মুখো কেরানীর দল, যারা ওই ঝাঁকা মুটে, রিক্শওলা, গাড়োয়ান, ট্যাক্সি ড্রাইভার, দোকানদারদের ছোটলোক বলে' অবজ্ঞা করে···।

···হাঁটতে হাঁটতে সে কলেজ স্কোয়ার ওয়েলিংটন স্কোয়ার পার হ'য়ে ধর্মতলার মোড়ে এসে দাঁড়াল। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, আস্তানা ঠিক করতে হবে একটা সর্বাগ্রে, টাকা দরকার কিছু, তখনই মনে পড়ল তার স্বোপার্জিত কিছু টাকা ব্যাঙ্কে আছে, তার স্কলারশিপের টাকা, কিন্তু তখনই আবার মনে পড়ল···এই দ্বিতীয় কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার, সূর্য চৌধুরির, মুখটা মনে পড়ল। ব্রজকে মনে পড়ল। চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল সে অনেকক্ষণ। একটা ফায়ার ব্রিগেড বেরিয়ে গেল চতুর্দিক সচকিত করে', পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে আবার সচেতন হল সে। চতুর্দিকে মানুষের ভিড়, নানারকম মানুষ। রিক্শায়, ট্যাকসিতে, বাসে, ট্রামে, নানা ধান্দায় চলেছে। অনেকদিন আগে এক ডাক্তার বন্ধুর ল্যাবরেটরিতে মাইক্রোস্কোপে এক ফোঁটা ব্যাকটিরিয়ার ইমালশান্ দেখেছিল সে। সেই ছবিটা মনে পড়ল হঠাৎ। কোনও এক বিরাট মাইক্রোস্কোপের তলায় রেখে আমাদেরও দেখছে না কি কোনও অদৃশ্য চক্ষু? মোড়ের একধারে একটা ভিখারী বসেছিল।

তার পাশে যে শিশুটা বসেছিল সেটা কেঁদে উঠল হঠাৎ। সমস্ত কলরব ছাপিয়ে তার কান্নাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিরাট জনতার দুর্নিবার স্রোত ক্ষণিকের জন্য মন্থর হয়ে গেল যেন। পয়সা দেবার জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিবস অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, মনিব্যাগ ফেলে এসেছে। কাছেই একজন ভদ্রলোক বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন; তিনি পকেট থেকে মনিব্যাগ বার করে' হাত ঢোকালেন তাতে, হাত বার করলেন আবার, ব্যাগটা ফাঁক করে' ঝুঁকে দেখলেন একটু, আবার হাত ঢোকালেন ভ্রূকুঞ্চিত করে', তারপর একটা পয়সা বার করে' দিলেন ভিখারীটাকে। সঙ্গে সঙ্গেই 'বাস' এসে গেল তাঁর। বাসে স্থান নেই, লোক ঝুলছে। তবু নিজের হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে প্রায়-ছুটে এগিয়ে গেলেন তিনি এবং বহু যাত্রীর আপত্তি সত্ত্বেও উঠে পড়লেন 'বাস'টায়, গুঁজে দিলেন যেন নিজেকে ওই ভিড়ের মধ্যে। দিবসের মনে হল আপিসের কেরানী বোধ হয়, 'লেট' হয়ে গেছে। 'বাস' চলে গেল। আবার একটা 'বাস' এল, ঠিক তেমনি ভিড়। নানারকম মুখ চোখে পড়ল আবার। কারও মুখে বিড়ি, কারও সিগারেট, কারও পান, কারও হাসি, কারও বিরক্তি। কেউ ভিড় থেকে আত্মরক্ষা করছে কেবল। সেই ভাব ফুটে উঠেছে তার চোখে মুখে। যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ কত রকম লোক। নিজের অতীত জীবন থেকে চ্যুত হয়ে দিবস সহসা যেন আগন্তুক হয়ে পড়েছে। আগন্তুকের দৃষ্টি নিয়ে দেখছে যেন অপরিচিত জনতাকে। সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখছে। সবাই কেরানী? অস্বীকার করতে পারলে সে বেঁচে যেত। কিন্তু অস্বীকার করতে পারল না। হাঁ, অধিকাংশই কেরানী, অধিকাংশই দরিদ্র, অধিকাংশই অসুখী। বন্দীর দল। এক জেল থেকে চলেছে আর এক জেলে। সত্যিকার পরিশ্রম করতে হয় অপারগ, না হয় অনিচ্ছুক। শৌখিনতা বজায় রেখে যতটা হয় তার বেশী কিছুতে কিছু

করবে না কেউ। পাখার তলায় চেয়ারে বসে' অধস্তন কর্মচারিদের উপর চোখ রাঙিয়ে উর্ধতন কর্ম্মচারিদের খোশামোদ করে' দশটা পাঁচটা কলম পিষে যা হয় তাতেই খুশী সবাই। ওই কলম পিষে কেউ পাচ্ছে পঞ্চাশ, কেউ পাঁচশ', কেউ আরও বেশী। আরও বেশীর দলে মুষ্টিমেয় লোক, কিন্তু ওই আলেয়াই মুগ্ধ করে' রেখেছে অধিকাংশকে। সবাই কেরানী হবার উপযুক্ত নয়, কিন্তু সবাই ছুটেছে, যারা উপযুক্ত তারাই হয়তো হারিয়ে যাচ্ছে ভিড়ে। ঘুষ-খোশামোদ-তদ্বির-সুপারিশের খানা-খন্দ-জলা-নালায় নাকানি-চোবানি খেতে খেতে হিংসা-কলহে জর্জরিত হয়ে ওই দুর্লভ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে সবাই ছুটে চলেছে। ওরা স্বাধীন শ্রমসাধ্য কাজে লিপ্ত থাকত যদি তাহলে শুধু যে বেশী রোজকার করতে পারত তা নয় দেশের চেহারাও বদলে দিতে পারত। কিন্তু তা করবে না কেউ। অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ অনুভব করল—খিদে পেয়েছে, খুব খিদে পেয়েছে এবং পরমুহূর্তেই মনে পড়ল যে সঙ্গে একটি পয়সা নেই। এই সমস্তর অন্তরালে কিন্তু আর একটি প্রশ্ন সর্বদা জাগছিল তার মনে—কি করবে, কি করবে এখন, এখনই কিছু আরম্ভ করা দরকার, কিন্তু কি সেটা,......।

"আরে দিবু যে, এখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে ?"

অপ্রত্যাশিতভাবে অকূলে কূল পেল এ জাতীয় মনোভাব হল না দিবসের। অত্যন্ত প্রত্যাশিত যেটা সে খুঁজছিল এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে সেইটেই পেয়ে গেল যেন। একটা ট্রাম থেকে কিরণ কথা বলল, ট্রাম চালাচ্ছিল সে। কিরণের সঙ্গে দিবসের বন্ধুত্ব ছিল এবং বন্ধুত্ব ছিল বলেই খুঁটিনাটি অসংখ্য বিষয়ে মতের অমিল ছিল। অর্থাৎ বন্ধুত্ব ছিল বলেই অমিলগুলো প্রকট হবার সুযোগ পেয়েছিল! যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকে না তাদের সঙ্গে আমরা মৌখিক ভদ্রতা করি, তাদের কথায়

সায় দিয়ে স্বল্প পরিচয়ের আবরণে আত্মরক্ষা করি, কারণ সকলের সঙ্গে মতের অমিল নিয়ে তর্ক করবার সময় বা সামর্থ সকলের নেই। কিরণের সঙ্গে দিবসের বন্ধুত্ব ছিল বলেই ভয়ও ছিল কিরণ তার এ আচরণ সমর্থন করবে না হয়তো। তা ছাড়া আর একটা ব্যাপারও ছিল। বৈজ্ঞানিক দিবসের কথায় বার্তায় আচরণে যেমন মনে হত সে কবি তেমনি কবি কিরণের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হ'ত সে যেন বৈজ্ঞানিক, প্রত্যেক জিনিসের চুল-চেরা বিচার করে' মূল্য-নির্ধারণ করাই যেন তার স্বভাব। আসলে উভয়েই ছিল যুগপৎ কবি এবং বৈজ্ঞানিক, (কবি আর বৈজ্ঞানিক যে একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ তা কে না জানে) কিন্তু দিবসের বাইরেটা ছিল কবি, কিরণের ঠিক ছিল তার উলটো। তাই দিবসের ভয় করছিল যে কিরণ হয়তো……।

…দিবস তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল ট্রামটাতে।

"আমাকে কিছু পয়সা দে তো। পয়সা আছে সঙ্গে তোর?"

কিরণ ব্যাগটা বার করলে।

"ব্যাগটাই আমাকে দে।"

"কি হয়েছে বল্ তো?"

কিরণ কিন্তু কথা শেষ করতে পারলে না। কণ্ডাক্টার ঘণ্টা দিলে, দিবস লাফিয়ে পড়ল ট্রাম থেকে, ফুটপাথে এসে চেঁচিয়ে বলল, "পরে বলব সব, ডিউটির পর তোর বাড়ি যাব।"

মিনিট খানেকের মধ্যে এত কাণ্ড ঘটে গেল। ট্রাম চলে গেল। এবং তারপর দিবস যন্ত্র চালিতবৎ ঢুকল গিয়ে সামনের চায়ের দোকানটায়।

"দেখ একটা কিছু নিয়ে নাটক করে' তুলতে না পারলে বাঙালী তৃপ্তি পায় না। আমার মনে হচ্ছে তোমাকেও সেই নাটকের নেশায় পেয়েছে। বাবার সঙ্গে এমনভাবে ঝগড়া করে' চলে আসার আর কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না আমি।"

"ঝগড়া করে' চলে এসেছি অবশ্য, কিন্তু ঝগড়াটাই বড় নয়, আদর্শটাই বড়। আদর্শবাদীকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করতে হয়। আমার আচরণকে নাটকীয় বলে' তুমি যদি ঠাট্টাই কর তা-ও সহ্য করতে হবে আমাকে।"

"তোমার আদর্শটা কি, তাইতো ভাল বুঝতে পারছি না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থোপার্জন করাই যদি তোমার অভিপ্রেত হয় তাহলে ওকালতি কি দোষ করলে? তোমার বাবাকে কি কম মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে? তুমিও ইচ্ছে করলে ফেলতে পার।"

"আমার মতে সরল পরিশ্রম করে' সকলেরই রোজকার করা উচিত। যে ব্রাহ্মণত্ব সমাজের প্রাণ তাকে পেশায় পরিণত করলে তা প্যাঁচ হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যে বুদ্ধির প্যাঁচে ফেলে কাউকে পীড়ন করবার ইচ্ছে নেই আমার।"

"কিন্তু সরল পরিশ্রম বলতে যা বোঝায় তা কি পারবে তুমি? অ্যাটমিক কেমিস্ট্রির অনন্ত সম্ভাবনার আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে তোমার মন—"

"কি চাই বাবু আপনার?"

চায়ের দোকানদার রাখহরির কথায় আত্মস্থ হ'ল দিবস। এতক্ষণ সে কল্পনায় কিরণের সঙ্গে তর্ক করছিল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে দোকানের মালিক রাখহরি মল্লিক ঘরের একধারে নিজের ক্যাস বাক্সটি আগলে বসে আছেন। তাঁর চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি। লম্বা টেবিলটার একপ্রান্তে নিবিষ্ট চিত্তে আহার করছেন আর একটি ভদ্রলোক! আরও জন দুই চা খাচ্ছে।

"আমাকে এক কাপ চা আর দুটো টোস্ট দিন।"

রাখহরি পরদাবৃত দরজাটার দিকে চেয়ে হাঁকলেন—"একটা চা, দুটো টোস্ট"—তারপর দিবসের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, "আমলেট?"

"বেশ আমলেটও দিতে বলুন।"

"সিংগিল না ডবল?"

"ডবল।"

রাখহরি আবার সেই পরদাবৃত দ্বারটার উদ্দেশ্যে ফরমাস প্রেরণ করলেন—"ডবল ডিমের আমলেট একটা—"

দিবসের মন অ্যাটমিক কেমিস্ট্রির অনন্ত সম্ভাবনার আকাশেই উড়ে বেড়াচ্ছিল। তখনই সে ঠিক করে' ফেললে সেই সায়েব প্রফেসারটিকে চিঠি লিখবে। অন্য কিছু নয়, তার সমস্ত স্বপ্ন যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে এই কথাটি তাঁকে জানিয়ে দেবে শুধু। ওই বিদেশী অধ্যাপককে হঠাৎ তার অত্যন্ত আপন জন বলে' মনে হল। মনে হল ওই ব্যক্তিটাই আসল দিবস চৌধুরিকে চিনেছিল। হঠাৎ উঠে পড়ল সে। রাখহরির দিকে চেয়ে বললে—"আমি আসছি এখনই"—এবং বেরিয়েই সামনের একটা দোকান থেকে কিছু খাম আর চিঠি লেখার একটা প্যাড কিনে নিয়ে ঢুকল।

...চা টোস্ট আমলেট শেষ করে' দোকানদারকে দাম চুকিয়ে দিয়ে বললে—"আপনার এখানে বসে' একটা চিঠি লিখতে পারি কি?"

"নিশ্চয়"—একমুখ হেসে সম্মতি দিলেন রাখহরি।

দিবসের পকেটে ফাউণ্টেন পেন ছিল। চিঠি লিখতে লাগল সে। মনের আবেগে লিখে যেতে লাগল পাতার পর পাতা। রিসার্চের যে সব কথা নীহারিকার মতো মনের গহনলোকে ভেসে বেড়াচ্ছিল শত সৌরলোকের সম্ভাবনা নিয়ে, যে সব স্বপ্ন কখনও সফল হবে না আর তারই কাহিনী লিখতে লাগল সে তন্ময় হয়ে।

......চিঠিটা শেষ করে' যখন খামে পুরছে তখন মহেন্দ্র কুণ্ডু এসে ঢুকলেন এবং এসেই রাখহরিকে প্রশ্ন করলেন, "কি হে লোকটা টাকা দিয়ে গেছে?"

কুণ্ডু মশায়ের এই নিতান্ত গদ্যময় প্রশ্নেও হাসি ফুটল রাখহরির মুখে। দোকানদারি করে' করে' হাসিটা পোষা হয়ে গেছে তাঁর।

"কই না সে আসে নি তো!"

মহেন্দ্র কুণ্ডু একটা চেয়ার টেনে বসলেন এবং মুখটাকে ছুঁচলো করলেন। ছুঁচলো করেই বসে রইলেন অনেকক্ষণ। মস্তিষ্কে চিন্তার তরঙ্গ প্রবাহিত হলেই মুখটা ছুঁচলো হয়ে যায় তাঁর।

"বাড়িতে তালা মেরেই চলে যাই তাহলে, কি বল? আজ আমাকে দেওঘর যেতেই হবে, কাল জয়েনিং ডেট।"

রাখহরি, আর একটু হেসে, সমর্থন করলেন প্রস্তাবটি।

"তাই যাও, চাবিটা আমার কাছে রেখে যেও। যদি পারি ভাড়াটে জোগাড় করব। খোলার হলেও ভাড়াটে জুটে যেত, কিন্তু তোমার ঘরখানা একেবারে বেমেরামত যে। তার উপর চারদিকে ড্রেন। পাড়াটাও সুবিধার নয় তো—"

মহেন্দ্র কুণ্ডু মুখ ছুঁচলো করে' শুনলেন তারপর স্বাভাবিক মুখ করে উত্তর দিলেন।

"না হে, সেদিন আর নেই। সর্দি আছে অবশ্য, কিন্তু সর্দিরও আর সেদিন নেই।"

আর একটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করে' রাখহরি প্রথমোক্ত অসুবিধাগুলির উপর আর এক পোঁচ রং চড়াবার প্রয়াস পেলেন, অবশ্য আর একটু হেসে।

"তোমার আর একটা ফ্যাচাং আছে যে—হাঁসটা। ওটাকে বেচে দাও, বুঝলে? আমাকেই দাও, নগদ পাঁচ টাকা দিয়ে দিচ্ছি।"

"কি করবে তুমি?"

"রোস্ট্।"

"না ভাই তা পারবনা। ও হাঁসটি আমার স্ত্রীর স্মৃতি। দেওঘরে

এখন কোয়ার্টার পাব না, তাই ওটাকে নিয়ে যেতে পারছি না। কোয়ার্টার পেলেই নিয়ে যাব।”

দিবস ভ্রূকুঞ্চিত করে' শুনছিল এদের কথাবার্তা। সে হঠাৎ কথা কয়ে উঠল।

“আমার একটা ঘরের দরকার ছিল।”

তড়িদ্বেগে ফিরে বসলেন মহেন্দ্র কুণ্ডু।

“বেশ তো নিন না আমার ঘরখানা।”

রাখহরি মল্লিক ঘরটাকে কেন্দ্র করে' গোপন মতলব ফেঁদেছিলেন একটা। তাতে বাধা পড়ায় মনে মনে তিনি বিব্রত হলেন একটু এবং একটু হেসে দিবসের দিকে চেয়ে বললেন, “খোলার ঘর কিন্তু।”

“তাতে আপত্তি নেই। ঘরটা কোথায়?”

“চিৎপুরে, একটি গলিতে।”

“ভাড়া কত?”

“ভাড়া মাসিক পনর টাকা”—মহেন্দ্র কুণ্ডু মুখ ছুঁচলো করলেন একবার—তারপর বললেন, “তবে যদি আপনি আমার হাঁসটাকে রাখেন কিছু কম হবে। তিনমাসের ভাড়া অগ্রিম চাই কিন্তু—”

“বেশ”—দিবস একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল এবং পরমুহূর্তেই যে প্রশ্নটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল তাতে মহেন্দ্র কুণ্ডুর মুখ ছুঁচলো হয়ে গেল আবার।

“কাছাকাছি শালের ভালো দোকান আছে কোনও আপনার জানা-শোনা?”

“শালের দোকান? শালের দোকানের অভাব কি?”

“চলুন তাহলে বেরোন যাক। আমাকে ব্যাংকটা হয়ে যেতে হবে একবার।”

“বেশ চলুন।”

বেরিয়েই সে আগে পোস্টাফিসে গিয়ে পোস্ট করে' দিলে চিঠিখানা লণ্ডনের উদ্দেশ্যে। প্রফেসারের ঠিকানা তার জানা ছিল। বেশী টিকিট দিয়ে দিলে, যাতে 'এয়ার মেলে' যায়। চিঠিটা পোস্ট করে' অদ্ভুত আরাম পেলে সে একটা যেন, ভগবানের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করে' আশুফললাভের কোন সম্ভাবনা না থাকলেও, কেবল অর্ঘ্য নিবেদন করে' যে তৃপ্তি পায় লোকে সেই ধরনের তৃপ্তি সে পেলে যেন।

ঠিক এই ধরনের তৃপ্তি কিরণও পেলে যখন এস্‌প্ল্যানেড ট্রাম ডিপোতে তার মনের ভাবটা প্রথম ভাষা পেল তার কবিতার প্রথম চরণ দুটোতে। গুণগুণ করে এল যেন কথাগুলো এক ঝাঁক ভ্রমরের মতো কোনও অজানা আকাশ থেকে, রেখে গেল ছন্দ-মিলের পশরা।

অন্ধকারে পথ হারাল যারা
তারাই কি গো আকাশ ভরা-তারা

এস্‌প্ল্যানেডে ট্রামে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিচিত্র জনতার কলরবের মধ্যে কিরণ প্রতীক্ষা করতে লাগল মনে মনে, আবার কখন আর একদল ভ্রমর আসবে। কবিতাটা লিখে ঊর্মিকেই দিতে হবে। গহনচাঁদ বাবুর মেয়ে রঙ্গনা তার গানে সুর দিয়ে দেবে, সেই গান রেকর্ড হবে... ঊর্মির আশা কত! গহনচাঁদবাবু এখানে এসে 'সঙ্গীত ভবন' খুলেছেন এটা সুসংবাদ নিশ্চয়ই। তার বাঁশী শেখার ইচ্ছে খুবই, কিন্তু মাসিক দশ টাকা খরচ করে' (এই বেতনই চুনীবাবু ধার্য করেছেন না কি) বাঁশী শেখবার সামর্থ্য তার নেই। তবে যদি টিউশনি জোগাড় করতে পারে একটা—এই প্রসঙ্গে ঊর্মির সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল তা মনে পড়ল কিরণের। ঊর্মি দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে বলেছিল, "আমি যদি টিউশনি জোগাড় করে' দিতে পারি আমাকে কি দেবেন বলুন?"

"সিনেমা দেখাব একদিন।"

"একদিন মোটে ?"

"বেশ দু'দিন।"

"ফার্স্ট ক্লাসে যাব কিন্তু !"

"বেশ !"

"সেতার শেখাতে পারবেন একটি মেয়েকে ?"

"অনায়াসে।"

"মাসে পনর টাকার বেশী দেবে না কিন্তু।"

"বেশ !"

"কাল খবর পাবেন তাহলে।"

ঊর্মি শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোয় দেখা করতে এসেছিল তার সঙ্গে। ভিড়ে দাঁড়িয়েছিল তার অপেক্ষায়। ঊর্মির চেহারাটা মনে পড়ল। দেখতে সুশ্রী নয়, রোগা, কালো চেহারা। কপালের দু'পাশে অতি সূক্ষ্ম কোঁকড়ানো কয়েক গোছা অলক কিন্তু অপরূপ শ্রী ফুটিয়ে তুলেছে তার মুখে। তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তার অন্তর্নিহিত রূপও যেন ফুটে উঠেছে ওই অবিরাম নর্তনশীল অলকগুচ্ছে। তার চোখ দুটো ছোট, কিন্তু সেই চোখের কালো তারায় যখন আলো চিকমিক করে' ওঠে হাসির আভায় রঙীন হয়ে, অলকগুচ্ছের নর্তনের সঙ্গে তাল রেখে তখন চোখের দৈ প্রস্থের কথা মনে থাকে না। বাপ-মা-মরা মেয়ে, অযত্নে লালিত হচ্ছিল না কি মাসীর বাড়িতে, হঠাৎ তার মনে সুরের নেশা জাগল কি করে' সে খবর কিরণ জানে না। এইটুকু শুধু জানে ও বে-পরোয়া। যে সমাজ তার জন্যে এতটুকু মাথা ঘামায় নি সে সমাজের কিছু তোয়াক্কা করে না ও। সব রকম সমালোচনাকে তুচ্ছ করে' যা খুশী করবার সাহস আছে ওর। নিজেই এসেছিল একদিন তার কাছে ধূমকেতুর মতো। এসে বলেছিল—"আপনি শুনেছি ভাল সেতার বাজাতে পারেন। আমাকে শেখাবেন একটু ? আমি কিন্তু

কিছু দিতে পারব না।" সেই থেকেই ওর সঙ্গে পরিচয়। সুরের মাধ্যমে যে পরিচয়টা নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়েছে ভৈরবীতে আশাবরীতে সারংয়ে ইমন-কল্যাণে বেহাগে বাগেশ্রীতে সে পরিচয়টা কিন্তু সামাজিক পরিচয় নয়। সামাজিক পরিচয় ঊর্মি দিতে চায় না। অনেক পীড়াপিড়ি করবার পর বলেছিল কেবল ওই টুকু। বাপ-মা-মরা, মাসীর বাড়িতে ছেলেবেলাটা কেটেছে মাস্তত ভাইবোনেদের সেবা করে' আর বাসন মেজে। এর বেশী আর কিছু বলে নি, কিরণও আর আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

...সামনে যে ট্রাম গাড়িটা লাইনচ্যুত হওয়াতে তার গাড়িটা আটকে পড়েছিল সেটাকে ঘিরে বেশ ভিড় হয়েছে একটা। তার পিছনে বয়ে চলেছে জনস্রোত। জীবন যুদ্ধ? সকলেরই কি যোদ্ধৃ বেশ? হঠাৎ তার মনে হল পথ হারিয়ে ফেলেছে এরা। পথ হারিয়ে অন্ধকার অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অন্ধ জোনাকীর দল যেন। প্রত্যেকেরই দীপ্তি আছে, কিন্তু কেউ দেখতে পাচ্ছে না কাউকে। পরস্পর ধাক্কাধাক্কি করছে কেবল, এদের ব্যর্থতার ইতিহাস কি ছন্দে গাঁথবে না কোন কবি? ঝংকৃত হয়ে উঠবে না কি তা অন্ধকারে শিহরণ তুলে? হয়তো অন্ধকারেই তাদের ইতিহাস লেখা হচ্ছে অলক্ষ্যে।......আবার এল সেই বাণী ভ্রমরের দল অজানা আকাশ থেকে, গুনগুনিয়ে শুনিয়ে গেল—

আলোয় যারা কোনও খানেই নাইরে
তাদের কি গো আঁধার মাঝে পাইরে
সব নাগালের বাইরে
পথ পেল কি সকল পথ-হারা।

এই লাইনগুলো মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘড়ি দেখলে। অর্থাৎ অধীর হয়ে উঠল। বাড়ি না পৌছনো পর্যন্ত তো কবিতাটা লেখা যাবে না। কথাগুলোকে কাগজে বন্দী না করা পর্যন্ত বিশ্বাস নেই।

কবিতাটা লিখে···এর পরই দিবসের কথা মনে পড়ল তার, কারণ ঊর্মিও দিবস ছাড়া আর কোন পাঠক নেই তার কবিতার। দিবস হঠাৎ অমন ভাবে এসে ব্যাগটা চেয়ে নিয়ে গেল কেন? সিনেমা দেখতে গেল না কি কোনও দুপুরের শো'য়ে? হঠাৎ রাস্তায় বিজ্ঞাপন দেখেছে হয়তো সঙ্গে পয়সা ছিল না। ভ্রূকুঞ্চিত করে' চাইলে সে দেওয়ালগুলোর দিকে। কোনও ভালো সিনেমার বিজ্ঞাপন দিয়েছে না কি?······

গলির গলি তস্য গলির মধ্যে নিজের শতজীর্ণ খোলার ঘরে দিবসের মতো ছেলেকে নিয়ে গিয়ে কুণ্ডু মশায় নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন একটু। দিবস ছেলেটি যে সাধারণ ছেলে নয়, অন্তত তাঁর খেলার ঘরে ঠিক যে ওকে মানবে না তা মহেন্দ্র কুণ্ডু বুঝেছিলেন। সঙ্গে চেক বই ছিল না, অথচ ব্যাংকের কেরানীর সঙ্গে একটু হেসে কথা কয়েই ও স্বচ্ছন্দে টাকাগুলি বার করে' নিলে। মহেন্দ্র কুণ্ডু পারতেন না। তাঁর বেলায় নানা বখেড়া তুলত ওই কেরানীটাই। এ রকম ছেলে তাঁর খেলার ঘর ভাড়া নিচ্ছে কেন এ ঔৎসুক্য তাঁর যে হচ্ছিল না তা নয় কিন্তু সেটাকে আমোল দিতে চাইছিলেন না তিনি ভাড়াটা হস্তগত করবার পূর্বে। দিবস ঘরটা দেখছিল। তার চোখের দিকে চেয়ে আরও কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন মহেন্দ্র কুণ্ডু।

"ঘরখানা অবশ্য একটু বে-মেরামত আছে, তবে আমার দেওঘরের চাকরিটা যদি পাকা হয়ে যায় আর আপনি যদি বরাবর থাকেন, তাহলে সব ঠিক করে' দেব আমি। এখন কোনও অসুবিধা হবে না আপনার, বর্ষাকাল হলে অবশ্য—"

"ওই চৌকিটা কি আপনার?"

"হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে আপনিও ব্যবহার করতে পারেন ওটা।"

"আপনার হাঁস কোথা?"

"ওই যে"—খোলা দ্বার-পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে' দেখালেন। হাঁসটা উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। রাজহাঁস একটা।

"ওটাকে দেখবেন একটু"—মিনতিভরা কণ্ঠে বলতে লাগলেন কুণ্ডু মশায়। কণ্ঠস্বরে যেন আন্তরিকতা ফুটল তাতে দিরস বিস্মিত হল বেশ,—"কিছুই করতে হবে না আপনাকে, সকাল বিকেল চারটি চারটি ধান দেবেন আর সদিকে দু'চারটে পয়সা দেবেন মাঝে মাঝে গুগ্‌লি এনে দেবে।"

"সদি কে?"

"আপনার পাশেই থাকে। সদি, ও সদি—" উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করেই নিরস্ত হলেন না মহেন্দ্র কুণ্ডু, ঘর থেকে বেরিয়ে তাকে ডেকে আনতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পা বাড়াবামাত্র সদির কাংস্যকণ্ঠ শোনা গেল।

"কি গো কি বলছ?"

কুণ্ডু মশায়ের মুখভাব এবং কণ্ঠস্বর মোলায়েম হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

"একবার এদিকে এস না—"

কুণ্ডু মশায়ের মুখভাগ এবং কণ্ঠস্বর মোলায়েম হলেও সদির বিষয়ে বর্তমানে তাঁর মনোভাব খুব মলায়েম ছিল না। 'তুমি ভাড়াটে যোগাড় না করে' ঘরটি নিজেই ভোগদখল করবে ভাবছিলে কিন্তু আমি দেখ ভাড়াটে যোগাড় করে' এনেছি'—এই ধরনের একটা টেক্কা-দেওয়া ভাব মনে জাগছিল তাঁর।

"কি বলছ গো?"

প্রবেশ করল সৌদামিনী। এ সৌদামিনীর সঙ্গে আকাশের সৌদামিনীর সাদৃশ্য কোনও কালে ছিল কি না জানি না, এখন কিন্তু নেই। ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী প্রৌঢ়া বস্তিবাসিনী সে। বস্তিজীবনের সমস্ত রকম লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করে অপমানিত নারীত্বের 'আহা কি দুর্দশা হয়েছে' কথায় কথায় এরকম খেদোক্তি করা যাঁদের স্বভাব সৌদামিনীর

মধ্যে তাঁরা কবিত্ব করবার বেশী মাল-মশ্‌লা পাবেন না। সৌদামিনীর হাব-ভাবে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার চিহ্নমাত্র নেই, তার নারীত্বও যে মোটেই অপমানিত হয় নি এ চিহ্নও তার সর্বাংগে পরিস্ফুট। ড্রয়িং-রুম-মার্কা বা গৃহলক্ষ্মী-ছাপ-দেওয়া কতকগুলি অর্ধমৃত নারীর অস্বাভাবিকতাকেই নারীত্ব আখ্যা দিয়ে যাঁরা তৃপ্তি পান অথবা যাঁরা স্বেচ্ছাচারের অসংযমের মধ্যেই কেবল নারীত্বের বিকাশ দেখে পুলকিত হন তাঁরা সৌদামিনীর আসল রূপটি দেখতে পাবেন কি না সন্দেহ। তাঁরা রূপ-রসিক নন, লেবেল-রসিক। ব্র্যাণ্ডির-বোতলে-পোরা রঙীন জল খেয়েই নেশায় মত্ত হয়ে যাবার ক্ষমতা আছে তাঁদের। এঁরা মানুষটাকে দেখেন না, জাত কুল কোষ্ঠি দেখেন। এঁদের বিচারে বস্তিটাই বড় হয়ে ওঠে, বাদ পড়ে যায় সৌদামিনী।

মনিবকে দেখলে দুষ্কর্মরত ভৃত্যের মুখভাব যেমন হয় মহেন্দ্র কুণ্ডুরও মুখভাব তেমনি হয়ে উঠল সৌদামিনীকে দেখে। সৌদামিনী সেটা লক্ষ্য করলে না, লক্ষ্য করবার প্রয়োজন নাই তার। তার ট্রেন মহেন্দ্র কুণ্ডু নামক স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল বটে কিছুক্ষণ কিছুকাল আগে, কিন্তু সে স্টেশন বহুদিন সে ছেড়ে এসেছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রবৃত্তি আর তার নেই। এই খোলার ঘরটা মহেন্দ্র কুণ্ডু তাকে দেবে বলেই কিনেছিল, কিন্তু দেয় নি। এ নিয়েও কোনও দিনই মাতামাতি করেনি সে। বরং মহেন্দ্র কুণ্ডু পরে যখন বিয়ে করে' এইখানেই তার চিররুগ্ন স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে এল তখন সৌদামিনী সেবাই করেছিল তার স্ত্রীর। এখনও তার হাঁসটার দেখা শোনা সৌদামিনীই করে। পুরুষদের সে চেনে, ভাল করেই চেনে, সেই জন্যে রাগ নেই তার কারও উপর। মহেন্দ্র কুণ্ডু কিন্তু সৌদামিনীকে দেখলেই তটস্থ হয়ে পড়েন।

"এই বাবুটি আমার এই ঘরখানা ভাড়া নিচ্ছেন"—হাত কচলে কাচুমাচু ভঙ্গীতে বললেন কুণ্ডু মশায়—"হাঁসটাও এইখানেই রইল।

একটু দেখা শোনা কোরো, বুঝলে, আমি দেওঘর চলে যাচ্ছি আজই।"

"বেশ।"

সৌদামিনী মাথার কাপড়রটা একটু টেনে, আঁচলটা গায়ে ভালো করে' জড়িয়ে ভব্য হবার চেষ্টা করলে একটু।

"বাবু তোমাকে পয়সা দেবেন, গুগ্‌লি টুগ্‌লি এনে দিও, বুঝলে?"

"বেশ তা দেব" তারপর দিবসের দিকে চেয়ে বেশ ভদ্রভাবেই বললে, "যা যখন দরকার হবে বলবেন আমাকে আমি পাশেই আছি"—বলে' ঈষৎ হেসে চলে গেল।

দিবসের শরীরটা সেখানে দাঁড়িয়েছিল বটে কিন্তু মনে মনে সে ফিরে গিয়েছিল বাড়িতে; তার বাবার কাছে, ব্রজর কাছে। বিঘ্ন-লেশহীন আবেষ্টনীতে নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রীর তথ্য আহরণ করে' অথবা সরোদ আলাপ করে' এমন কি উকীল হয়েও যে নির্ঝঞ্ঝাট মধ্যবিত্ত জীবন সে যাপন করতে পারত তার থেকে স্বেচ্ছায় চ্যুত হয়ে হঠাৎ এই খোলার ঘরে এসে মহেন্দ্র কুণ্ডুর হাঁসের তত্বাবধানে নিযুক্ত হ'তে তার আপত্তি ছিল না (এক নজর দেখে সৌদামিনীকেও তার ভাল লেগেছিল) —কিন্তু এই ছবির মধ্যে বাবা আর ব্রজ যদি থাকত, অযৌক্তিকভাবে মনে হল তার এবং হঠাৎ রাগ হল তারপর। কেন বাবা তাকে এমন ভাবে বাধা দিলেন? ডিম ভেঙে যে পক্ষী-শিশু বেরিয়েছে, যার পালক গজিয়েছে, যে উড়তে শিখেছে সে কোন্ ডালে কতক্ষণ বসবে এ রকম উদ্ভট ফরমাস কোনও পক্ষী-পিতা করে না তো, কিন্তু,—সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হল, পক্ষী-শিশু যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় তখন বাপ মার সঙ্গে সম্পর্ক থাকে কি তার? তার কি মন কেমন করে'? এই মন কেমন করার মাধুর্য-রসে তলিয়ে গেল তার সমস্ত চিত্ত পরমুহূর্তে। যাদের কাছে আর সে ফিরে যাবে না, যেতে পারবে না, তাদের

জন্যই আকুল হয়ে উঠল তার অন্তর, আর আকুল হয়ে উঠল বলেই মনুষ্যত্বের একটা সূক্ষ্ম আনন্দ রসায়িত করে' তুলতে লাগল তার বেদনাকে, তার অজ্ঞাতসারেই।

"ভাড়াটা দিয়ে দিন তাহলে, ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যাক। টিকিট, রসিদ বই সব সঙ্গে আছে আমার।"

কোটের বোতাম খুলে ভিতরের ফতুয়ার পকেট থেকে ছোট একটি রসিদ বই বার করলেন মহেন্দ্র কুণ্ডু।

"উনচল্লিশ টাকা তো?"

"ওটা পুরোপুরি চল্লিশই করে দিন, চৌকিটাতো ব্যবহার করবেন?"

"বেশ।"

চৌকিটার উপর দিবস অনেকক্ষণ বসেছিল একা চুপ করে'। সৌদামিনীর কথায় তার চিন্তাধারা মোড় ফিরল হঠাৎ।

"আপনার জিনিসপত্তর কই?"

"আনব, কিনে আনতে হবে সব।"

"ভালো দেখে ফুল-ঝাড়ু আনবেন তাহলে একটা। ভাল করে' পরিষ্কার করে দেব ঘরটা। আপাতত আমার যেটা আছে সেইটে দিয়েই দিচ্ছি।"

"ও আচ্ছা।"

আর কিছু না বলে' দিবস উঠে বেরিয়ে চলে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতেই লাগল সে। যে সব জিনিস কেনবার জন্যে সে বেরিয়েছিল, এখানে থাকতে গেলে যে সব জিনিস তাকে কিনতেই হবে অবিলম্বে, সে সবের দোকান একের পর এক অনেকগুলো পেরিয়ে গেল। যে নিঃসঙ্গতা কেবল

ভিড়ের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব তার মধ্যেই মুক্তি পেয়েছিল সে খানিকক্ষণের জন্যে এবং খানিকক্ষণের জন্য বোধ হয় নিঃসঙ্গচারী গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতুর ধর্মও লাভ করেছিল, যে ধর্মের মূল প্রেরণা গতি, উদ্দেশ্য নয়। কবি রবীন্দ্রনাথের কল্পনা যে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল এবং যার অসম্পূর্ণ ইতিহাস তিনি ছন্দে গেঁথে রাখবার চেষ্টা করে' গেছেন (কারণ নিরুদ্দেশ যাত্রার সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখা যায় না) সে রকম নিরুদ্দেশ যাত্রা আমরা সবাই করি মাঝে মাঝে কিন্তু জানতে পারি না। ঠিক এই সময় দিবস যে বস্তুনিচয়কে অতিক্রম করে' যে পথে দ্রুতবেগে চলেছিল, তার বর্ণনা নানা প্যাটার্ণের বাড়ি, মানুষ, ডাস্টবিন চিঠি ফেলবার বাক্স, টেলিগ্রামের খাম, দোকান, রিক্সা, ট্রাম, 'বাস' নয়,—তার বর্ণনা, (যদি তা বর্ণনা করা আদৌ সম্ভব হয়), মহাশূন্যের অসীম ব্যাপ্তি, দূরে দূরে খদ্যোতপুঞ্জের মতো জ্বলমান শত সহস্র সৌরলোক, মন ছুটে চলেছে সেই দেশের উদ্দেশ্যে যেখানে সবই অপার্থিব, যেখানে আলোক ভেঙে পড়েছে সপ্ত বর্ণে নয়, সহস্র বর্ণে, ছায়াপথের অজ্ঞাত জ্যোতিষ্কপুঞ্জ যার নাগাল পাওয়ার জন্যে স্পন্দিত হচ্ছে আহগ্র-তরঙ্গের অবর্ণনীয় ছন্দে…।

"দিবু দা যে—"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দিবস পরেশের ডাকে। স্কুলে কলেজে যে অসংখ্য ছেলেদের সঙ্গে মুখচেনা হয় কিন্তু অন্তরঙ্গতা থাকে না পরেশ সেই পরিচিত-অথচ-অপরিচিত গোষ্ঠীর একজন। দিবসের চেয়ে নিচের ক্লাসে পড়ত পরেশ।

"কি খবর, অনেক দিন পরে দেখা," পরেশই হেসে বললে আবার।

বলবার মতো অনেক খবর ছিল, কিন্তু সে সব খবর পরেশকে বলা যায় না। মনের নেপথ্যলোকে যে সমস্যাটা বিব্রত করছিল তাকে সেইটেই বাঙ্ময় হয়ে উঠল হঠাৎ প্রশ্নাকারে।

"কোনও একটা কাজের খোঁজ দিত পার ভাই ?"

"ও ! কি কাজ, পড়া ছেড়ে দিয়েছেন না কি ?"

"হ্যাঁ, যে কোনও কাজ"—তারপর একটু হেসে—"কেরানীগিরি ছাড়া।"

দিবসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখে পরেশ মনে মনে হাসলে।

"আমি কিন্তু একটা কেরানীগিরি পেলেই বেঁচে যাই। দরখাস্ত করেছি কয়েক জায়গায়। ও হ্যাঁ তো"—হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে পরেশ একটা কাগজ বার করলে।

"প্রাইভেট ট্যুশনির খবর দিতে পারি কয়েকটা। আমি চেষ্টা করেছিলাম, হয় নি। আপনার হয়ে যেতে পারে। ওটা রেখে দিন আপনার কাছে। চেষ্টা করুন একে একে, যেটা লেগে যায়।"

প্রাইভেট ট্যুশনি যে কেরানীগিরির চেয়ে মহত্তর পেশা এ মোহ দিবসের থাকবার কথা নয় কিন্তু তবু সে হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে পকেটে পুরল তার কারণ শুধু যে সে অন্যমনস্ক ছিল তা নয়, অল্প-পরিচয় পরেশের কাছে নিজের মতবাদটা (যা খুব মৌলিকও নয়) আস্ফালন করতে সঙ্কোচ হচ্ছিল তার। বাবার কাছে আস্ফালন করেই যথেষ্ট অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল সে।

"আচ্ছা চলি"—পরেশের 'বাস' এসে পড়ল পর মুহূর্তেই। দিবস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল। ফাঁক পড়ল তার চিন্তাধারায়। আর সেই ফাঁক দিয়ে হুড়মুড় করে' ঢুকে পড়ল—কাপড়, জামা, গামছা, গেঞ্জি, বিছানা, আলো, টেবিল, চেয়ার, ফুলঝাড় ...আসন্ন জীবনের অতি রূঢ় দাবীর ফর্দটা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উপর্য্যুপরি দু'দুটো নিদারুণ সংবাদ পেয়ে চুনীলালের মুষড়ে যাবার কথা। মুষড়ে হয়তো গিয়েছিলও। কিন্তু অন্নদা বিশ্বাসের কাছে তা প্রকাশ করে' ফেললে যে অদূর ভবিষ্যতে আরও মুষড়ে পড়বার কারণ ঘটবে, এটুকু অনুমান করতে তার পোড়-খাওয়া বুদ্ধির দেরি লাগেনি। তাই কথাটা শুনে সে ভ্রূ কুঁচকে দুই কুঞ্চিত ভ্রূর মাঝখানে টোকা মারতে লাগল এবং তারপর মসৃণ-ভ্রূ হয়ে উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে অন্নদা বিশ্বাসকে হবু রাষ্ট্রভাষাতেই আশ্বাস দিলে—"কুছ পরোয়া নেই।"

একটু আগে গোবিন্দ সাণ্ডেল তাকে জানিয়ে গেছেন যে হরলাল সিংহি নালিশ ঠুকে দিয়েছে, নির্দিষ্ট দিনে টাকা দাখিল না করলে জেল অনিবার্য। নির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই চুনীলাল হরলালকে টাকা দিয়ে দিত। কিন্তু দেবার মতো টাকা তার নেই। কোনও কালেই ছিল না। টাকা রোজগার করবার উদ্দেশ্যেই সে ব্যবসা ফেঁদেছিল, কিন্তু, গোবিন্দ সাণ্ডেলের ভাষায়—বাঙালীর যা হয়—!

চুনীলালকে যাঁরা জুয়াচোর বা ঠক আখ্যা দেবেন তাঁদের সঙ্গে তর্ক করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। তর্ক করে' কারও মত বদলানো যায় না, আমার মতটা সত্য কি না তাও আমার জানা নেই, চুনীলালের চরিত্রও সবটা আমি জানি না। কিন্তু যতটুকু জানি তাতে চুনীলাল-প্রসঙ্গ উঠে পড়লেই একটা ছবি আমার মনে পড়ে যায়। স্বচক্ষে দেখেছিলাম ঘটনাটা। মাঝগঙ্গায় ডুবছিল একজন লোক। ডুবছিল বললে সবটা বলা হয় না। ফেনিল ঘূর্ণাবর্তের নিষ্ঠুর টানে তলিয়ে যাচ্ছিল অতলের দিকে অসহায় ভাবে। আমরা সবাই তীরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলাম। দর্শকদের মধ্যে একজন ধনী ছিলেন। তিনি

আর এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না। বলে উঠলেন—ওকে যদি কেউ বাঁচাতে পারে, নগদ একশ' টাকা দেব তাকে। তড়াক করে' লাফিয়ে পড়ল একটা ছোকরা এবং সাঁতরে এগিয়ে যেতে লাগল তার দিকে। মজ্জমান লোকটির বিপন্ন হাতটা দেখা যাচ্ছিল শুধু মাঝে মাঝে। যে ছোকরা তাকে বাঁচাতে গেল সে কাছাকাছি হতেই কিন্তু ঘটল আর এক কাণ্ড। ডুবন্ত লোকটি এমনভাবে জাপটে ধরলে তাকে যে দুজনেই ডুবে গেল। কেউ বাঁচল না। উপচিকীর্ষু ব্যক্তিটি যদি মজ্জমান প্রথম ব্যক্তিকে অকৃতজ্ঞ বলে' পরলোকে গিয়ে তার নামে নালিশ করে সে ঠিক কাজ করবে কি না তাও জানি না। চুনীলালের কথা মনে হলেই কিন্তু ছবিটা ভেসে ওঠে মনে। আর একটা কথাও মনে হয় যে আমাদের সমাজে অধিকাংশই চুনীলাল—যে চুনী-লালদের ভীষণ সমাজব্যবস্থা এবং ভীষণতর রাষ্ট্রব্যবস্থা নামক দু'টি সিংহের সঙ্গে অহরহ লড়তে হচ্ছে একটা বদ্ধ অঙ্গনের মধ্যে। প্রাচীন রোমে এই ধরনের একটা খেলা ছিল শুনেছি। সেই স্থূল ব্যাপারটা একটু সূক্ষ্মতর হয়েছে আধুনিক যুগে। নরখাদক সিংহগুলোর আকার বদলেছে। আর একটু তফাতও হয়েছে। পরিবার ঘাড়ে করে' লড়তে হচ্ছে এদের। তারা একাই লড়ত···

"কুছ পরোয়া নেই, মানে? বিকাশবাবু যদি এখন গা না করেন তাহলে তো গেলাম আমি। পরিবার যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে যে আমি পোস্টফিস থেকে টাকা বার করে'—"

অন্নদা বিশ্বাসের কণ্ঠস্বর কাঁদো কাঁদো হয়ে এল। চুনীলালের দুটি হাত ধরে নিরর্থক জেনেও তিনি আবার বললেন, "দেখো ভাই আমার টাকাগুলো যেন মারা না যায়। ওই আমার যথাসর্বস্ব। আমাকে যা করতে বল আমি করতে রাজি আছি।"

চুনীলালের কণ্ঠস্বরও কাঁদো কাঁদো হয়ে আসা উচিত ছিল, কিন্তু প্রত্যেক খেলোয়াড়, লেখক বা অভিনেতার যেমন স্বকীয়তা থাকে, চুনীলালেরও তেমনি ছিল। অন্নদা বিশ্বাসের নকল না করে' দক্ষ সেনাপতির মতো তিনি বললেন, "ডিটেল্‌স্ সংগ্রহ কর।"

"কিসের ডিটেল্‌স্?"

'কোথায় প্রেমে পড়েছে, কার প্রেমে পড়েছে, কিভাবে প্রেমে পড়েছে—' এসব খবর পেলে চুনীলাল যে অবিলম্বে কিস্তি মাৎ করে' ফেলতে পারবেন তা নয় কিন্তু এসব খবর জোগাড় করতে অন্নদা বিশ্বাসকে বেশ কিছু সময় ব্যয় করতে হবে এবং সময়ের মধ্যে চুনীলাল হয়তো কিছু—এই 'হয়তো কিছু'টা যে কিরূপ নেবে তা চুনীলাল এখনও জানে না—হয়তো জামাইবাবু (মানে, গহনচাঁদ) 'সঙ্গীত ভবন' ব্যাপারাটাকে টাকাকড়ি দিয়ে সার্থক করে' তোলবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠতে পারেন (এ কল্পনাটা কিন্তু আকাশকুসুমই মনে হচ্ছিল চুনীলালের, কারণ, প্রথমত জামাইবাবুর টাকা নেই, দ্বিতীয়ত দারিদ্র্য সত্ত্বেও তাঁর ভাবভঙ্গীটা সেকেল মার্কা, দোকান করা দূরে থাক, মাইনে নিয়ে ছাত্রছাত্রীকে গানবাজনা শেখাতেও তিনি রাজি নন, বিদ্যা বিক্রয় করা না কি মহাপাপ! তবে একটা ভরসা আছে। রঞ্জনার বিয়ের জন্যে টাকা ঋণ করতে হবে তাঁকে এবং সেই ঋণ শোধ করবার জন্য উপার্জনের রাস্তা খুঁজতে হবে একটা, সেই দিক থেকে 'সঙ্গীত ভবন'-এর আর্থিক সম্ভাবনাটা হয়তো উপেক্ষা না-ও করতে পারেন তিনি, যদিও 'সঙ্গীত ভবন'টাকে অর্থকরী করতে হলে আরও টাকা ঢালতে হবে ওতে, মানে আরও ঋণ করতে হবে, কিংবা হয়তো মাণিকলাল (চুনীলালের শালা) কিছু সাহায্য করতে পারে তাকে এই দুঃসময়ে, লটারিতে বেশ কিছু পেয়েছে সে সম্প্রতি, পদ্মমুখীকে (চুনীলালের স্ত্রী) পাঠাতে হবে তার কাছে একবার,

সাহায্য না করে ধার দিক, কিংবা (মাণিকলাল যদি 'ফেল' করে তাহলে) অগত্যা কাবুলীওলার শরণ নিতে হবে—কেবল অন্নদাকে কোনও ওজুহাতে দিন কয়েকের জন্য সরিয়ে দিয়ে হাঁফ ছাড়তে চাইল চুনীলাল। মকোর্দমারও তারিখ পড়ে, সময় পাওয়া যায়, এ লোকটা দম ফেলতে দিচ্ছে না, ছিনে জোঁকের মতো আঁকড়ে আছে···।

'ডিটেল্‌স্' পেলে চুনীলাল যে নিশ্চয় কিছু করতে পারবে অন্নদার কিন্তু এ বিশ্বাস ছিল। চুনীলাল যদিও তাকে ডুবিয়েছে কিন্তু চুনীলালের উপর আস্থা হারায় নি সে। বস্তুত অবস্থাটাই অন্নদা-বিশ্বাস-জাতীয় লোকেদের একমাত্র অবলম্বন জীবনে। অনেকবার অনেক রকমে হতাশ হয়েও এরা বিশ্বাস হারায় না। ভগবানের কাছে অনেক প্রার্থনা করেছে, একটাও সফল হয় নি, তবু ভগবানের প্রতি অচল বিশ্বাস এদের। শুধু ভগবান নয়, মাদুলি, বড় সাহেব, টাকা, অদৃষ্ট প্রভৃতি বহু বিচিত্র জিনিসের উপর বিশ্বাস করে করেই বিচিত্র জীবনাদর্শন গড়ে তুলেছে এরা।

সোৎসাহে অন্নদা বিশ্বাস তাই বললে, "সমরেশের কাছ থেকে কিছু কিছু খবর পেয়েছি।"

তার মনে হল এই খবরগুলোর প্রভাবেই হয়তো তার ডুবে-যাওয়া টাকাগুলো উদ্ধার হয়ে যাবে কোনও অভাবিত উপায়ে। চুনীলালের বুদ্ধিমত্তার উপর সত্যিই প্রগাঢ় আস্থা ছিল তার।

"সমরেশ কে?"—অন্যমনস্ক চুনীলাল প্রশ্ন করলে আত্মস্থ হয়ে—"ভদ্রলোকের নাম তো বিকাশ বলেছিল?"

চুনীলাল বিকাশবাবুর সম্বন্ধে কিছুই জানত না। বিকাশবাবু অন্নদা বিশ্বাসেরই আবিষ্কার। অন্নদার সময়ক্ষেপের ওজুহাত হওয়া ছাড়া বিকাশবাবু যে সত্যি কোনও কাজে লাগতে পারেন সে বিশ্বাস চুনীলালের মোটেই ছিল না। ওই নিয়ে অন্নদা যতক্ষণ ভুলে থাকে

থাক এই ছিল চুনীলালের মনোভাব। অন্নদা কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে এমন একটা খবর এনেছিল যা শুধু চুনীলালের কেন অনেকেরই চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিলে কিছু কালের জন্য।

"সমরেশ? বাঃ কাল তোমায় বললুম না, সমরেশ হল আমাদের আপিসের দাস মশায়ের আপন পিসতুতো শালা। ওঁর থ্রু দিয়েই তো ধরেছি বিকাশবাবুকে। বিকাশবাবুর সঙ্গে সমরবাবুর খুব বন্ধুত্ব কি না। দাস মশাই হেল্প্ না করলে অতবড় লোকের নাগাল পাওয়া কি আমাদের মতো হেঁজিপেঁজি লোকের কর্ম ভাই। আমরা হলুম—"

অন্নদা যে সুরে কথাটা আরম্ভ করেছিল অর্থাৎ সে অতি দীন দরিদ্র নগণ্য ব্যক্তি, নিতান্ত সৌভাগ্যবশতই কারও থ্রু দিয়ে সে প্রকাণ্ড একটা লোকের সন্ধান পেয়ে যেন বর্তে গিয়েছে—এটা তার অতি প্রিয় সুর। এই সুরটাই আলাপ করছিল সে এবং চুনীলাল বাধা না দিলে আরও খানিকক্ষণ হয়তো করত।

"সমরেশের কাছ থেকে কি খবর পেয়েছ সেইটেই বল না আগে"।

"ও হ্যাঁ। বিকাশবাবুর এক মাস্তুতো বোনের নাকি বিয়ে হয়েছে দিন সাতেক আগে, দাঁড়াও—" হঠাৎ থেমে গেল অন্নদা।

"কি হল?"

"মাস্তুতো না পিসতুতো ঠিক মনে করতে পারছি না। মাস্তুতোই সম্ভবত—"

"ধরে নিলাম মাস্তুতো, তারপর কি বল।"

"মেয়েটি কলেজে পড়ে। তার বিয়েতে তার কলেজ-ফ্রেণ্ড এসেছিল জন কয়েক। তাদের একজনকে দূর থেকে দেখে—"

আবার থেমে গেল অন্নদা। যে কথাটা বললে ঠিক লাগসই হ'ত সেই কথাটাই আটকে গেল তার মুখে। সে নিজেই যেন এজন্য অপরাধী এই রকম একটা মুখভাব করে' আড়চোখে চাইতে লাগল চুনীলালের

দিকে। প্রেমে-পড়া ব্যাপারটা খুবই সড়গড় হয়ে গেছে আজকাল, ও নিয়ে আলোচনা করা মোটেই লজ্জার কথা নয়, তাছাড়া বিকাশবাবু ধনী লোকও, এসব ছোটখাটো কলঙ্ক মানায় তাঁকে। কিন্তু এটা যে কলঙ্ক এই সেকেলে বোধটা থাকতে অন্নদা থেমে গেল।

"দূর থেকে দেখে ভাল লেগেছে, এই তো ?"

"আর একটু বেশী" সলজ্জ হাসি হেসে বললে অন্নদা।

অন্নদার মুখের দিকে স্মিতমুখে চেয়ে রইল চুনীলাল। 'প্রেম' কথাটার সঙ্গে অন্নদার ভাসুর-ভাদ্দর-বৌ-শোভন এই আচরণে চুনীলাল বেশ কৌতুক অনুভব করছিল মনে মনে। এই জন্যেই— মানে এই সব সেকেলে সংকোচ এবং কুসংস্কারের জন্যই— অন্নদাকে চুনীলাল ভালবাসে। পরিহাস-তরল কণ্ঠে স্নেহের সুর লাগল তাই। একটু পরেই অন্নদা যে কথাটা বলবে, যা শুনে বিস্মিত চুনীলালকেও খানিকক্ষণের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তে হবে এবং যা অবশেষে নিমজ্জমান চুনীলালের চক্ষে ভেলা-রূপে প্রতীয়মান হবে, তার আভাস পেলে চুনীলালের কণ্ঠস্বর পরিহাস-তরল হ'ত কি না সন্দেহ। কারণ চুনীলালের চরিত্রে আর যে দোষই থাকুক প্রয়োজনীয় কাজের কথা নিয়ে ছ্যাবলামি করা তার স্বভাব নয়।

"বেশীটা কি রকম ? চটচটে, গদগদে, না গাঢ় ?"

"অতশত জানি না ভাই"—আর একটু বিব্রত হয়ে পড়ল অন্নদা— "তবে এই নিয়ে তার জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে ঝগড়া হবার উপক্রম হয়েছে নাকি শুনলাম। বিকাশবাবুর বাবা নেই, জ্যাঠামশাই বেঁচে আছেন, তিনি না কি কোথায় এক জায়গায় পঁচিশ হাজার টাকা পণ নিয়ে বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু এই মেয়েটিকে দেখবার পর বিকাশবাবু নাকি ওখানে আর বিয়ে করতে চাইছেন না। এই নিয়ে বাড়িতে হুজ্জৎ হচ্ছে, আমাদের ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেছে তাই—"

"কে বললে তোমাকে?"

"সমরেশবাবু, আমাদের আপিসের দাস মশায়ের থ্রু দিয়ে যাঁকে ধরেছিলাম তিনি।"

"মেয়েটির নাম কি, বাড়ি কোথায়, এসব ডিটেল্‌স্ জান কিছু?"

"বাড়ি কোথায় তা জানি না, তবে মেয়েটির নাম শুনলাম রঙ্গনা।"

"রঙ্গনা! বল কি!"

নিমেষের মধ্যে চুনীলালের মনে পড়ে গেল, রঙ্গনা—তার ভাগ্নী, রঙ্গনা—এক কলেজ-ফ্রেণ্ডের বিয়েতে গিয়েছিল। হ্যাঁ, দিন সাতেক আগেই। মনে পড়া মাত্র চুপ করে' গেল চুনীলাল। গুলি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে না মরলে বাঘ যেমন এক লাফে অদৃশ্য হয়ে যায় ঘন জঙ্গলে চুনীলালও অনেকটা তেমনি করলে যেন। তফাৎ অবশ্য ছিল। গুলি খেয়ে বাঘ দারুণ চিৎকার করে একটা, চুনীলাল টুঁ শব্দটিও করলে না। গুম্ হয়ে গেল।

অন্নদা চুনীলালের এ ভাবান্তর হয় লক্ষ্য করলে না বা এর তাৎপর্য বুঝতে পারলে না। রঙ্গনা যে চুনীলালের ভাগ্নী হতে পারে এ তার কল্পনাতীত ছিল। চুনীলালের হাতে সে যথাসর্বস্ব সমর্পণ করেছিল, তার সঙ্গে হৃদ্যতাও ছিল, তার আরও নানা খবর জানত সে (যথা, সে রেসে বেশ ভাল 'টিপ' দিতে পারে, ভাল মাছ ধরতে পারে, শেয়ার মার্কেটের ব্যাপার খুব ভাল বোঝে) কিন্তু তার যে রঙ্গনা নামে এক ভাগ্নী আছে এ খবর সে রাখত না। সে বরং কার কাছে যেন শুনেছিল এবং ঠিকই শুনেছিল যে চুনীলালের বউ নাকি বাঁজা। রঙ্গনার খবর সে জানত না। তাই চুনীলাল যখন চুপ করে গেল তখন অন্নদার মনে হল চুনীলাল বোধ হয় নূতন পরিস্থিতির জটিলতাটা সরল করবার উদ্দেশ্যে নূতন চাল ভাবছে কোনও। ওস্তাদ দাবা-খেলোয়াড় চুনীলালের চালের উপর সত্যিই আস্থা ছিল অন্নদার। সে উৎসুক নেত্রে চেয়ে রইল।

চুনীলাল চালই ভাবছিল। আহত বাঘের মতোই তার মন অতি দ্রুতবেগে ভেবে চলেছিল অতর্কিত এই ব্যাপারটাকে সামলানো যায় কি করে'।

"নাম কি ভদ্রলোকের ?"—হঠাৎ প্রশ্ন করলে সে।

"কার ? সমরেশের ? সমরেশ পাল।"

"আরে না, না, বিকাশবাবুর। কোন্ জাত, উপাধি কি ?

"ব্রাহ্মণ। বিকাশ চাটুজ্জে।"

শুনেই চুনীলাল বাঁ হাতে তুড়ি দিয়ে ফেললে সহসা কয়েকটা। অন্নদাকে যদিও সে খুলে বললে না কিছু, কিন্তু চকিতের মধ্যে সে একটা পথ দেখতে পেলে, মতিস্থির করে ফেললে এবং আশা করতে লাগল যে বিভিন্ন ধরনের বাধা সত্ত্বেও সুরাহা হয়ে যাবে বোধ হয় এইবার। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লৌহখণ্ডগুলোর মাঝখানে কোন এক অদৃশ্য হস্ত যেন চুম্বক রেখে গেল একটা। হঠাৎ খুশী হয়ে উঠলে ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে যায় চুনীলালের, কুঞ্চিত ভ্রূর তলায় চকচক করে চোখ দুটো খালি।

"অমন করে' দেখছ কি ?"

"বিকাশবাবুর ঠিকানাটা রেখে যাও আমার কাছে।"

ঠিকানাটা দিয়েই অন্নদা বিশ্বাস বুঝলে এইবার তাকে যেতে হবে, অর্থাৎ চুনীলালের কাছে এখন আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনও সার্থকতা নেই। কিন্তু যে অকুল পাথারে সে পড়েছে তাতে চুনীলালই একমাত্র ভরসা, চুনীলালকে কাছ-ছাড়া করতে ইচ্ছে করে না।

"আচ্ছা তোমাকে খবর পাঠাব আমি পরে। দেখি কতদূর কি করতে পারি"—চুনীলাল বললে।

"যাই কর, আমার টাকা ক'টা যেন ফিরে পাই ভাই। তুমি তো সবই জান, তোমার কাছে লুকোচাপা তো নেই কিছু।"

"কিছু ভেব না, ঠিক হয়ে যাবে সব"

"দেখো ভাই—"

"বিকাশবাবু আর তার জ্যাঠামশাই কি এক বাড়িতে থাকেন ?"—হঠাৎ প্রশ্ন করলে আবার চুনীলাল।

"আরে না না—দু'জনে আলাদা বাড়িতে থাকে। বিষয় সম্পত্তিও সব নাকি 'আলাদা"—চুনীলালের কাছে আর একটু থাকবার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেল অন্নদা বিশ্বাস—"বিকাশবাবু নিজে আর একটা আলাদা বাড়িও করাচ্ছেন, সেই জন্যেই তো ইলেকট্রিক গুড্‌স্ দরকার তাঁর—তাছাড়া দোকান করবারও ইচ্ছে—অগাধ বড়লোক তো—"

"তাহলে ওর বিয়েতে জ্যাঠামশাই ঝগড়া লাগাচ্ছেন কি করে' ?"

"বাঃ তা লাগাবে না ? হিন্দু ফ্যামিলি তো হাজার হোক !"

"ও"—সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবতে ভাবতে 'ও'টা বললে চুনীলাল।

"মণ্ডাটা কিছু নয়, তবু নৈবেদ্যর ওপরেই ওটাকে স্থান দিতে হবে। এই যে ধর না আমার বিয়ের সময়েই, কোথাও কিছু নেই, আমার মামা ফট্ করে' বেঁকে দাঁড়িয়ে মাতুল-বিদায় ফিদায়ের ফরকট তুলে এমন হাঙ্গামা বাধিয়ে তুললে যে বিয়েই পণ্ড হয়ে যাবার যোগাড়—"

অন্নদা বিশ্বাসের বিবাহের ইতিহাস শোনবার আগ্রহ চুনীলালের ছিল না। সে ভাবছিল অন্য কথা। ভাবছিল রঙ্গনার যে ফটোটা কিছুদিন আগে তোলান হয়েছিল সেটা আছে পদ্মমুখীর বাক্সে এবং সে বাক্সের চাবি আছে পদ্মমুখীর আঁচলে। বাড়ির কারও কৌতূহল উদ্রিক্ত না করে' ফটোটা কি করে' সংগ্রহ করা যায় এই কথাই চিন্তা করছিল চুনীলাল। পদ্মমুখীকে কিছু বললেই সে ঝংকার দিয়ে ওঠে। ব্যবসাটা ফেল করার পর থেকে ঝংকারটা আরও বেড়েছে। কিন্তু ফটোটা চাই…।

অন্নদা বিশ্বাস কিন্তু বলে চলেছিল—"শেষ পর্যন্ত মামা আরও

একশ' টাকা আদায় করে' তবে ছাড়লে। ওই যে বললুম না হিন্দু ফ্যামিলিতে বিয়ের ব্যাপারে গুরুজনদের অমর্যাদা করা চলে না, তা তিনি যত বড়ই না কেন—"

"আচ্ছা। তুমি যাও এখন।"

হঠাৎ বাধা পেয়ে একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল অন্নদা। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল তারা। চুনীলাল নিজের হাতঘড়িটার দিকে এক-নজর চেয়ে আবার বললে—"যা হয় তোমাকে খবর পাঠাব আমি।"

"বিকাশবাবুর সঙ্গে দেখা করবে ভাবছ?"

"দেখি।"

বিশেষ কিছু ভাঙতে চাইলে না চুনীলাল। হঠাৎ সে বাড়িমুখো হল দেখে অন্নদা বিশ্বাসকেও বাড়িমুখো হ'তে হল।

"আচ্ছা ফাইভ-বি নম্বরটা কোন্‌খানে হবে বলতে পারেন?" অন্যমনস্ক চুনীলালকে যে যুবকটি প্রশ্ন করলে সে যে অদূর ভবিষ্যতে যে জালটা চুনীলাল মনে মনে বুনতে বুনতে চলেছিল সেই জালটাই ছিন্নভিন্ন করে দেবে তা আন্দাজ করা চুনীলালের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুতরাং দিবসের মুখের দিকে ভাল করে' না চেয়েই সে উত্তর দিলে—"গলিটার ভিতর দেখুন" এবং আপন মনে ভাবতে ভাবতে চলতে লাগল ফটোটা এখনই যদি হস্তগত করা সম্ভব হয় তাহলে কি ভাবে সে টোপটা ফেলবে।

প্রত্যেক মানুষ নিজেকে জ্ঞাতসারে যে সব দোষগুণের সমষ্টি বলে' বিশ্বাস করে অজ্ঞাতসারে সে সেই সব দোষগুণগুলি অপরের উপরও আরোপ করে। অর্থাৎ সে নিজেকেই দেখে অপরের মধ্যে। অন্য প্রকার কোনও দর্শন যে সম্ভবই নয় এ জ্ঞান যখন তার হয় তখন তার মানসিক রূপান্তর ঘটে গেছে। ডিম হয়ে গেছে পাখি।

চুনীলালের সে অবস্থান্তর ঘটে নি। সংসার সমরাঙ্গনে যে সব অস্ত্র চালনা করে' সে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে তার ধারণা সকলেই সে অস্ত্র লাভ করবার জন্যে সমুৎসুক। স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে বিশেষ করে' তার ধারণাটা এত বেশী বস্তুতান্ত্রিক যে তার সবটা লিপিবদ্ধ করা যাবে না।

বাড়িতে ঢুকেই সুতরাং পদ্মমুখীকে আড়ালে ডেকে সে প্রথমেই দু'খানা দশ টাকার নোট বার করে' দিলে।

"কোথা পেলে টাকা? আবার ধার করলে নাকি?"—সবিস্ময়ে জানতে চাইলে পদ্মমুখী।

টাকাটা সত্যিই যে ধার করতে হয় নি এতে বাস্তবিক চুনীলালও খুবই আনন্দিত হয়েছিল মনে মনে। বালুকাস্তূপের উপর বসে বহুবার হতাশ হওয়া সত্ত্বেও যে বালক বালুর প্রাসাদ নির্মাণের স্বপ্ন ত্যাগ করে নি সে যদি সহসা একটা বালুকা-প্রাচীরকে খানিকক্ষণ অভগ্ন অবস্থায় দেখে তাহলে তার মনে যে আনন্দের শিহরণ জাগে প্রৌঢ় চুনীলালের মনেও সেই ধরনের শিহরণই জাগছিল একটা। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল তার এবং কুঞ্চিত ভ্রূর তলায় চকচক করছিল চোখ দুটো।

"রঙ্গনা কোথায়?"—নিম্নকণ্ঠে প্রথমে জিগ্যেস করলে সে।

"ছাতে। কার কাছ থেকে ধার করলে টাকাটা? জামাইবাবু টাকা দিয়েছেন তো কিছু আপাতত।"

"ধার করি নি। তবে ধার কথাটার সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে বলতে পার। বুদ্ধির ধারও তো ধার"—বলেই হেসে ফেললে চুনীলাল।

"ঊর্মি আর সরলা ব'লে দুটি ছাত্রী আজ ভর্তি হ'ল গানের স্কুলে।"

"গানের স্কুল সত্যি খোলা হবে নাকি?"

স্মিতমুখে চেয়ে রইল চুনীলাল। অপেক্ষা করতে লাগল। পদ্মমুখী ঝংকার একটা দেবেই সে জানত।

"সব কর্ম্মে হয়েছ যশী বাকি আছে এখন ভীম একাদশী।

ইন্‌সিওরের দালালী হ'ল, ইলেকট্রিকের দোকান খোলা হল, শেয়ার মার্কেটে ফাটকা খেলা হল এবার বাকি আছে গানের ইস্কুল।"

"একের পর এক চেষ্টা তো করেই যাচ্ছি, লাগছে না কি করব বল। ইলেকট্রিকের দোকানটা যে এমনভাবে ডুবে যাবে কে জানত!"

"আমি জানতাম। দোকান না খুললে দোকান চলবে কেন? দোকান কি খুলতে কখনও? আজ মাছ-ধরা, কাল রেস খেলা—"

"গানের স্কুল কিন্তু হু হু করে' চলবে দেখো। জামাইবাবুর যে রকম নাম।"

"কিন্তু উনি কি মাইনে নিয়ে তোমার গানের স্কুলের মাস্টারি করবেন?"

"তা কি করতে পারেন কখনও? উনি সঙ্গীতবিদ্যা বিতরণ করবেন। মাইনেটা নেব আমি, অবশ্য একটু গোপনে। দেখো জামাইবাবু বা রঙ্গনা যেন এ টাকার কথা ঘুণাক্ষরে জানতে না পারে।"

"এটা কি উচিত হবে!"

পদ্মমুখীর কণ্ঠস্বর মোলায়েম হ'য়ে এল একটু। মুখে সে যতই ঝংকার দিক ভিতরে ভিতরে সেও কম ভীত হয় নি। এই বাজারে উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেলে ভবিষ্যতে চলবে কি করে এ ভয় তারও হয়েছিল। ভাগ্যে জামাইবাবু এসে পড়েছেন তাই দৈনিক সংসার খরচটার জন্যে অপরের কাছে হাত পাততে হচ্ছে না। শেষে তার বাপের দেওয়া গয়নাগুলোও যাবে না কি? এই সব ভয়াবহ চিন্তার আগুনে চুনীলালের নবোদ্ভাবিত উপার্জন-কৌশল—তা সে যতই অযৌক্তিক হোক না কেন—কিঞ্চিৎ বারি-সিঞ্চন করলে যেন। চুনীলালের পরবর্তী কথাগুলোতে কিছু যুক্তির আভাসও পেলে পদ্মমুখী।

"খুব হবে, খুব হবে। এ বাবা ব্ল্যাক মার্কেটের যুগ, সোজা রাস্তায় কিছু হবার জো নেই। তুমিও ওঁকে একটু অনুরোধ কর

থাকতে। আজ উনি যখন খেতে বসবেন তখন পাখাটা হাতে নিয়ে কাছে বোসো, বুঝলে, শালাজের অনুরোধ ঠেলতে পারবেন না—”

“কত রঙ্গই যে জান!”

হেসে ফেললে পদ্মমুখী। হাতে নগদ কুড়িটা টাকা পেয়ে সত্যিই চিত্ত কিন্তু বিগলিত হয়ে গিয়েছিল তার। তার ওই হাসি যে মর্মন্তুদ অশ্রুরই রূপান্তর একথা ভাল করে' হৃদয়ঙ্গম করে নি বলেই হাসিটা ভারী সুন্দর দেখাল। ক্ষণিকের জন্য চুনীলালও নূতন করে' মুগ্ধ হল আবার, ফিরে গেল অতীতের সেই পরম মুহূর্তটিতে যখন সে পদ্মমুখীকে প্রথম দেখেছিল। শুভদৃষ্টির সময় দেখা চেলি-গুণ্ঠিত চন্দন-চর্চিত মুখখানি ভেসে উঠল চোখের উপর। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় শাদা পাল-তোলা যে নৌকোটা তারা ভাসিয়েছিল ময়ূরাক্ষীর স্বচ্ছ জলে অনেক দিন আগে, কোথায় গেল সেটা? কোন্ নামহীন ঘাটে ভিড়েছে তা? ......অন্যমনস্ক হয় পড়ল চুনীলাল ক্ষণকালের জন্য। এবং এই চিন্তার সূত্র ধরেই ফিরে এল সে আবার বাস্তবলোকে।

“রঙ্গনার সেই ফটোটা যে তোলান হয়েছিল, কোথায় সেটা দাওতো” বলে' চুনীলাল একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল যেন মনে মনে। তার আবছা ভাবে যেন মনে হল যে রঙ্গনার সম্বন্ধে এখনই যে কথাটা সে শুনলে তাতে মামা হিসেবে এবং প্রচলিত সমাজবিধি অনুসারে তার চটে যাওয়া উচিত। কিন্তু তা না করে' সে......

“ফটোটা বাক্সে আছে।”

“দাও তো!”

“কি করবে এখন?”

“একটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছি।”

অপ্রস্তুত ভাবটা কেটে গেল চুনীলালের। প্রয়োজনের সঙ্গে

বিবেকের যখন সংঘর্ষ হয় তখন পুরাতন বিবেককে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়। নূতন বিবেক এসে তখন দখল করে সেটা

জানালাটা হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় খুলে গেল। খোলা বাতায়ন-পথে স্থর ভেসে এল একটা। ও ধারের ঘরে বসে গহনচাঁদ উদাত্তকণ্ঠে গান করছিলেন শিব-মানস-স্তোত্রটি—

আত্মা ত্বং গিরিজামতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং।
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ॥
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণ-বিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ব্বা গিরো।
যদযৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্॥

প্রচলিত সমস্ত শিবস্তোত্রগুলিতে স্থর বসিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন গহনচাঁদ। কোন্ কোন্ স্থর স্তোত্রে ঠিক লাগবে এই তাঁর প্রধান চিন্তা এখন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দৃশ্যমান অন্ধকার যে আসলে চোখের স্নায়ুমণ্ডলের উপর বহির্জগতের কতকগুলি অদৃশ্য তরঙ্গের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মাত্র, ওতে সত্যি সত্যি যে ভয় পাবার কিছু নেই, বস্তুত অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পাওয়ার শক্তি যে মানুষের চোখেরও আছে, যাকে আমরা আলো বলি তার উৎস যে জাতীয় জ্যোতিষ্ক অন্ধকারেই যে তারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বেশী, তাছাড়া ওই সূর্যালোকের মহিমা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করার জন্যেই যে অন্ধকারের প্রয়োজন এই ধরনের চিন্তার স্তোক সত্ত্বেও দিবসের মন হয়তো ভেঙে পড়ত যদি সদ্য-লব্ধ স্বাধীনতার আনন্দে সে ভরপুর হয়ে না থাকত। ভরপুরই হয়েছিল সে। মশগুল হয়েছিল। পুরাতন বন্ধনের ছিন্নমুখগুলো রক্তাক্ত হয়েছিল তখনও, জ্বালা করছিল, অসংখ্য উপলখণ্ড তার আনন্দ-নির্ঝরের পথকে দুর্গম করে' তুলছিল, অনিশ্চয়তার গাঢ় কুয়াসায় আচ্ছন্ন করে' রেখেছিল তার নবদিগন্তকে, কিন্তু তবু তার সমস্ত সত্তা গান গাইছিল যেন। উপলখণ্ডের বাধা গুলোই যেন স্বষ্টি করছিল নব নব ছন্দ।

উপর্য্যুপরি তিন জায়গায় প্রাইভেট ট্যুশনির চেষ্টা করে' ব্যর্থ-মনোরথ হয়েছে সে। মধ্যবিত্ত যে ভদ্রলোকটি তাঁর তিনবার-ফেল-করা ছেলেকে চতুর্থ বার পাশ করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি চাইলেন মাসিক পনর টাকা বেতনের বিনিময়ে ('তা আপনি এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা যতক্ষণ পড়িয়ে পারেন আমার আপত্তি নেই' ভদ্রলোকের কথাগুলো তখনও কানে বাজছিল দিবসের) তাঁকে দেখে রাগ হয় না, করুণা হয়। নিজের ছেলেকে দেখবার তাঁর নিজের সময় নেই। কারণ সকালবেলা

আপিসের তাড়া, আপিস থেকে ফিরে নিজেই তিনি ট্যুশনি করেন দু'জায়গায়, ফেরেন রাত্রি দশটায়। তাঁর স্ত্রীর সামর্থ্য বা সময় কোনটাই নেই। তিনি ব্যস্ত সংসার নিয়ে সম্ভবত। দশটি ছেলেমেয়ে ভদ্রলোকের। যে পনর টাকা তিনি দিবসকে দিতে রাজী হয়েছিলেন সে টাকাটা নিশ্চয়ই ওদের খাদ্য কমিয়েই সংগ্রহ করতে হ'ত ভদ্রলোককে (ঘরের দ্বার দিয়ে যে শীর্ণকান্তি কয়েকটি শিশু উঁকি মারছিল, তাদের মুখগুলো মনে পড়ল আবার) কারণ খাদ্য ছাড়া আর কিছু কমাবার উপায় নেই। বাড়িভাড়া দিতেই হবে, ভদ্রসমাজে চলাফেরা করবার মতো কাপড়ও কিনতেই হবে, লোকলৌকিকতা বজায় রাখতেই হবে, ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজে পড়াতেই হবে, দরকার হলে প্রাইভেট টিউটার রাখতেই হবে—কমানো যায় কেবল খাদ্যটা। কিন্তু খাদ্য কমিয়ে প্রাইভেট টিউটারের মাইনে সংগ্রহ করতে হচ্ছে যাঁকে তাঁর চোখে মুখে একটা লাটসাহেব-সুলভ ভাব ফুটে রয়েছে কেন, দ্বিতীয় যে ব্যক্তিটি (সেই আমাহার্স্ট স্ট্রীটের ভদ্রলোক) তার কেমিস্ট্রি-বিদ্যা কতটা জানবার জন্যে তাকে অ্যালকহল, অ্যাসিটোন আর অ্যালডিহাইডের পার্থক্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন (পড়াতে হবে তাঁর ম্যাট্রিক ক্লাসের ভাগ্নেকে, মাইনে মাসে কুড়ি টাকা) কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটু কথা কয়েই যাঁর নিজের বিদ্যা প্রকট হয়ে পড়ল শোচনীয়রূপে তাঁর চোখে মুখেই বা অমন সবজান্তাভাব উগ্র হয়ে আছে কেন এবং তিনি প্রাইভেট টিউটার পদপ্রার্থী যুবকমাত্রকেই মূর্খ মনে করেন কেন—এই সব কথাই দিবস ভাবছিল নানাভাবে। তাদের মুখচ্ছবিগুলো যতবারই মনে পড়ছিল তার ততবারই মনে হচ্ছিল ওগুলো মুখ নয় মুখোশ। কোনও বিশেষ প্রয়োজনে হয়তো বহুদিন আগে মুখোশটা পরেছিল ওরা কিন্তু খুলতে ভুলে গেছে। মুখের সঙ্গে মুখোশটা এমন বেমালুম এক হয়ে গেছে যে নিজেরাই ভুলে গেছে

যে ওটা মুখোশ। কিন্তু কোন্ প্রয়োজনে পরেছিল ওরা মুখোশটা? চাকরির? দাসত্বের? কতকালের চাকরি, কতকালের দাসত্ব...? সহসা অদ্ভুত একটা ছবি প্রত্যক্ষ করে' চমকে গেল সে। ওই মুখ দুটোকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলেছে যেন লক্ষ লক্ষ পা...আর্য...শক হুন দল পাঠান মোগল...ইংরেজ...।সুন্দর মুখ দুটোকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে দুমড়ে দিয়েছে, এখন মনে হচ্ছে মুখোশ। কিন্তু ওই মুখোশ ভেদ করেও তাদের আসল জৈবিক সত্তাটাও আত্মপ্রকাশ করছিল (সে সত্তাটাকে বাঁচাবার জন্যে মুখকে মুখোশ করেছে তারা) সেটাকে কিছুতেই লুকোতে পারছিল না কেউ..."ছেলেটি দেখতে ভাল, লেখাপড়াও জানে, উপাধি কিন্তু বলছে চৌধুরি, চৌধুরি উপাধি অনেক জাতেরই হয়" পাশের ঘরের নিম্নকণ্ঠের যে আলাপটা শুনে ফেলেছিল দিবস সেইটেই আবার বেজে উঠল কানে। "কমলির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব? কিন্তু তার আগে ওর জাতটা কি জেনে নেওয়া উচিত"—তৃতীয় যে স্থান থেকে চলে' আসতে হয়েছিল দিবসকে—যারা দিবসের জাত জানতে চায় (কোষ্ঠি এবং ব্যাংকের খবরও জানতে চাইত যারা নিশ্চয় কিছুদিন পরে)—যারা তাদের যুবতী কন্যাকে রবীন্দ্র-সাহিত্যে পারদর্শিনী করবার জন্যে দিবসকে প্রাইভেট টিউটার রাখতে চেয়েছিল মাসিক কুড়ি টাকা মাইনে দিয়ে—তাদের জৈবিক সত্তাটা যে মুখোশের তলায় আত্মগোপন করেও ব্যর্থকাম হচ্ছিল বারংবার সেই মুখোশটার বিচিত্র চেহারাটার কাথাই ভাবতে ভাবতে পথ চলতে লাগল দিবস। তারা সমাজের (যা, দিবসের মতে, জুতোর মতো বারংবার বদলানো দরকার) সব রকম নিয়ম বাঁচিয়ে সমাজবিধি লঙ্ঘন করতে চায়, কন্যাকে অসূর্যম্পশ্যা রেখেও টোপ স্বরূপ ব্যবহার করতে চায় এবং ধৃত মৎস্যটির কুল কোষ্ঠিবংশ সঙ্গতি বিচার করতে চায়। কোন 'কন্‌কেভ্' দর্পনের সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত জাতটাকে এমন বীভৎস দেখাচ্ছে, কোথায় সে আয়নাটা; সেইটেকেই

চুরমার ক'রে ফেলা উচিত আগে। যে বীভৎস ছবিগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো ছবি নয় প্রতিচ্ছবি, বিকৃত প্রতিচ্ছবি, যে ছবিগুলো আড়ালে আছে সেগুলো সুন্দর, অতি সুন্দর···মহৎ, শিল্পী, স্নেহশীল, স্বাতন্ত্র্যকামী, স্পষ্টবাদী, সাহসী, প্রতিভাধর বাঙালী নর-নারীর একটা মিছিল ফুটে উঠল তার মানসপটে···হ্যাঁ, ওই বাঁকাচোরা আয়নাটাকে, ওই ঝুটো-আত্মসম্মানের দর্পণটাকে সরিয়ে দিতে হবে, যে আত্মসম্মানের ভিত্তি আত্মপ্রত্যয় নয় আত্মবঞ্চনা, অবলুপ্ত করতে হবে সেটাকে, যুবতী মেয়েকে কাছে ভিড়িয়ে দিয়ে···হঠাৎ দিবসের মনে হল এই ভাল-লাগাটা, মানে যুবতী মেয়েকে ভাল লাগাটা, কিছু অন্যায় নয় তো, জীবনে সব কিছু ভাল লাগুক, সব কিছু মধুময় হ'য়ে উঠুক, এইতো আমরা চাই, ভাল-লাগাই তো আনন্দ (যে রঙ্গনাকে দেখে হঠাৎ ভাল লেগে যাবে তার সে যদিও তখন কল্পনার বাইরে ছিল তবু সে মনে মনে কল্পনা করে' চলেছিল যেন একটি তরুণীকে তার ভাল লেগেছে, তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তবু তাকে ভাল লাগছে), ওই রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগিনী মেয়েটিকে যদি তার ভাল লাগত কি ক্ষতি হ'ত তা'তে, সমস্ত মনটা বিষিয়ে উঠল কেন তার, পালিয়ে এল কেন, তখনই মনে হল তৃতীয় পক্ষের ভণ্ডামির জন্যেই খারাপ লাগল, ওই তৃতীয় পক্ষ মনে মনে চায় মেয়েটিকে তার ভাল লাগুক কিন্তু সত্যি সত্যি ভাল লেগে গেলে ওরাই ছদ্ম আতঙ্কে চীৎকার করবে সব চেয়ে বেশী এবং তারপর ভান করবে যেন সর্বনাশ হয়ে গেছে এবং সর্বশেষে দাবী করবে বিবাহ-মন্ত্রপূত করে' এই অশুদ্ধ ব্যাপারটাকে শুদ্ধ করে' না দিলে এমন একটা কাণ্ড করবে তারা···ওটা ফাঁদ, ওটা ষড়যন্ত্র তাই পালিয়ে আসতে হয়েছে, এবং পালিয়ে আসতে হয়েছে বলে' দুঃখ হচ্ছে, কমলির সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলে' ততটা নয় (কমলির সান্নিধ্যলাভের লোভ তার একেবারে ছিল না যে তা নয়)

যতটা কমলির বাপের মতলবের পরিচয় পেয়ে—দোমড়ানো, ত্যাবড়ানো, পাক-খাওয়া কি অদ্ভুত মন! কিন্তু আসলে ওটা ওরকম নয় মোটেই, নানারকম চাপে ওই রকম হয়ে গেছে···যে চাপে সাপ গর্তে ঢুকে পড়ে কিংবা ফণা ধরে, খরগোশ ঝোপে আত্মগোপন করে কিংবা পালায়···· বহুবিধ জীবজন্তু পক্ষী-পতঙ্গ গাছপালার বিচিত্র ছদ্মবেশের কথা মনে পড়ে গেল তার, আত্মরক্ষার কত বিবিধ আয়োজন জীব-জগতে। সবলের হাত থেকে দুর্বল আত্মরক্ষা করছে যে উপায়ে, (সে উপায়গুলো কখনও মনোহর কখনও ভীষণ), সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকেও কি সেই উপায়ে আত্মরক্ষা করতে হবে? যে মানুষ এত বিভিন্ন রকমে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করেছে (দিনকে রাত রাতকে দিন করেছে, ঘুচিয়েছে দূরত্বের বাধা সময়ের শাসন, বাড়িয়েছে দৃষ্টির সীমা শ্রবণ-শক্তির পরিধি, সংযত করেছে নিজেকে নানা অস্বাভাবিক উপায়ে) সেই মানুষদের মধ্যেও সবল দুর্বলের বিভেদ ঘুচবে না এখনও? এখনও চলবে সেই নিষ্ঠুর আদিম দ্বন্দ্ব? শ্রেষ্ঠ মানব মনীষা এখনও দুর্বল-দলনেই ব্যস্ত থাকবে? নিউক্লিয়ার এনার্জির সার্থকতা হবে অ্যাটম্ বমে? আগুন দিয়ে মানুষ ঘর পোড়াবে এখনও? হঠাৎ বাবার মুখটা মনে পড়ল। বাবাও ওই দলে। তিনিও তাঁর সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি ব্যবহার করছেন সবলদের বলবৃদ্ধি করবার জন্যে। দুর্বলের তিনি কেউ নন···হঠাৎ দিবস আশ্চর্য হয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে গেল নিজের মনের দিকে চেয়ে। তাঁর উপর রাগ হচ্ছে না তো! বরং···। কিছুদিন পরে যে তর্কটা সে বাবার সঙ্গে করবে তারই মহলা দিতে দিতে পথ চলতে লাগল সে। বাবার সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করবার একটা দুর্দম আকাঙ্ক্ষা টানতে লাগল তাকে বাড়ির দিকে। কিন্তু না, এখন নয়, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, স্বকীয় উপার্জনের পন্থা একটা ঠিক করে' তবে সে দেখা করবে বাবার সঙ্গে। এখন নয়······।

……ভজন গানটা শুনেই যে সে দাঁড়িয়ে পড়ল তা নয়। যে লোকটা পিছু ফিরে বসেছিল পিছন থেকে সে দেখতে ঠিক ব্রজর মতো। ভাল করে চেয়ে দেখলে জুতোর কারখানা একটা। যারা কাজ করছে তারা সবাই অবাঙালী। সেই বা জুতো তৈরি করতে পারবে না কেন? টলস্টয়ের মতো লোক তো জুতো তৈরি করতেন।

"এখানে কোনও কাজ খালি আছে কি?"

"কৌন কাজ?"

"তোমরা যে কাজ করছ।"

"বাবু ভেইয়া ইসব কাজ শেকবে কি?"

"দিয়েই দেখ না, ঠিক পারব।"

যে লোকটা পিছন থেকে ব্রজর মতো দেখতে সে কাঁচি দিয়ে চামড়া কাটছিল, তার মুখে একটা ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ হাসি ফুটে উঠল। কিছু বললে না সে, চামড়াই কাটতে লাগল। ভদ্রভাবে উত্তর দিলে আর একটি লোক।

"কাম নেহি খালি হ্যায় বাবু।"

দোকান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেবে আসতে হল দিবসকে ফুটপাথের উপর। টলস্টয়ের আদর্শ অনুসরণ করবার কোনও সুযোগ পাওয়া গেল না আপাতত। যে লোকটা পিছন থেকে ব্রজর মতো দেখতে সে যে অর্ধস্বগতোক্তিটা করলে তা শুধু যে দিবসের কান এড়াল না তা নয় মনে হ'ল উক্তিটা তার কান মলে' দিলে যেন।

"শৌখিন ধোতি পাঞ্জাবি পহিনকে ইসব কাম নেহি হোতা হ্যায়"… সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দিলে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে হাঁটতে লাগল। মনে হল কেউ যেন ঠেলছে তাকে, গলাধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাচ্ছে, দূর করে' দিচ্ছে যেন কর্মজগত থেকে, বলছে যেন ওরে ফোতো বাবু, কলম পিষতে পিষতে মুখে রাজা উজির মার গিয়ে, এসব তুই পারবি না…।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ সে দেখতে পেলে একটা কুলি আর একটা কুলির মাথায় মোট চড়িয়ে দিচ্ছে একটা। মোটটা কিন্তু এত ভারী যে একলা চড়িয়ে দিতে পারছেনা সে, দিবস ছুটে গেল তাকে সাহায্য করতে, আগ্রহ ভরে ছুটে গেল (না ছুটে গেলে যেন তার আত্মসম্মান আহত হচ্ছিল) কুলিটা কিন্তু তার সাহায্য নিতে চাইলে না। সে সাহায্য করতে চেয়েছে বলে কুলিটার চোখে মুখে একটা কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটে উঠল যদিও, কিন্তু দিবসের মনে হল একটু অবজ্ঞাও যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তার মধ্যে। 'আপ ছোড় দিজিয়ে বাবু'—এই কথাগুলোর মধ্যেই একটু খোঁচা ছিল যেন।

…ল্যাম্প-পোস্টে-সাঁটা কাগজের টুকরোটা দেখতে পেয়ে ধরবার ছোঁবার মতো কিছু পেলে যেন একটা সে অনেকক্ষন পরে। এতক্ষণ সে হাঁটছিল কেবল।…

"ফেরিওয়ালা চাই। খাবার ফেরি করিতে হইবে। বিশ্বাসযোগ্য লোক নিম্নলিখিত ঠিকানায় খোঁজ করিতে পারেন।"

ঠিকানাটা টুকে নিয়ে আবার সে হাঁটতে লাগল। একটা উৎসাহ পেল যেন সে আবার। অতি তুচ্ছ জিনিসের জন্যও ছেলেবেলায় তার যে উৎসাহ যে আগ্রহ জাগত (একটা ছোট হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশি পাওয়ার জন্য সে চেতলা পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিল একবার, একটা কুকুর বাচ্চা আনবার জন্য হাওড়ার পুল পার হয়ে চলে গিয়েছিল ছেলেবেলায় যখন সে স্কুলে পড়ে) সেই ধরনের একটা উদ্দীপনা জাগল তার ওই বিজ্ঞাপনটা দেখে। মনে হল ওই বিশেষ কাজটা পেলে সে যেন চরিতার্থ হয়ে যাবে। পেতেই হবে ওটা।…

…খাবারের দোকান। বেশ বড় দোকান। সামনেই যে ছোকরাটি বসে আছে সেও যেন মনুষ্যাকৃতি পানতোয়া একটি। কালো গোছের রং, গোলগাল, হৃষ্টপুষ্ট। বাঁহাতে একটি সোনার তাবিজ,

গলায় একটি সোনার সরু হার। মুখটি কচি, গোঁফ দাঁড়ি ওঠে নি। ভিতরের দিকে চৌকিতে বসে আছেন একটি ক্ষীণকান্তি বৃদ্ধ। বৃদ্ধ হলেও শৌখিন। আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে, পাকাচুলে তেড়িকাটা।

"এইটেই কি পঁচিশ নম্বর"—দিবস জিগ্যেস করলে। একটু ভয়ে ভয়েই জিগ্যেস করলে। পরীক্ষার 'হলে' ঢুকে যে ধরনের ভয় করত সেই ধরনের একটা অনির্দিষ্ট ভয় করতে লাগল তার।

"কি চাই আপনার"—ছোকরাটিই উত্তর দিলে।

"রাস্তায় আসতে আসতে দেখলাম আপনারা একটা ফেরিওলার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন—"

"হ্যাঁ, আছে কেউ জানাশোনা আপনার?"

"আমাকেই রাখুন।"

ছোকরার বর্তুলাকৃতি মুখ আরও বর্তুলাকৃতি হয়ে গেল। কোনও ছাগল এসে নিজমুখে যব মাড়বার প্রস্তাব করলেও এত বিস্মিত হ'ত না সে।

"আপনাকে!"

"হ্যাঁ, আমাকে। দিয়েই দেখুন না।"

দিবসের কণ্ঠস্বরে যে আন্তরিকতার সুর ধ্বনিত হল, যে সুর ধ্বনিত হয়েছিল ক্ষুদিরাম কানাইলালের কণ্ঠে, যে সুর বেজেছিল নেতাজির উদাত্ত বাণীতে, বস্তুত প্রেরণা-প্রবুদ্ধ বাঙ্গালীর কণ্ঠস্বরে যে সুর বেজেছে যুগে যুগে, সে সুরের মর্ম কিন্তু খাবারের দোকানদার বুঝলেন না। আদ্দির পাঞ্জাবী-পরা ক্ষীণকান্তি বৃদ্ধ খেঁকিয়ে উঠলেন।

"না মশাই, মাপ করবেন ভদ্রলোকের ছেলেকে ও কাজ আমরা দিতে পারব না।"

"একবার দিয়েই দেখুন না।"

দিবসের কণ্ঠস্বরের আকুলতাটা ন্যাকামি বলে ঠেকল বৃদ্ধের কানে। যে কারণে ঠেকল সেইটেই উল্লেখ করলেন তিনি এর পর।

"না মশাই, একবার দিয়ে শিক্ষা হয়ে গেছে। গরীব বাঙালী বলে' ভদ্রচেহারার এক ছোকরাকে রেখেছিলাম একবার। নগদ পঁচিশটি টাকা মেরে সরে' পড়েছে। পরাতটা পর্যন্ত ফেরত দেয় নি, সেই থেকে নাক কান মলেছি, আর নয়।"

সত্যি সত্যি তিনি নিজের নাক কান মলে' কার উদ্দেশে নমস্কার করলেন যেন। এবং তারপর বক্তব্য শেষ করলেন এই কথাগুলি দিয়ে—"আমাদের ওই ছোট লোকই ভাল"।

বিজ্ঞানের ছাত্র দিবস নিঃসংশয়ে অনুভব করলে যে কথাটা সত্য। অনবধানতাবশত কপাটের চৌকাটে মাথাটা সজোরে ঠুকে গেলে মনের যে রকম অবস্থা হয় দিবসের ঠিক তাই হ'ল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে ক্ষণকাল, তারপর মনে হল এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা অশোভন হচ্ছে, মনে হতেই সরে দাঁড়াল একটু। সরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল কি করবে এখন। হঠাৎ, কানে গেল সেই বৃদ্ধ বলছেন—"পাঞ্জাবি উড়িয়ে তেড়ি কেটে ফেরিওলাগিরি করতে এসেছেন। মতলববাজ চোর সব!"—শোনা মাত্রই মনে হল এটা সত্য নয়, এর প্রতিবাদ করা উচিত। দোকানের সামনে ফিরে এল সে আবার। চৌকাটে সজোর মাথা ঠুকে গিয়েছিল বলেই সম্ভবত প্রতিবাদটা একটু ঝাঁঝালো গোছের হয়ে গেল।

"একজন হয়তো আপনাকে ঠকিয়েছে, কিন্তু সবাইকে ওই দলে ফেলবেন না। আপনিও তো পাঞ্জাবি গায় দিয়ে তেড়ি কেটে বসে আছেন, আপনি কি চোর?"

মোটা ছোকরা ক্ষেপে উঠল।

"মুখ সামলে কথা বলবেন মশাই"।

"আরে যেতে দাও যেতে দাও"—চেঁচিয়ে উঠলেন সেই ক্ষীণকান্তি বৃদ্ধই আবার, (তাঁর গলার স্বর মোটেই ক্ষীণ নয়, অপ্রত্যাশিত রকম তীক্ষ্ণ বরং), দিবসের দিকে ফিরে বললেন—"আর কিছু কি বলবার আছে আপনার, না থাকে তো পথ দেখুন"—তর্জনী দিয়ে পথটা দেখিয়ে দিলেন।

তীক্ষ্ণ তীব্র তিক্ত সত্যটাকে নানাভাবে অনুধাবন করতে করতে পথ চলতে লাগল দিবস আবার। যে প্রচণ্ড হাতুড়িগুলো তার অহঙ্কারের জগদ্দল পাথরটার গায়ে ফাটল সৃষ্টি করেছিল সেই হাতুড়িগুলো যে সত্য, তার অহঙ্কারের পাথরটা যে চূরমার হয়ে যাওয়াই উচিত (নিজেই একটু আগে সে এই কথাই ভাবছিল) এ কথা মেনে নিয়েও তার মনে হচ্ছিল, না তবু প্রতিবাদ করা উচিত, কিন্তু ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না।

…রঙ্গনা কিন্তু ভাষা খুঁজে পেয়েছিল। সে তার কোনের ঘরটিতে বসে' বসে' চিঠি লিখছিল একজন আধুনিক লেখককে। যে কোনের ঘরটি চুনীলাল তাকে পড়াশোনা করবার জন্যে দিয়েছিল, সেই কোনের ঘরে বসেই সে পরিচয় লাভ করেছিল বৃহৎ বিশ্বের, স্বদেশ বিদেশের বহু লেখক ভিড় করে' আসত যেত ওই কোনের ঘরটাতেই। বর্তমান অগ্রগতির যুগে তার স্থান যে কত পিছনে, কত রকম শৃঙ্খল যে তার হাতে পায়ে মনে জড়ানো, উপার্জনের-জন্য-ব্যতিব্যস্ত তার মামার সদাশংকিত মুখভাবে সপ্রতিভতা ফুটিয়ে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা, নিরতিশয় ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তার মামীমার প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্বের শোচনীয় মৃত্যু এ সবই সে অনুভব করত তার ওই কোনের ঘরটিতে বসে। ওইখানে বসেই সে বুঝত যে তার চারিদিকেও জাল ফেলা হচ্ছে, তার বাবা কাশী থেকে এসেছেন ওই জন্যই, সেদিন হঠাৎ একজন ফেটোগ্রাফার এসে ফোটো তুললেন তারও কারণ ওই, বাবা ঋণ করেছেন, সবই শুনেছে

সে এই কোনের ঘরে বসে বসে এবং এই কোনের ঘরে' বসে বসেই সে অনবরত মনে মনে রচনা করেছে প্রতিবাদ। এই কোনের ঘরেই সে অনেক স্বপ্ন দেখেছে, অনেক কান্না কেঁদেছে।

সেদিন হঠাৎ সে ভাষা খুঁজে পেয়েছিল।

লিখছিল—"আপনার আঁকা কুসুমের ছবি অতি বাস্তব। এত বাস্তব যে অপমানিত বোধ করেছি। কুসুমকে দেখে মনে হয়েছিল ও বোধ হয় আমিই। আমাকেই বোধ হয় আপনি এঁকেছেন, আমাকেই দেখেছেন আপনার কল্পনার দূরবীন লাগিয়ে। তাই আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। মনে হয়েছে আমাদের জন্যে যাদের বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই, কণামাত্র সহানুভূতি নেই, যাঁরা আত্মতৃপ্তি সাধনের জন্য ছবি এঁকে চলেছেন কেবল, কি অধিকার আছে তাঁদের আমাদের এই নগ্ন মূর্তিকে লোকের কাছে বার করবার! আমাদের হ্যাংলামি, আমাদের ছলনা, আমাদের নীচতা, আমাদের দুর্বলতা আমাদেরই থাক, তা নিয়ে আপনাদের মাথা ঘামাতে হবে না। সত্যি কথা বলতে কি মাথা আপনারা ঘামানও না। লিখতে পারেন লিখে যাচ্ছেন; সত্যি সত্যি আমাদের জন্য ব্যথা অনুভব করে' যদি সমাজ সংস্কারের আন্দোলন চালাতেন প্রণাম জানাতাম আপনাকে। সেদিন শুনলাম একজন লেখক (যাঁর লেখায় স্ত্রীজাতির প্রতি দরদ জবজব করে) তাঁর স্ত্রীকে ধরে' মারেন না কি। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর তিনি না কি বিরোধী। আমাদের সমাজে কুসুমরা আছে, খুব ভালো করেই জানি। আমি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, নিজেকে চিনি, নিজের চারদিকে দেখিও, আমি জানি কি অবস্থা আমাদের। জীবনে কোনও আনন্দ নেই, সৌন্দর্য নেই, আশা নেই, নিজেদের যে কি অবস্থা তা বোঝাবার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। শুধু গ্রাসাচ্ছাদনটুকুর জন্য কি আপনার লাঞ্ছনা গঞ্জনা যে আমরা সহ্য করি। ওইটুকু পাবার জন্যই হাত জোড় করে'

দাঁড়িয়ে আছি সারি সারি ঘরে ঘরে। নিজেদের অবস্থাটা যে কি তাতো কাউকে বোঝাবার ক্ষমতা নেই, বোঝাতে গেলেও কেউ বুঝতে চায় না। চুপ করে থাকে, অনেক সময় হাসে, টিটকারিও দেয়। নিজেদের দুরবস্থার কথা শুনতে চায় না, তাদের এ দুরবস্থা যে কখনও ঘুচবে এ বিশ্বাসও তাদের নেই। মানুষকে বিশ্বাস করতে তারা ভুলে গেছে। তারা বিশ্বাস করে' কেবল তাদের হ্লাদিনী শক্তির উপর, যা ভাঙিয়ে তাদের এতকাল চলেছে। আপনার লেখায় একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের স্বর ফুটে উঠেছে। আমার কিন্তু ও নিয়ে ব্যঙ্গ করতে ভাল লাগে না, ওদের উপর রাগও করতে পারি না। আমি জানি আমরা একদিন জাগব। আমাদের মনুষ্যত্ব মরে নি, সেটা চাপা পড়ে গেছে শুধু। সমাজের কুৎসিৎ নিয়ম, নানারকম কুসংস্কার, মেয়েদের প্রতি সম্মান দেখানোর ছলে প্রতিপদে তাদের অপমান এ সব অতিক্রম করে' আমরা একদিন জাগব। যে দিন জাগব সেদিন হয়তো সুস্থ মনে আপনাদের —যাঁরা আমাদের ক্ষতের উপর লাথি মেরে মেরে আমাদের সচেতন করেছেন—ক্ষমা করতে পারব। লর্ড কার্জনকে পরাধীন ভারত যেমন ক্ষমা করতে পারেনি আমরাও তেমনি আজ আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে পারলাম না।" ভ্রূকুঞ্চিত করে লিখে চলেছিল রঙ্গনা, তার অধর স্ফুরিত হচ্ছিল।

—দিবস হাঁটছিল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল খুব। পাশের গলি থেকে একটা রিক্স বেরুল।

"এই রিক্স—"

রিক্সওয়ালা এগিয়ে এল তার দিকে।

"কাঁহা যানে হোগা হুজুর?"

"সোজা চিৎপুরের দিকে।"

দিবস রিক্সয় উঠে বসল। রিক্স চলতে লাগল। এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে একটা কাজ জোগাড় করতে পারে নি সে। কাজ কিন্তু জোগাড় করতেই হবে। যে ক'টা টাকা আছে তাতে ক'দিন চলবে? রিক্স টানলে কেমন হয়!

"আচ্ছা, রোজ কত করে' বাঁচে তোমার?" রিক্সওয়ালাটাকে জিগ্যেস করলে সে হঠাৎ।

"উসকা কই ঠিকানা নেহি হুজুর। তিন রুপিয়া, চার রুপিয়া"।

"আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারিস?"

"কোন কাজ?"

"রিক্সা টানার।"

রিক্সওয়ালা ঘাড় ফিরিয়ে হাস্যোদ্ভাসিত মুখে দিবসের দিকে চেয়ে দেখলে একবার। মনে করলে বাবু রসিকতা করছেন বোধ হয়।

"ই সব কাম বাবু ভেইয়াকো বাস্তে নেহি হুজুর। আপ নেহি সেকিয়ে গা—"।

দিবস নেবে পড়ল রিক্স থেকে। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বিদায় করে' দিলে তাকে। আবার হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে অদ্ভুত সব কথা মনে হতে লাগল তার। মনে হতে লাগল সত্যিই যখন টাকাগুলো ফুরিয়ে যাবে, যখন খাবার কেনবার পয়সা থাকবে না একটিও, তখনও যদি কাজ না পাওয়া যায় একটা, নিশ্চয়ই সে বাড়ি ফিরে যাবে না, কি করবে তাহলে? পণ নিয়ে বিয়ে করবে? হাসি পেল হঠাৎ। তার মতো নিঃস্বকে কন্যা সম্প্রদান করবে কে! কিন্তু যদি করত বেশ হত! স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে রোজকার করা যেত। বিয়ে করা বিষয়ে তার মত খুব বৈজ্ঞানিক। অল্প বয়সে বিবাহ করার পক্ষপাতি সে। তার ধারনা আজকাল ছেলে মেয়েরা বিবাহের দায়িত্বটা এড়িয়ে চলতে চাইছে বলেই আরও বেশী দায়িত্বহীন

হয়ে পড়েছে। গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে চায় সবাই রঙিন বেলুনের মতো। তার মতে পৃথিবীর সব জিনিসই যেমন স্ব স্ব স্থানে থেকে সুস্থ আছে মাধ্যাকর্ষণের টানে এবং হাওয়ার চাপে—সমাজের প্রত্যেক লোকও তেমনি ঠিক থাকে পারিবারিক আকর্ষণে এবং সমাজিক নিয়মের চাপে। আমাদের যুগটা যে বেঠিক পথে চলেছে তার কারণ পরিবার পালনের দায়িত্ব নিতে চায় না কেউ, সামাজিক নিয়ম অমান্য করবার দিকেই সকলের ঝোঁক বেশী। সামাজিক অনেক নিয়ম বদলানো প্রয়োজন, কিন্তু সেই পরিবর্তিত নিয়মও মানতে হবে। "আমি যা খুশী করব" অর্থাৎ তেমন কিছুই করব না, স্রোতে গা ভাসিয়ে থাকব কেবল, এই মনোভাব পছন্দ নয় দিবসের। পছন্দমতো পাত্রী পেলে সে বিয়ে করতে প্রস্তুত এখনই, এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও······প্রধান মন্ত্রীকে চিঠি লিখবে একটা? বেশী কিছু নয়, কেবল—আমি এম-এস-সি পাশ করেছি, পরিশ্রম করতে প্রস্তুত আছি, মানুষের মতো বাঁচতে চাই, আমাকে একটা কাজ দিন, যে কোন কাজ······তখনই মনে হল চিঠিটা তাঁর হাতে পৌছবেও না বোধ হয়, তাঁর সেক্রেটারী ভুরু কুঁচকে বা মৃদু হেসে ছিঁড়ে ফেলে দেবে সেটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে······চিঠি লেখার কথায় আর একটা কথা মনে পড়ে গেল তার······পরেশ তাকে যে ঠিকানাগুলো দিয়ে গিয়েছিল তার সব জায়গায় যাওয়া হয় নি, যাবার ইচ্ছেও নেই, সে ভেবেছে প্রত্যেক জায়গায় নিজের পরিচয় এবং ঠিকানা দিয়ে এক একটা চিঠি ফেলে দেবে, যদি কোথাও লেগে যায়······সামনে একটা পোস্টাফিসও পেয়ে গেল, এক গোছা পোস্টকার্ড কিনে একের পর এক চিঠি লিখে যেতে লাগল সে পোস্টাফিসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই······চিঠি লেখা শেষ করে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চা খেলে······চা খেতে খেতে মনে

হল কয়েকটা জিনিস কেনা হয় নি এখনও…হাঁসের জন্য ধান কিনতে হবে, লণ্ঠন কিনতে হবে একটা, লণ্ঠন কিনলে আবার কেরোসিন চাই কিন্তু (চমৎকার-শেড-দেওয়া তার ইলেকট্রিক টেবিল ল্যাম্পটার কথা মনে পড়াতে মন-কেমন করে' উঠল একটু), কেরোসিন কিনতে হলে বোতল চাই, পারমিটও চাই, না, দরকার নেই লণ্ঠনে, মোমবাতি কিনলেই হবে, কিন্তু মোমবাতিতে খরচ যে অসম্ভব, কারণ তাকে পড়তেই হবে, না পড়লে ঘুম হয় না রাত্রে, হয়তো গোটা দুই মোমবাতি লাগবে রোজ, তা লাগুক মোমবাতিই কিনতে হবে (এই মোমবাতির জন্যে যে সৌদামিনীর কাছে তাকে বকুনি খেতে হবে পরে এবং সেই বকুনি যে তার স্নেহবন্ধনে আর একটা গ্রন্থি যোজনা করবে এ তার স্বপ্নাতীত ছিল তখন)…সামনেই একটা মনোহারি দোকান দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল সেদিকে সে… যেতে যেতে হঠাৎ মনে হল বই কিনতে হবে একটা, সরোদও…এ দুটো জিনিস অবিলম্বে কিনে ফেলা দরকার আগে…মনে পড়ল কিরণের কথা, বই এবং সরোদের সঙ্গে কিরণ যে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত…কিন্তু না, আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তাকে, তার আগে সে কারও সঙ্গে দেখা করবে না, উলঙ্গ অবস্থায় ঘরের বাইরে যাবার প্রস্তাবে স্বাভাবিক মানুষের মন যেরূপ সংকুচিত হয় তারও অনেকটা তেমনি হল যেন। বিবিধ তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত তরণীর মতো ভেসে চলেছিল তার মন, চিন্তার তরঙ্গে, কিন্তু পালে লেগেছিল আনন্দের হাওয়া অজানা সাগরের উদ্দেশে উড়ে চলেছিল মন চাঁদসদাগরের ময়ূরপঙ্খীর মতো……কিছুদূর গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল সে মুগ্ধ হয়ে কতগুলো পাখি দেখে, একটা পাখিওয়ালা খাঁচায় করে' পাখি বিক্রি করছে, কি সুন্দর পাখিগুলো, কি চমৎকার গায়ের রং! তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। খানিকক্ষণের জন্যে ভুলে গেল

সব। সমস্ত ভুলে তন্ময় হয়ে যাবার অসাধারণ শক্তিই যে তার আসল। শক্তি, এই শক্তিই যে তাকে ঘরছাড়া করেছে, এ খবর নিজেও জানত না সে বোধ হয়। সুন্দর কিছু দেখলেই তার মনের ভিতরের কৌতূহলী শিশু আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে সেটার দিকে, আগ্রহ না মেটা পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে না সেটাকে, দরকার হলে তার পিছু পিছুও যায় স্থান কাল পাত্র সব বিস্মিত হয়ে। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল এই জন্যই, একটা সুন্দর আদর্শকে অনুসরণ করে'।······পাখিগুলোকে সে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে', বিলিতি পাখি, 'গোল্‌ড্‌ ফিন্‌চ্‌', কি সুন্দর ডানাগুলো, মনে হচ্ছে এক একটা প্রজাপতি যেন পিঠে চড়ে' বসে' আছে প্রত্যেক পাখিটার, বিলিতি পাখী যদিও কিন্তু ধান খাচ্ছে······হঠাৎ উঠে পড়ল সে, মনে পড়ল তাকেও ধান কিনতে হবে হাঁসের জন্য······

······চুনীলালকে বেগ পেতে হল না বেশী। বিকাশবাবু যে বেহালা বাজান এ খবর সে অন্নদার মুখে শুনেছিল। এসেই বেহালার আওয়াজ কানে ঢোকা মাত্রই তার অঙ্কটা মিলে গেল। সুতরাং নিমেষের মধ্যে সে ঠিক করে' ফেললে কি করবে, কি বলবে। এক ঢিলে এতগুলো পাখি মরবে এ আশাই সে করেনি। পাখিগুলো কিন্তু ঢিলের মুখে এক লাইনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেখে ভারী আনন্দ হল তার। খবরটা পাঠিয়ে দিয়ে দেওয়ালে বিলম্বিত ম্যাডোনার বিখ্যাত ছবিটির দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইল। চুনীলাল ছবিটাকে দেখছিল না (ছবির কিছু বোঝে না সে, র‍্যাফেলের নামও শোনেনি) সে নিজের মনের আনন্দটাকে উপভোগ করছিল। কি করে' কথাটা পাড়া যায় এই সমস্যাটা সত্যিই ব্যাকুল করছিল তাকে। অন্নদা যে ভাবে বিকাশবাবুর নাগাল পেয়েছিল সে

"খুলেই বলি তাহলে। আমার ভগ্নীপতি হচ্ছেন গহনচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়। মস্ত বড় ওস্তাদ একজন। গান বাজনা নিয়েই সারা জীবনটা কাটিয়েছেন। একদম আত্মভোলা লোক। দিদি মারা যাবার পর থেকে আরও আত্মভোলা হয়ে গেছেন। কাশীতেই থাকেন বরাবর, সম্প্রতি এখানে এসেছেন। এসেছেন মানে জোরজবরদস্তি করে' আমিই আনিয়েছি তাঁকে। তাঁর মেয়েটি—ওই একমাত্র সন্তান তাঁর—আমার কাছে থাকে। এখানেই পড়াশোনা করছে। এবার আই-এ দেবে। এইবার কিন্তু বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে তো তার। জামাইবাবুকে চিঠি লিখে তাই আনিয়েছি এবং ভাগনীর ফটো পকেটে নিয়ে পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি চারদিকে। আজ সকালেই আপনার খবর পেলাম একজনের কাছে…"

এই পর্যন্ত বলে' চুনীলাল পকেট থেকে কাগজে মোড়া ফটোটি বার করে' আড়চোখে চাইলে একবার বিকাশের দিকে! বিকাশের মুখভাব আবার কঠিন হয়ে এসেছে দেখে মনে মনে হাসলও একটু। 'গোমড়া মুখ করা বার করছি তোমার থাম না'—এই কথাগুলো মনে মনে আওড়ালও একবার। তারপর নিম্নকণ্ঠে বলল—"আপনার দাদার কাছে না গিয়ে আপনার কাছেই প্রথমে এসেছি তার কারণ আপনি যদি মত দেন তাহলেই নিশ্চিন্ত মনে এগুতে পারি। ফটো দেখে যদি পছন্দ হয় আপনার—কারণ ওইটেই হ'ল প্রধান জিনিস—"

ফটোর মোড়কটি খুলে ফটোটি তুলে ধরলে সে বিকাশবাবুর চোখের সামনে। তার জীবন্মৃত আত্মসম্মান ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করল যদিও দু'একবার কিন্তু তার কোনও আভাস চোখেমুখে ফুটল না। বরং চোখেমুখে যা ফুটল তা প্রত্যাশা।

……ব্যাপারটা প্রত্যাশার অতীত ছিল কিন্তু বিকাশবাবুর কাছে। সত্যিই রঙ্গনাকে ভাল লেগেছিল তাঁর। যদিও আলাপ হয় নি, কিন্তু

ভাল লেগেছিল। বিয়েবাড়ির সমস্ত আলো গিয়ে পড়েছিল যে মেয়েটির মুখে, সমস্ত উৎসব ছন্দিত হচ্ছিল যার কলহাস্যে, স্পন্দিত হচ্ছিল যার ভ্রূভঙ্গিতে, যে মেয়েটি তার পর হারিয়ে গিয়েছিল হঠাৎ, যার খোঁজ সে একাধিকবার নেবার চেষ্টা করেছে তার বোনের কাছে এবং নিতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হয়েছে—তার ফটো এমন ভাবে দেখবেন বিকাশবাবু সত্যিই আশা করেন নি।

কিন্তু চুনীলাল যা আশা করেছিল তা হল না। বিকাশবাবু কোনরকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না। নির্বাক হয়ে রইলেন শুধু।

…ফুটপাথ দিয়ে হনহন করে' হেঁটে আসছিল ঊর্মি গুনগুন করে' গান গাইতে গাইতে। বহুলোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগছিল ভিড়ে, কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করছিল না সে। কাঁধের উপর থেকে মাঝে মাঝে খসে পড়ছিল রঙীন ছাপা শাড়ির আঁচলটা, স্ট্র্যাপ-ছেঁড়া স্যাণ্ডালটা বারবার খুলে আসতে চাইছিল পা থেকে, দু'একটা অসভ্য লোকের অশ্লীল দৃষ্টি খোঁচার মতো বিঁধছিল মনে, তবু কিন্তু তার মুখের হাসি নেবেনি, ম্লান হয় নি চোখের দৃষ্টি, কানের পাশের অলকগুচ্ছ নাচছিল ঠিক তেমনি করে'। হরিণীর মতো ছুটে চলেছিল সে। চলেছিল কিরণের বাড়ির উদ্দেশে। দেবার মতো সুসংবাদ ছিল কয়েকটা। প্রথম—একজন সিনেমা ডিরেকটার তাকে ইণ্টারভিউ করতে চেয়েছেন। নাচ আর চেহারা যদি পছন্দ হয়—ওঃ তাহলে কি মজাই হবে! দ্বিতীয় সুসংবাদ গহনচাঁদবাবুর মেয়ে রঙ্গনা রাজি হয়েছে কিরণের গানে সুর দিতে। তৃতীয় সুসংবাদ গহনচাঁদবাবুর কথ্থকি নাচ শেখাবেন তাকে, বিশেষ করে ময়ূর নাচটা। তিন তিনটে পালে হাওয়া লেগেছিল। মোড়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি চুষতে চুষতে যে মোটা কালো লোকটা পিঁচুটি-ভরা চোখে মিটমিট করে' চাইছিল

তার দিকে, সে লোকটাকে দেখতেই পেল না উর্মি। দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল সে।

…সূর্যকান্তবাবুও কাছারি থেকে ফিরে বেশ দ্রুতবেগেই বাড়ির ভিতর ঢুকলেন। তিনি যদি বুঝতে পারতেন যে বেগটা অশোভন রকম দ্রুত হয়েছে, তাহলে হয়তো নিজের কাছেই অপ্রস্তুত হতেন একটু। কারণ শুধু ব্রজর কাছে নয় নিজের কাছেও তিনি ধরা পড়তে চাইছিলেন না। মনকে চোখ ঠারছিলন বললে ঠিক তাঁর মনোভাবটি ব্যক্ত হয় না। কারণ 'ঠারা' কথাটির মধ্যে যে ভণ্ডামির আমেজ আছে তা তাঁর মধ্যে স্পষ্টভাবে ছিল না। যে চেতনা তাঁর গতিবেগকে দ্রুত করে দিচ্ছিল তিনি সে চেতনার সম্বন্ধে সচেতনই ছিলেন না। 'আমি যা করেছি তা ঠিকই করেছি' অহং-স্ফীত এই সত্তাটা আড়াল করে রেখেছিল সেটাকে। তিনি সেটাকে ভালভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন না। দেখতে চাইছিলেনও না। কিন্তু সেটা ছিল এবং তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর গতিবেগকে দ্রুততর করে' দিচ্ছিল। তিনি ড্রাইভারকে মানা করে' দিয়েছিলেন যে তাঁকে কাছারি থেকে আনবার জন্য মোটর নিয়ে যাবার দরকার নেই। আপাতদৃষ্টিতে মানা করবার একটা সঙ্গত কারণও খাড়া করেছিলেন অবশ্য। কাছারি থেকে কখন তিনি ছুটি পাবেন তার স্থিরতা ছিল না কিছু, ড্রাইভারটা অনর্থক অপেক্ষা করবে কেন, তিনি কাজ শেষ হলে 'বাসে' কিংবা 'ট্রামে' ফিরতে পারবেন অনায়াসে। কিন্তু এ রকম পরিস্থিতি তো ইতিপূর্বে আরও অনেকবার ঘটেছে, ড্রাইভারের প্রতি সদয় হয়ে তাকে ছুটি দেবার কথা ইতিপূর্বে কেন মনে পড়ে নি একথাটা সূর্যকান্ত চৌধুরি যে ভাবেন নি তা নয় (আড়ালে-অবস্থিত তাঁর দ্বিতীয় সত্তাটা ইশারায় ইঙ্গিতে সচেতন করেছিল তাঁকে এ সম্বন্ধে, তাছাড়া তিনি বুদ্ধিমান

লোকও)—কিন্তু তিনি ভাবতে চাইছিলেন না। কাছারি থেকে ফিরবার পথে ট্রাম-ডিপোতে তিনি যে কিরণের নাগাল পেতে চান এবং সেটা ড্রাইভারের কাছ থেকে গোপন রাখতে চান এই তথ্যটার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে লজ্জা করছিল তার এবং লজ্জা করছিল বলে' চটে যাচ্ছিলেন তিনি। নিজের উপরই চটে যাচ্ছিলেন, নিজের দুর্বলতা নিজের কাছেই স্বীকার করতে চাইছিলেন না। অপরে তা জেনে ফেলুক সেটা আরও বেশি করে' চাইছিলেন না, সুতরাং তার জন্যে এই যে লুকোচুরি করতে হচ্ছে সেটা সোজাসুজি মানতে বাধছিল তাই তাঁর। তিনি নিজের কাছে, ব্রজের কাছে, ড্রাইভারের কাছে, গোবিন্দ সাণ্ডেলের কাছে, বস্তুত সকলের কাছেই এই কথাটা জাহির করে' রাখতে চাইছিলেন যে তিনি যা করেছেনে তা দিবসের ভালর জন্যেই করেছেন, দিবস যদি তাঁর অবাধ্য হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, যাক, তার জন্যে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই তাঁর, কর্তব্যের খাতিরে যতটুকু খোঁজখবর করা দরকার ততটুকুই কেবল তিনি করবেন, রাস্তায় রাস্তায় হাহাকার করে' বেড়াবেন না। তিনি যদিও উপরোক্ত মর্মে কারও কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হন নি, তবু তাঁর মনে হচ্ছিল যে ওই ধরণের একটা বেপরোয়া কর্তব্যপরায়ণতা আস্ফালন করতে না পারলে পাঁচজনের কাছে (বিশেষত প্রিয়বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলের কাছে যিনি ইংরেজি ভাষায় উপদেশ দিয়েছিলেন 'সিট্ অন্ হিম্') তিনি খেলো হয়ে যাবেন। কিন্তু তাঁর গোপন সত্তাটা দমকা হাওয়ার মতো এসে বেসামাল করে দিচ্ছিল তাঁকে যেন—তার কেতাদুরস্ত বাইরের পোশাকটাকে বিস্রস্ত করে ফেলছিল, উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল যেন মাথার টুপিটা টাকটাকে অনাবৃত করে'—চটে যাচ্ছিলেন তিনি। ট্রাম ডিপোতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কিরণের যখন নাগাল পেলেন না, কিরণ কখন 'ডিউটি'তে আসবে

সে খবরও যখন পেলেন না কারও কাছ থেকে (আজকাল সবাই এমন আত্মকেন্দ্রিক যে তাঁর কথা ভাল করে' শুনলেই না অনেকে, যাঁরা শুনলে তারা দায়-সারা গোছ উত্তর দিয়ে দিলে) তখন কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়লেন তিনি খানিকক্ষণের জন্য। কিরণের বাসার ঠিকানা তো জানা নেই তাঁর। সে মাঝে মাঝে বাড়িতে আসত যেত, সে দিবসের বন্ধু, দিবস তারই উৎসাহে তার কাছ থেকে সরোদ বাজানো শিখেছে, এই সবই তিনি জানতেন। এর বেশি যে আর কিছু জানা দরকার একথা একবারও মনে হয়নি তাঁর। কত লোকের সঙ্গেই তো রোজ দেখা হয়, কত লোকের সঙ্গে হৃদ্যতাও আছে কিন্তু তাদের বাসার ঠিকানা তো জানেন না তিনি। হঠাৎ তাঁর মনে হল দিবস হয়তো ফিরেছে এতক্ষণ। তিনি বৃথাই হয়তো সময় নষ্ট করেছেন এখানে। মনে হওয়ামাত্রই তিনি ট্রাম ডিপো থেকে বেরিয়ে এলেন এবং একটি ট্যাক্সি ডেকে বাড়ি ফিরলেন। টাক্সিটাকে বাড়ির সামনে পর্যন্ত নিয়ে গেলেন না, কারণ এ ধরণের অপব্যয় করতে দেখলে ব্রজ বাড়ি মাথায় করবে, ট্যাক্সিটাকে মোড়ের সামনে দাঁড় করিয়ে বাকি রাস্তাটুকু হেঁটে গেলেন। বেশ দ্রুতবেগেই গেলেন। তাঁর মনের সেই গোপন ব্যক্তিত্বটা (যার কাছে পরাভব তাঁকে স্বীকার করতেই হবে একদিন, যার প্ররোচনায় পড়ে' অসুখের ভান পর্যন্ত করতে হবে) তাঁর গতিবেগকে অশোভন রকম বাড়িয়ে দিলে।

বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই গেলেন তিনি দিবসের ঘরে। গিয়েই চোখে পড়ল ভাঙা সরোদটা টেবিলের উপর রাখা রয়েছে। ব্রজই তুলে রেখেছে নিশ্চয়। নিস্তব্ধ হয়ে নির্ণিমেষে চেয়ে রইলেন সেটার দিকে ক্ষণকাল। তারপর একটু এগিয়ে গেলেন টেবিলটার দিকে, স্পর্শ করতে ইচ্ছে হল সরোদটাকে। কিন্তু ভয় হল। মনে হল

ছুঁলেই বোধ হয় প্রতিবাদ করে' উঠবে সরোদটা। অযৌক্তিক ভয়টা কাটিয়ে উঠতে অবশ্য বেশি দেরি হল না তাঁর, কিন্তু যে যুক্তিসঙ্গত দ্বিধাটা তারপর তাঁর মনে এল আবছাভাবে সেটা আরও হাস্যকর। ক্রিমিনাল কেসে প্র্যাকটিস করেন বলে' যে কারণে তিনি 'সিভিল' কেস ছুঁতে চান না, সঙ্গীত বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে সরোদটা স্পর্শ করতে তেমনি ধরণের একটা সংকোচ হল তাঁর ক্ষণিকের জন্য। তবু তিনি ইতস্ততঃ করে' এগিয়ে গেলেন এবং সন্তর্পণে সরোদটা তুলে নেড়ে চেড়ে দেখলেন একবার। কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। ব্রজ ঘরে ঢুকলে সেই মুহূর্তে।

"দিবস ফেরে নি ?"

সরোদটা টেবিলে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"না। সমস্ত দিন তো হাপিত্যেশ করে' বসে আছি"—এইটুকু বলেই ব্রজ থামল না, সমস্ত দিন ধরে' তার মনে যে কথাটা নানাভাবে পল্লবিত হচ্ছিল তার নির্যাসটুকুও ব্যক্ত করলে—"ছেলে এখন বড় হয়েছে তাকে কি অমন করে' বকে ?"

সূর্যকান্ত অকারণে গোঁফটাকে বাঁ হাত দিয়ে মুছে চোখমুখে এমন একটা ভাব ফোটাতে চেষ্টা করলেন যার অর্থ—'তুমি ওকে মানুষ করেছ তা মানছি, কিন্তু ছেলেকে কখন কি ভাবে বকতে হবে তা তোমার চেয়ে আমি ভাল বুঝি। এ তুমি যা করছ তা অনধিকার চর্চা'—চেষ্টা করলেন বটে কিন্তু ফুটল না এবং কেবলমাত্র চোখমুখের ভঙ্গিতে এত লম্বা ভাব প্রকাশ করা যে তাঁর সাধ্যাতীত একথাও তিনি যে না বুঝলেন তা নয়, কিন্তু কথা দিয়ে তা ফোটাবারও চেষ্টা করলেন না। ব্রজর দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

…পথশ্রান্ত পদক্লান্ত দিবস সন্ধ্যার সময় যখন খোলার ঘরে ফিরে এল তখন তার উৎসাহ অনেকটা কমে গেছে। কিন্তু সেই অনুপাতে জেদটা যে বেড়ে গেছে তা নিজে সে স্পষ্টভাবে টের পায় নি তখনও। সূর্য অস্ত গেলে অন্ধকারটাকে যেমন আমরা বড় করে' দেখি, প্রথম প্রথম চাঁদটা যেমন চোখেই পড়ে না, দিবস হতাশার অন্ধকারেই তেমনি বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল, অন্তরের নিভৃতে ক্রমবর্ধমান আত্ম-শক্তিটাকে উপলব্ধি করতে পারছিল না ভাল করে'। সে বুঝতেই পারছিল না কি করে' কি হবে। অথচ—এই 'অথচ'টার আড়ালে উজ্জ্বলতর হচ্ছিল তার আত্মশক্তি।

অন্ধকার ঘরটায় ঢুকে একটা দেশলাই কাঠি জ্বাললে সে প্রথম। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আগেই সব কিনে এনেছিল সে। টেবিল, চেয়ার, শেলফ, বিছানা। আয়না, চিরুনী…দু'খানা বই, ধানের পুঁটুলি (ধান কিনতে গিয়ে একটা গামছাও কিনতে হল পুঁটুলি বাঁধবার জন্য) এবং মোমবাতির প্যাকেটটা টেবিলে রেখে দিয়ে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠিটা ফেলে দিলে সে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ চুপ করে। তারপর হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে চৌকিটার উপর বসল। তার মাকে মনে পড়ল হঠাৎ, অর্থাৎ সেই ছবিটাকে যেটা বাবার শোওয়ার ঘরে টাঙান আছে। খুব ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছে সে, জীবন্ত মায়ের মুখটা ভাল মনে নেই তার। ঘোমটা দেওয়া একখানি সুন্দর মুখের খানিকটা ঘেরে টকটকে একটা পাড়…এর বেশি আর কিছু মনে পড়ে না। অয়েল পেন্টিং ছবিখানা আর স্মৃতির এই অস্পষ্ট টুকরোটা দুটোই ফুটে উঠল পাশাপাশি মনের ভিতরে। তার মনে হল মা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে সে কি এমন ভাবে চলে আসতে পারত? কিন্তু তখনি আবার মনে হল মা কি তাকে এমন ভাবে বাধা দিতেন? বাবাকে বুঝিয়ে তিনি তাকে রিসার্চই করতে দিতেন ঠিক। স্মৃতির

অস্পষ্ট টুকরোটা, টকটকে লাল-পাড়-ঘেরা সেই সুন্দর মুখখানা একটু নড়ে' উঠল যেন, মনে হল তার দিকে যেন ফিরে দেখতে চাইছে কিন্তু পারছে না। মায়ের একটা ছবি পাওয়ার জন্যে আকুল হয়ে উঠল সে সহসা। কিন্তু তা পাওয়া যাবে না। মায়ের ওই একটা ছবিই অনেক কষ্ট করে' করেছিলেন বাবা, অস্পষ্ট একটা ফটো থেকে, সেই সাহেব চিত্রকরও চলে গেছেন দেশে বহুদিন আগে, হয়তো বেঁচেও নেই। অয়েল পেন্টিংয়ের কচি মুখখানা আবার ভেসে উঠল মনে। উনিশ কুড়ি বছরের একটি তরুণী। মুখে ফুটে উঠেছে লজ্জার আভার সঙ্গে মৃদু হাসি, চক্ষু দুটি আনত। অনেক দিন সে নির্নিমেষে চেয়ে থেকেছে ছবিটার দিকে, কিন্তু আনতদৃষ্টি আনতই থেকে গেছে, একবারও তার মুখের দিকে চেয়ে দেখেনি। পাশেই বাবার ফটোখানাও টাঙানো আছে। কত তফাৎ! বাবা প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন সামনের দিকে, মনে হয় চোখে চোখ রেখে কথা বললেন বুঝি এখনই। ফটোখানা সেই তুলিয়েছিল কিছুদিন আগে, তার এক বন্ধু ফটোগ্রাফার তুলেছিল ফটোটা। পরমুহূর্তেই যে কথাটা মনে হল তার, যে প্রবল বাসনাটা জাগল, তাতে নিজেই অবাক হয়ে গেল সে। যে বাবার জেদের জন্য সে নিজের কাম্য পথে যেতে পায় নি, যাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে' বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে পথে ঘুরতে হচ্ছে, তাঁরই একখানা ছবি যোগাড় করে' টাঙিয়ে রাখবার ইচ্ছে হল তার। ধূসরের জন্য আকুল হয়ে উঠল সবুজ। অসম্ভব হবে না এটা, তার সেই বন্ধুর কাছে গেলে একখানা কপি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ফটোতে বাবার চোখে যে প্রসন্ন দৃষ্টি ফুটে উঠেছে—হঠাৎ তার মনে হল—সে দৃষ্টির অন্তরালে কোন রকম নীচতা হীনতা সংকীর্ণতা লুকিয়ে থাকতে পারে না। প্রচলিত কুসংস্কার, অর্থহীন চক্ষুলজ্জা, অতীতকে আঁকড়ে থাকবার প্রয়াস প্রভৃতি কতকগুলো জিনিস হয়তো

তাঁকে আধুনিক হতে দেয় নি (আধুনিকতা নিয়ে গোবিন্দ সাণ্ডেলের সঙ্গে যে তর্ক সূর্য চৌধুরি পরে করবেন তা যদি শুনতে পেত দিবস !) কিন্তু—দিবসের মনে হল—ওই চোখের দৃষ্টিটা তো মিথ্যে নয় ; তার বাবার স্বরূপ ধরা যেন পড়ে গেছে ঐ চোখের দৃষ্টিতে···

"এ কি কপাট খোলা, ঘর অন্ধকার, কি গো বাবু ফিরেছেন না কি ?" সৌদামিনীর সাড়া পেয়ে দিবস চমকে উঠে দাঁড়াল।

"এখনই ফিরলাম"।

"আলো জ্বালেন নি ?"

"জ্বালছি, এস।"

দিবস তাড়াতাড়ি একটা মোমবাতি জ্বেলে ফেললে। সৌদামিনী এসে ঢুকল ঘরের ভিতর। দিবস যে এ পাড়ায় বেমানান তা সৌদামিনীর বুঝতে দেরি লাগে নি। যে ধরণের বাবুরা এ পাড়ায় সাধারণত থাকেন বা আসেন তাদের সৌদামিনী চেনে। তাদের মধ্যেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আছে, কিন্তু তাদের চালচলনে বস্তির এমন একটা ছাপ থাকে যা পেঁয়াজ বা হিংয়ের গন্ধের মতো কিছুতেই ঢাকা পড়ে না। দিবস 'হংসো মধ্যে বকো যথা' নয়। 'বকো মধ্যে হংসো যথা' বললেও ঠিক সেই ভাবটি বর্ণনা করা যাবে না যা সৌদামিনীর মনে জাগছিল। 'গোবরে পদ্মফুল' সৌদামিনী নিজেই বলত হয়তো জিগ্যেস করলে, কিন্তু তা-ও তার মনোভাব ঠিক প্রকাশ করত না। গোবর গাদাতেও, পদ্মফুল না হোক, ফুল ফোটে বই কি, আর পদ্মফুল যেখানে ফোটে তা গোবর গাদা না হলেও পাঁকের গাদা। সৌদামিনীর যা মনে হচ্ছিল, যা সে ভাষায় প্রকাশ করতে পাচ্ছিল না, তা 'আস্তাকুঁড়েতে জরির টোপর কে বসিয়ে দিয়ে গেল' গোছের কিছু একটা। দিবসের স্বল্পভাষণে, তার চোখের প্রদীপ্ত গম্ভীর দৃষ্টিতে, পার্থিব বিষয়ে তার ঔদাসীন্যে (ঘরের কপাটটাই খুলে রেখে চলে গিয়েছিল !), তার

মুখভাবের শুচিতায় এমন একটা ব্যক্তিত্ব প্রতিভাত হচ্ছিল যার আভিজাত্য আয়ত্তাতীত বলে' চিরকাল শ্রদ্ধাবিষ্ট করে রেখেছে সৌদামিনীদের। যা তারা জানে, খেলো হয়ে পড়বে না কিছুতেই, অর্থাৎ, যা, (এটা অবশ্য সৌদামিনী ভাবছিল না) দেবদাস-চন্দ্রনাথ-সতীশেও পর্যবসিত হবে না শেষ পর্যন্ত, যার শুভ্রতা পঙ্ক স্পর্শ করেও নির্মল থাকবে আলোকের মতো চিরকাল।

"বাইরে থেকে খেয়ে এসেছেন, না এইখানেই রান্নাবাড়া করবেন? পিছনের বারান্দার উনুনটা ঠিক করে' রেখেছি আমি।"

ঘরের ভিতর ঢুকে মৃদু হেসে বললে সৌদামিনী।

"পিছনের বারান্দায় উনুন আছে নাকি একটা!"

এই কথা শুনে সৌদামিনীর শ্রদ্ধা—যা অনতিবিলম্বে স্নেহে পরিণত হবে—আরও বেড়ে গেল যেন। মনে হল বাড়িভাড়া নিয়েছে অথচ বাড়ির কোথায় কি আছে তা ভাল করে' দেখেনি—আশ্চর্য লোক!

"উনুন আছে বই কি। ঢাকা বারান্দা, দিব্যি রান্না করা যাবে।"

"না, রান্নাবাড়া আমার পোষাবে না। কিনেই খেতে হবে। কাছে পিঠে হোটেল আছে কোনও?"

"আছে। মোহন ঠাকুরের হোটেল। কিন্তু আগে থাকতে বলে' না দিলে—"

"সেইখানেই ব্যবস্থা করব কাল থেকে।"

"সে তো না হয় কাল থেকে হবে। আজ? আজ কি উপোস করে' থাকবেন না কি?"

"বাজার থেকে কিছু কিনে টিনে খাব এখন।"

"আমি তো বাজারের দিকেই যাচ্ছি, কি খাবেন বলুন, কিনে নিয়ে আসব এখন।"

"তাহলে তো ভালই হয়। কিছু লুচি আর তরকারি এনো তাহলে। এই নাও।"

দশ টাকার নোট দিলে একখানা। সৌদামিনী ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে সদ্য-কেনা বই দুটোকে। আবার তার মনে হল, আশ্চর্য্য লোক, বই কিনে এনেছে, খাবার কিনে আনে নি। খিদেও পায় না নাকি এদের!

"কত লুচি আনব?"

এই প্রশ্নে মুশকিলে পড়ে গেল দিবস। ভেগা নক্ষত্রের দিকে আমাদের সৌরমণ্ডল কত বেগে এগিয়ে যাচ্ছে অথবা পজিট্রনের চতুর্দিকে যে ইলেকট্রনরা নৃত্য করে বেড়াচ্ছে তাদের চরিত্র কি রকম এ সব প্রশ্ন করলে দিবস সঙ্গে সঙ্গে নিখুঁত উত্তর দিতে পারত, কিন্তু কত লুচিতে তার পেট ভরে এ তো সে ঠিক জানে না। অথচ বেঠিক উত্তর দিতেও তার বৈজ্ঞানিক মন ইতস্তত করতে লাগল। একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে তাই সে বললে, "আট দশ খানা এনো। তরকারি বেশি এনো একটু।"

সৌদামিনী চলে গেল। সৌদামিনী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দিবস ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইল জলন্ত শিখাটার দিকে। মাঝে মাঝে কেঁপে যাচ্ছে বটে কিন্তু সোজা ঊর্ধ্বমুখে জলবার চেষ্টা করছে। এর থেকে একটা বিশেষ নীতি আহরণ করে' তার অবসন্ন মন যে চাঙ্গা হয়ে উঠল তা নয়, কত ওজনের লুচিতে তার পেট ভরে এই সংবাদ না জানার লজ্জাও তার অন্তর স্পর্শ করে নি মোটেই (ধান কোথায় পাওয়া যায় এই অতি সাধারণ খবরটাও সে জানত না, এবং এই অজ্ঞতার জন্যেও মুষড়ে পড়ে নি সে), বস্তুত কোন রকম চিন্তাই জাগছিল না তার মনে, সে নির্নিমেষে জ্বলন্ত শিখাটার দিকে চেয়েছিল কেবল। অনবরত নিদারুণ চিন্তাভারে প্রপীড়িত হবার পর আমাদের

মন মাঝে মাঝে ছুটি নেয়, কিছুই ভাবতে চায় না আর, ভাবতে পারেনা, সমস্ত ভয় ভাবনা থেকে সরে' গিয়ে আত্মগোপন করে নিশ্চিত-লোকে কিছুক্ষণের জন্য। এ রকম নির্বিকার হবার ক্ষমতা মনের আছে, তাই মুমূর্ষু সন্তানের মাথার শিয়রে জননী ঘুমিয়ে পড়তে পারে, নেপোলিয়নরা বিশ্রাম নিতে পারে যুদ্ধক্ষেত্রে। জলন্ত শিখাটার দিকে চেয়ে দিবসের মন বিশ্রাম নিচ্ছিল তেমনি। তারপর আবার ধীরে ধীরে সক্রিয় হয়ে উঠল তা। বাড়ি থেকে চলে আসবার পর সমস্ত দিন কি কি কাজ করেছে তারই হিসাব করতে লাগল সে।

তবলচি সীতারাম (বড় বড় চোখ, চমৎকার পাকানো গোঁফ) এবং সারেঙ্গি রমজান (গোলগাল মুখ, গালভরা ননমহেশ দাড়ি) দুজনেরই কোলকাতা শহর খুব ভাল লেগেছিল। তাদের দুজনেরই বাড়ির অবস্থা স্বচ্ছল, কোলকাতা শহরে কিছুদিন শফর করে' গেলে কারও সংসারই অচল হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। তাই কোলকাতা শহরে কিছুদিন কাটিয়ে যেতে আপত্তি ছিল না তাদের। ভয় ছিল গুরুজি (মানে গহনচাঁদ) যদি থাকতে রাজি না হন, কিন্তু তিনি রাজি হওয়াতে তারা খুশি হয়েছে। চুনীলাল কাছাকাছি একটি ছোট বাসা ঠিক করে' দেওয়াতে থাকবারও বিশেষ কোন অসুবিধা নেই। একটি ছোট ঘরে দুজনেই থাকে। একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ, আর একজন মুসলমান। কিন্তু তাতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয়নি। মনের মিল থাকলে কোন কিছুতেই আটকায় না। তাছাড়া যে আর্টের ক্ষেত্রে তারা মিলেছিল সেখানে সুরই প্রধান কথা বে-সুরের স্থান নেই। তাই ওই ছোট ঘরেও সীতারামের আহ্নিকপূজা রমজানের নমাজে একটুও ব্যাহত হচ্ছিল না। আনন্দেই দিন কাটছিল তাদের। তাছাড়া সবচেয়ে আনন্দিত হয়েছিল তারা রঞ্জনাকে দেখে। গুরুজির বেটী

যে এমন হবে তা তাদের কল্পনাতীত ছিল। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, আর তেমনি গানের গলা। ওর বিয়ে তো দেখে যেতেই হবে। জরুর! সীতারামের মতে এ মেয়ের স্বয়ম্বরা হওয়া উচিত। মতটা অবশ্য সে প্রকাশ্যে বলতে পারেনি গহনচাঁদকে। রমজানের ধারণা ঠিক উলটো। তার মতে বেগমের মতো পরদানশীন করে রাখলেই রঙ্গনাকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়। অমন একটা নেহায়েৎ নাজুক' সৌন্দর্যকে পথে ঘাটে ছেড়ে দেওয়াটা কি ভাল? কিন্তু সে-ও মতটা প্রকাশ করতে পারেনি গহনচাঁদের কাছে। দুজনেই কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল রঙ্গনাকে দেখে। সেদিন সন্ধ্যার সময় দিবস যখন তার খোলার ঘরে মোমবাতির শিখাটার দিকে চেয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবছিল তখন চুনীলালের বাড়িতে জমে উঠেছিল গানের সভা। রঙ্গনা গাইছিল, সঙ্গত করছিল রমজান আর সীতারাম। গহনচাঁদ মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন বসে'। গান শেষ হয়ে যাবার পর গহনচাঁদ চোখ খুললেন।

"কেমন লাগল তোমাদের ?"—হাসিমুখে চাইলেন তিনি প্রথমে রমজান তারপর সীতারামের দিকে।

ফার্স্ট ক্লাস"— সীতারাম ইংরেজিতেই বলে উঠল। এই ধরণের দু'চারটে আংরেজি লবজ.' সে জানে এবং আওড়ায় মাঝে মাঝে।

"বহুত আচ্ছা"—রমজান মৃদু হেসে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললে এবং অনেকক্ষণ ধরে' ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগল, যেন সে যা বলতে চায় তা ভাষার অতীত।

"ওর গান শুনে ভাল লাগলে ওকে ভাল একটা সেতার কিনে দেব বলেছি। দেওয়া যাক তাহলে, কি বল ?"

"জরুর"—'বেশক্'—সীতারাম, রমজান সমস্বরে বলে উঠল।

হেসে ফেললে রঙ্গনা।

"কি যে করছ তুমি বাবা সামান্য একটা সেতার কেনা নিয়ে।"

"কাল নিয়ে আসিস।"

কন্যার দিকে স্নেহভরে চেয়ে বললেন গহনচাঁদ। গহনচাঁদের মুখের দিকে চেয়ে সাহস বেড়ে গেল রঙ্গনার। কলেজ থেকে ফিরে অবধি যে কথাটা সে বলব বলব করে' বলতে পারেনি তার মনে হল তো বলবার এই সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। মামাকে বললে তিনি রাজী হয়ে যাবেন—সেবার বোলপুর যাবার সময় কিছুতো বলেন নি—কিন্তু বাবা হয়তো আপত্তি করতে পারেন। বোলপুরের কথা বাবাকে সে জানায়ও নি।

"বাবা আর একটা জিনিস দেবে আমাকে?"

"আবার কি?"

"দু' তিন দিনের ছুটি। এক জায়গায় বেড়াতে যাব।"

"কোথায়?"

"গিরিডি। আমাদের কলেজের মেয়েরা 'আউটিং' করতে যাচ্ছে। আমাকেও যেতে বলছে।"

"গিরিডি! ও বাবা সে যে অনেকদূর। তোদের সঙ্গে থাকবে কে?"

এই কথায় আত্মসম্মান আহত হ'ল রঙ্গনার। তার ধারণা পুরুষরা তাদের আগলে রেখে রেখে আর পাহারা দিয়ে দিয়ে আরও পঙ্গু করে' ফেলছে দিন দিন। তারা কি এতই ঠুনকো যে রক্ষণা-বেক্ষণের 'ক্রেট্' দিয়ে মুড়ে না পাঠালে ভেঙে যাবে! কি আশ্চর্য!

"সঙ্গে? মানে, পাহারা দেবার জন্যে?"

"পাগলির কথা শোন। একা যাবি তোরা অতদূর! যেতে পারবি?"

"খুব পারব। না পারবার কি আছে?"

রমজানের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল একটু। সীতারাম তারিফের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে মুচকি হেসে বললে—"জরুর। কাহে নেহি শেকেগী ?"

"ক'জন যাবি তোরা ?"

"আট দশজন।"

"এর আগে গেছিস কখনও ?'

"গেলবার বোলপুর গিয়েছিলাম।"

"সঙ্গে কেউ ছিল না ?"

"মাসীমা ছিলেন সেবার।"

"মাসীমা ? কার মাসীমা ?"

"হস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।"

"ও"—অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হলেন গহনচাঁদ—"এবারও যাবেন তিনি ?"

যেতে পারেন। না-ও যদি যান কি ক্ষতি তাতে"—তারপর ঈষৎ হাসি, ঈষৎ ব্যঙ্গ, ঈষৎ অনুযোগ মিশিয়ে (অপরূপ হয়ে উঠল তার মুখশ্রী এই তিনের সংমিশ্রনে) বললে—"কি যে মনে কর তোমরা আমাদের, আমরা কচি খুকি নাকি ?"

"তা নয়তো কি। কোথা থেকে কখন কি বিপদ হয়—"

এর পর রঙ্গনা কিন্তু যা করে' বসল তা কচি খুকিকেই মানায়। দুহাত দিয়ে গহনচাঁদের গলা জড়িয়ে ধরে' আবদারভরা কণ্ঠে বললে—"না বাবা আমি যাব। তুমি মানা কোরো না। কিছু হবে না।"

"এই দেখ, এই দেখ"—বিব্রত হয়ে উঠলেন গহনচাঁদ—আচ্ছা বেশ তো, চুনী আসুক তাকে জিগ্যেস করি।"

"মামা তো বোলপুর যেতে মানা করে নি।"

ঠিক এই সময় চুনীলালও এসে ঢুকল। বিকাশবাবুকে গাঁথতে পেরে বেশ পুলকিত হয়ে ফিরেছিল সে।

"মামা, আমরা সেবার বোলপুরে আউটিং করতে যাই নি?"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলে তো, কেন, কি হয়েছে?"

"এবার গিরিডি যেতে চাইছে"—ভ্রূকুঞ্চিত করে এবং ঈষৎ অসহায়-ভাবে বললেন গহনচাঁদ।

"তা যাক না। কলেজের মেয়েরা ও রকম আউটিং করে মাঝে মাঝে।"

"তাহলে যাস। কবে যেতে হবে?"

"সে এখনও দেরি আছে কয়েকদিন।"

"এই যদি রেওয়াজ হয়ে থাকে আজকাল, যাস।"

রঙ্গনার চোখে মুখে হাসি ফুটে উঠল এবং তা দেখে সীতারাম এবং রমজানের চোখে মুখেও হাসি ফুটে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। তারা দুজনেই রুদ্ধশ্বাসে যেন অপেক্ষা করছিল ব্যাপারটার কি 'ফায়সলা' হয় শোনবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত রঙ্গনার জয় হওয়াতে তারাও খুশি হল। রমজান যদিও মনে মনে পর্দার পক্ষপাতী কিন্তু রঙ্গনা খুশি হওয়াতে তারও চোখে মুখে ফুটে উঠল আনন্দ।

তার ছোট টেবিলটায় শালপাতার উপর লুচি তরকারি সাজিয়ে দিতেই দিবস গিয়ে খেতে আরম্ভ করে' দিল। খুব খিদে পেয়েছিল তার। সৌদামিনী সেদিকে আড়চোখে একবার চেয়ে আঁচলের গেরো খুলতে লাগল। একগাদা খুচরো ভাঙানি এনেছিল সে। সেগুলি টেবিলের একধারে স্তূপীকৃত করে' রাখতে রাখতে সে বললে—"আগেই যে খেতে আরম্ভ করে' দিলেন, এগুলো গুনে নিন।"

দিবস হাসিভরা চোখে তার দিকে এক-নজর চেয়ে লুচি মুখে পুরলে

আর একখানা। কোনও কথা বললে না, গুণে নেবার কোনও দরকারও প্রকাশ করলে না। হঠাৎ এক ঝলক আনন্দ আবার আপ্লুত করে' ফেলেছিল তার সমস্ত মন। সমস্ত দিনের ব্যর্থতা, সমস্ত দিনের পরিশ্রম হঠাৎ যেন সার্থক হয়ে উঠেছে তার মনে হচ্ছিল। সে যে এই খোলার ঘরে বসে' খেলো টেবিলের উপর শালপাতা পেতে বাজারের অখাদ্য লুচি তরকারি খেতে পারছে, তার মনে যে কোনও গ্লানি কোনও অনুতাপ হচ্ছে না এই ঘটনাটাই তার চমৎকার মনে হচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল এই তো পেরেছি, এই তো পেরেছি···।

"আগে এগুলো গুণে গেঁথে রেখে দিলে পারতেন, আমি দাঁড়িয়ে থাকব কতক্ষণ ?"

"দাঁড়িয়ে থাকবার দরকার নেই।"

"এগুলো গুণে নেবেন না ?"

"পরে নেব এখন।"

সৌদামিনী মুচকি হেসে চেয়ে রইল একটু।

"কম হলে ?"

"কি আর করব।"

"যাই তাহলে। আর কিছু দরকার নেই তো ?"

"জল—"

"ও, হ্যাঁ—"

তাড়াতাড়ি কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে আনলে সে।

"আর কিছু দরকার নেই তো ?"

"ছিল আর একটা দরকার। কিন্তু থাক, সে কাল সকালে হলেও চলবে।"

"এখনই শুনি না।"

"একটা ময়লা কাপড় আর ময়লা জামা চাই। গেঞ্জি হলেও চলবে।"

"ওমা ! ময়লা জামা কাপড় নিয়ে কি হবে ?"

"ময়লা কাপড় জামা না হলে' চাকরি জুটছে না ।"

"কি চাকরি করবেন আপনি ?"

"যা জোটে ।"

কিছুক্ষণ চুপ করে' রইল সৌদামিনী। দিবসের সম্বন্ধে পাকা-পোক্ত যে ধারণাটা সে করে' নিয়েছিল (যা যাচাই করে' নেবার প্রয়োজনও সে অনুভব করছিল না) সেই ধারণার সঙ্গে যে সংবাদটী সে দিতে যাচ্ছিল তা মোটেই খাপ খায় না। দিবসের মতো ছেলের পক্ষে ওটা সুসংবাদ না হবারই কথা। শোনবামাত্রই হয়তো হো হো করে' হেসে উঠবে। কিন্তু ময়লা কাপড় জামার কথা যখন বলছে, তখন হয়তো……হঠাৎ শশীবাবুর কথা মনে পড়লো সৌদামিনীর, বড়লোকের ছেলে ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে পথের ভিখারী হয়ে পড়েছিল একেবারে…

"আচ্ছা, আপনার দেশ কোথা ?"

সন্তর্পণে কথাটা পাড়লে সৌদামিনী। তার ভয় হচ্ছিল হয়তো অসাবধানে নিদারুণ ব্যথার স্থানটিতেই বুঝি খোঁচা দিয়ে ফেলবে।

"দেশ হুগলি জেলায়। কিন্তু কোলকাতাতেই আছি বরাবর।"

"এখানে বাড়ি আছে আপনার ?"

সৌদামিনীর চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল যখন দিবস ঘাড় নেড়ে জানালে কোলকাতাতেই বাড়ি আছে তার।

"এখানে বাড়ি আছে ? খোলার ঘরে আসা কেন তাহলে ?"

দিবসের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে' চলে এসেছি। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।"

সৌদামিনীর বিস্ময় সীমা অতিক্রম করে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল,

হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ল তার। ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের, পিতার সঙ্গে পুত্রের, বস্তুত যে কোন পুরুষের সঙ্গে যে কোন পুরুষের বিরোধ ঘটাবার যে সনাতন কারণটা সকলের মনে গাঁথা হয়ে আছে সেইটে সৌদামিনীরও মনে হল।

"সৎ মা আছে বুঝি?"

"না।"

"তবে?"

"আমার মা আমার ছোটবেলায় মারা গেছেন। বাবা আর বিয়ে করেন নি।"

"বাবার সঙ্গে ঝগড়া হ'ল কেন তাহলে?"

"বাবা চান আমাকে উকিল করতে। কিন্তু আমার তা ইচ্ছে নয়।"

"যত সব ছেলেমানুষি! কালই বাড়ি ফিরে যান আপনি!"

সৌদামিনীর স্নেহতরল কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ভর্ৎসনার আমেজ এমন মধুরভাবে বাজল যে মুগ্ধ হয়ে গেল দিবস। এতক্ষণ ভাল করে' সে চেয়েই দেখেনি সৌদামিনীর দিকে, এইবার ভাল করে' চেয়ে দেখলে। দেখলে গোলগাল মুখটিতে জ্বল জ্বল করছে চোখদুটো, স্নেহ আর বিস্ময়ের সঙ্গে ছদ্মকোপের দ্যুতি অপরূপ করে' তুলেছে, চোখের দৃষ্টিকে।

"উকিল হতে দোষটা কি! ভদ্দর লোকের ছেলেরাই তো উকিল হাকিম জজ ম্যাজিস্ট্রেট হয়—"

"উকিলরা গরীবদের কেউ নয়। ওদের কাজ হচ্ছে বড়লোক বদমাইসদের আইনের হাত থেকে বাঁচানো, ও আমি পারব না।"

ভারী কৌতুক লাগল সৌদামিনীর। বিশেষত এই শেষের কথা কটাতে।

"ও আমি পারব না"—ভারী মিষ্টি একটী আবদারের ঝংকার তুললে যেন। কিন্তু কার কাছে আবদার করছে ও?

"আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দাও, যদি পার, যে-কোনও কাজ।" —দিবস বলে' চলেছিল—"আমি দেখিয়ে দিতে চাই যে উকিল, ডাক্তার, মাস্টার কেরানী না হয়েও আমরা মানুষের মতো বাঁচতে পারি—"

"কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে হলে—"সকৌতুকে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল সৌদামিনী কিন্তু দিবসের কথার তোড়ে (যার জন্যে নিজেও সে পরে লজ্জিত হয়ে পড়েছিল একটু, কিন্তু যা তখন রোধ করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল) ভেসে গেল তার প্রতিবাদ।

"ভদ্রলোকের ছেলে হলেই কি একটা ছোট গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা থাকতে হবে চিরকাল? তাছাড়া ভদ্রলোক মানে কি! তোমরা কি আমাদের চেয়ে কম ভদ্র? আমরা একটা মুখোশ পরে' আছি তোমাদের সেটা নেই। আমি সেই মুখোশটা খুলে তোমাদের কাছে এসেছি বলে' তোমরাও আমাকে তাড়িয়ে দেবে।"

দিবসের গলার স্বরটা কেঁপে উঠল একটু। এবং তা শুনে সেই মুহূর্তে সৌদামিনীর জন্ম হল নব-জগতে। ওই কম্পনের ধাক্কাটা তার অন্তরলোকের এমন একটা দ্বার খুলে দিলে হঠাৎ যা কখনও কেউ খোলেনি আজ পর্যন্ত। একটা নিঃস্বার্থ অকৃত্রিম বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল তার চিত্ত। সে বুঝল এই বলিষ্ঠকায় যুবকটি আসলে একটি শিশু, দুরন্ত দামাল শিশু। ওর এই গোঁয়ার্তুমির ঝক্কি তাকেই এখন পোয়াতে হবে। বাধা দিলে উলটো ফল ফলবে। বাধা দিতে গিয়েই ওর বাপ এই কাণ্ডটি করেছে। মা নেই কিনা—মা থাকলে এমন হ'ত না। দিবসের খাওয়া শেষ হয়েছিল। কথাগুলো বলেই সে হাত ধুতে গেল। সৌদামিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল কি করা যায়। যে ছলনাময়ী নারী বহু সংকটময় মুহূর্তের জটিলতাকে যাদুমন্ত্র বলে

সরল করবার কৌশল আয়ত্ত করে' জীবনের এতটা পথ অতিক্রম করেছে সেই ছলনাময়ী নারী আত্মপ্রকাশ করল যেন তার মধ্যে। দিবস হাত ধুয়ে ফিরে আসতেই সৌদামিনী মিষ্টি হেসে বললে— "ওমা ওকি অলুক্ষুণে কথা। তাড়িয়ে দেব কেন? থাকতে যদি পারেন মাথায় করে' রাখব। কাজও একটা জোগাড় করে' দিতে পারি। কিন্তু আপনি তা পারবেন কি? গিরি যে মেসে কাজ করে সে মেসে ফাই-ফরমাস খাটবার জন্যে একটা চাকর দরকার। সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত আর বিকেলে ৪টে থেকে ৮টা পর্যন্ত কাজ, মাইনে শুকো কুড়ি টাকা। আপনি যদি করতে পারেন হয়ে যেতে পারে কাজটা। কিন্তু আপনি কি পারবেন এ কাজ করতে?"

মুখে যদিও হাসির আভাস ছিল না মনে মনে কিন্তু হাসছিল সৌদামিনী। তার মনে হচ্ছিল কাজের বর্ণনা শুনেই পিলে চমকে যাবে বাবুর।

"খুব পারব। করে দাও আমাকে কাজটা।"

"বেশ বলি তাহলে গিরিকে। গতর খাটালে আবার কাজের ভাবনা। কিন্তু আপনাদের হ'ল সুখী শরীর, আপনারা কি আমাদের মতো পারবেন"—

"কি জিদ্দি ছেলে বাবা," মনে মনে বললে সৌদামিনী।

"খুব পারব। তুমি দিয়েই দেখ না। হ্যাঁ আর একটা কথা—"

"কি?"

"তুমি আমাকে আর আপনি বলতে পাবে না। আর আমি তোমাকে দিদি বলে' ডাকব এখন থেকে।"

সৌদামিনী এটা প্রত্যাশা করেনি। সহসা অভিভূত হয়ে পড়ল সে। তারপর সামলে নিয়ে ডান হাতের তর্জনীটি চিবুকের একধারে ঠেকিয়ে বলে উঠল—"কি কাণ্ড!"

চোখের দৃষ্টিতে উথলে উঠল স্নেহ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গোবিন্দ স্যাণ্ডেল সূর্য চৌধুরির প্রকৃত বন্ধু এবং পাকা লোক, হাতে সময়ের অভাবও নেই, তাই তিনি থানা আর হাসপাতালগুলো তন্নতন্ন করে' খুঁজে ফেললেন। সমস্ত দিন সমস্ত রাত এবং তারপর দিন সকাল দশটা পর্যন্ত যখন দিবসের কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না তখন এই নাতি-উপেক্ষনীয় ব্যাপারগুলো মিটিয়ে ফেলাই সঙ্গত মনে হল তাঁর। অনুসন্ধানগুলো করলেন অবশ্য সূর্য চৌধুরিকে না জানিয়ে। তাঁর মনে যে এই সব নিদারুণ সন্দেহ জেগেছে এ কথা জানতে পারলে সূর্যকান্ত আরও ঘাবড়ে যাবেন তাঁর মনে হল। দিবস যে মোটর চাপা পড়তে পারে কিংবা পুলিসের হাতে পড়তে পারে এ বিশ্বাস গোবিন্দবাবুর ছিল না। কিন্তু তিনি পাকা লোক, সব দিক সামলে কাজ করাই তাঁর অভ্যাস, 'অধিকন্তু ন দোষায়' নীতির অনুসরণ করে' তাই এ কষ্টটুকু বন্ধুর জন্যে তিনি করলেন। ট্রামে বাসে যাতায়াত করতে কিছু অর্থব্যয়ও হল, তা হোক্, তবু তিনি তৃপ্তি পেলেন এতে। একটা কথা তিনি জানতেন না, জানলে এত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হ'ত না তাঁকে। সূর্য চৌধুরিও গোপনে ঠিক ওই কাজই করেছিলেন। থানায় যাননি অবশ্য তিনি—কারণ দিবসকে যতটা তিনি চিনতেন তাতে তার থানায় যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা তাঁর মনে আসেনি—কিন্তু হাসপাতালগুলোতে তিনি গিয়েছিলেন। মোটর চাপা পড়া বিচিত্র নয়, এ কথা তাঁর মনে হয়েছিল।

দুই বন্ধুর সন্ধ্যা বেলায় যখন দেখা হ'ল তখন দু'জনেরই মনে দিবসের সম্বন্ধে নিজ নিজ ধারণা গাঢ়তর রঙে আঁকা হয়ে গেছে।

আজকালকার ছেলেদের সম্বন্ধে গোবিন্দ সাণ্ডেলের ধারণ খুব উচ্চ নয় কোন কালেই। সূর্য চৌধুরি যদিও বেসুরো হওয়ার ভয়ে প্রিয় বন্ধু সাণ্ডেলের কথার প্রতিবাদ করতে চাইতেন না কখনও, (গল্পের আসরকে তর্কসভায় পরিণত করবার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না, বরং গল্পকে জমাটি করবার জন্যে আজকালকার ছেলেমেয়েদের বিরুদ্ধে দু'চারটে ফোড়নই তিনি ছেড়ে এসেছেন বরাবর) আসলে কিন্তু তিনি আজকালকার আদর্শবাদী ছেলেমেয়েদের শ্রদ্ধা করতেন মনে মনে। যত ভুলই করুক—তাঁর মনে হ'ত—ওদের মনের মধ্যে কোনও রকম ভেজাল নেই, ভুল করে করেও ওরা তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক রাস্তায় পৌছবে। দিবস চলে যাওয়াতে তিনি নিজেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। এর জন্যে যে কষ্টটা ভোগ করছিলেন সেটাকে লঘু করবার জন্যেই সম্ভবত দিবসের আদর্শটাকে উজ্জ্বলতর বর্ণে চিত্রিত করছিলেন তিনি মনে মনে, পুত্র গর্বে গর্বিত হয়ে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছিলেন তির্যক পথে।

গোবিন্দ সাণ্ডেল এই শোচনীয় ঘটনাটাকেই বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবেন বলে' এসেছিলেন। তাই মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে আরম্ভ করলেন।

"হুঁঃ, আজকালকার ছেলে, আমি তখনই গোড়ায় যা সন্দেহ করেছিলাম—"

কথা অসমাপ্ত রেখে আড়চোখে তিনি চাইলেন একবার সূর্য চৌধুরির দিকে এবং আশা করতে লাগলেন সূর্য চৌধুরি এক আধটা ফোড়ন অন্তত ছাড়বেন। কিন্তু সূর্য চৌধুরি যা করলেন তাতে চমকে গেলেন সাণ্ডেল। এটা তিনি প্রত্যাশা করেন নি।

"আজকালকার ছেলেদের কতটুকু জান তুমি ?"—হঠাৎ প্রশ্ন করে' বসলেন সূর্য চৌধুরি।

সাণ্ডেল মশায়ের চোখে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেলেও হেসেই উত্তর দিলেন তিনি।

"যতটুকু জানি ততটুকুতেই মুগ্ধ হয়ে আছি। আর জানবার বাসনা নেই।"

উত্তরটা দিয়ে মুখে মৃদু হাসিটি ফুটিয়ে রেখে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন তিনি। তাঁর হাসি থেকে নিষ্ঠুর একটা ব্যঙ্গ ইঁটের মতো ছিটকে গিয়ে সূর্য চৌধুরির কপালে আঘাত করলে যেন। সূর্য চৌধুরি গম্ভীর-ভাবে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিলেন প্রথমে—"কিচ্ছু জান না তুমি," কিন্তু পরমুহূর্তেই আর একটা ইঁট এসে লাগল এবং তার ফলে শুধু যে তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চতর গ্রামে উঠে গেল তা নয় তিনি যে উপমাটা ব্যবহার করলেন তা দুর্বোধ্য ঠেকল সাণ্ডেল মশায়ের কাছে।

"আমরা কেউ কিচ্ছু জানি না। আমরা আমাদের সেকেলে জুতোগুলো ওদের পায়ে জোর করে' পরাতে যাচ্ছি, ওরা তো বিদ্রোহ করবেই।"

চোখ বড় বড় করে' চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ গোবিন্দবাবু।

"জুতো! মানে?"

"আমাদের সেকেলে মতামত একালে চলবে কেন? নূতন যুগের মানুষ ওরা, ওদের পথ তো আলাদা হবেই।"

নিজের অভিমতটা প্রাঞ্জল করেও কিন্তু সুবিধা হল না। চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত এবং ভ্রূযুগল ঈষৎ উৎক্ষিপ্ত করে' সাণ্ডেল মশাই বললেন, "পথ! ও বাবা! দেখ ভাই সূর্যকান্ত, কয়েকটি কথা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। 'নবযুগ' 'পথ' 'তরুণ' 'সবুজ' এসব শুনলেই পট করে' মাথায় খুন চড়ে যায় আমার। দোহাই তোমার ও কথাগুলি শুনিয়ো না আমাকে।"

সূর্য চৌধুরি আত্মস্থ হয়ে পা দোলাচ্ছিলেন ধীরে ধীরে। মৃদু

হেসে বললেন "বেঁচে থাকলেই শুনতে হবে। তোমার মাথায় খুন চড়ে' যায় বলে' সত্য মিথ্যা হয়ে যাবে না। সে তার পথে ঠিক চলবে"।

এইবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল সাণ্ডেলের। একটু ঝুঁকে বেশ একটু তিক্তকণ্ঠেই বলে ফেললেন তিনি—"পথ পথ করছ, পথটা কি বুঝিয়ে বলতে পার ?"

"খুব পারি"—মৃদু হেসে উত্তর দিলেন সূর্য চৌধুরি—"যে পথে আমাদের পূর্বপুরুষরা মধ্য এসিয়া থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, যে পথে আমরা পাড়াগাঁর চণ্ডীমণ্ডপ থেকে শহরের ক্লাবে এসেছি, পঞ্চায়েত ছেড়ে আশ্রয় করেছি আদালতকে।"

"ও বাবা!"—মৃদু হাসি ফুটে উঠল সাণ্ডেল মশায়ের অধরে। হাসিমুখে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি বন্ধুর মুখের দিকে। তারপর বললেন, "এতই যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে তাহলে ছটফট করে' মরছ কেন ?"

"ছটফট করে' মরছি কে বললে তোমাকে ?"

"তোমার চোখ মুখ। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চোখের কোলে কালি পড়ছে। রাত্রে ঘুমোও নি বোধ হয়।"

"ছটফট যদি করেই থাকি তাহলে সেটা আমার দুর্বলতা।"

"এতক্ষণ পরে খাঁটি কথা বলেছ একটি। দুর্বলতা একটু-আধটু নয় ষোল আনা। গোড়াগুড়ি দুর্বলতা প্রকাশ করেছ, আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটি খেয়েছ ওর"

সূর্যকান্ত চুপ করে' রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "কথাটা একটু অশোভন হবে আমার মুখে, তবু তুমি বন্ধু বলেই বলছি তোমাকে, দিবুর মতো হীরের টুকরো ছেলেকে যতটা আদর করা উচিত তার সিকির সিকিও করিনি আমি। কড়া শাসনের উপরই রেখেছি বরাবর। মা-হারা ছেলে—"

হঠাৎ থেমে গেলেন সূর্যকান্ত। গোবিন্দ সাণ্ডেলও অনুভব করলেন

অন্ত সুরে কথা কওয়া উচিত এবার। বড্ড দমে গেছে লোকটা। দু' একবার মাথায় হাত বুলোবার পর তাঁর হঠাৎ একটা কথা মনে হল। ব্যক্ত করলেন সেটা।

"রেস্ত ফুরুলেই বাছাধন ফিরে আসবেন। ক'টা টাকা নিয়ে গেছেন ?"

"ওর স্কলারশিপের পাঁচ শ' টাকা ওর নিজের অ্যাকাউণ্টে ছিল। সেই টাকাগুলো ও বার করে নিয়েছে খবর পেয়েছি।"

ও বাবা, তাই নাকি! ওর অ্যাকাউণ্টে টাকা রাখতে গেছ কেন ? কি আপদ!"

"ওর টাকা ওর অ্যাকাউণ্টে থাকবে না তো কার অ্যাকাউণ্টে থাকবে ?"

গোবিন্দ সাণ্ডেল চুপ করে রইলেন ক্ষণকাল, তারপর বললেন, "টাকাগুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফিরবে না। দু'চার দিন দেরি হবে আর কি। টাকাগুলি শেষ হলে সুড়সুড় করে' ফিরে আসবে দেখো। কোলকাতা শহরে পাঁচ শ' টাকা খরচ করতে অবশ্য বেশি সময় লাগে না"।

এই পর্যন্ত বলে' সামলে গেলেন তিনি। এর পর তার মনে হচ্ছিল 'আর আমি যেটা সন্দেহ ক'রছি তা যদি হয়ে থাকে তাহলে ও কটা টাকা তো ফুট কড়াই হয়ে যাবে দেখতে দেখতে'—কিন্তু একথাগুলো আর বললেন না তিনি। বন্ধুর মনে দুঃখ দেওয়ার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। ভাগ্যে বলেন নি কারণ পরমুহূর্তেই যা ঘটল তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ব্রজ এসে ঢুকল একটা পার্শেল বগলে করে।

"তোমাক বলতে ভুলে গেছি এই পার্শেলটা আজ এসেছে দুপুরের ডাকে।"

"কিসের পার্শেল ?"

"খুলে তো দেখিনি। তোমার মুহুরি এসেছিল সেই সই করে নিয়ে রেখে গেল।"

"খোল দেখি। পার্শেল কোথা থেকে এল বুঝতে পারছি না।"

পার্শেল খুলে দেখা গেল একটা শাল, একটা মোটা লুই আর একখানা চিঠি রয়েছে। দিবসের চিঠি। দিবস লিখছে—

শ্রীচরণেষু,

বাবা, আমার স্কলারশিপের টাকাগুলো আজ বার করে' নিলাম। আমার অনেক দিন থেকে ইচ্ছে ছিল আমার স্কলারশিপের টাকা দিয়ে আপনাকে একখানা শাল আর ব্রজদাকে একটা ভাল গায়ের কাপড় কিনে দেব। তাই কিনে আজ পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার হাতে যে কয়টা টাকা রইল তা দিয়ে অনায়াসে আমার কয়েকদিন চলে যাবে। এর মধ্যে আমি নিশ্চয়ই একটা কাজ যোগাড় করে' নিতে পারব। আমি পরীক্ষা করে' দেখতে চাই নিজের সামর্থ্যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি কি না। আমার জন্য আপনারা অনর্থক মন খারাপ করে থাকবেন না। আমি ভাল আছি। আমাকে অনর্থক খোঁজাখুঁজি করেও সময় নষ্ট করবেন না, আমি নিজেই সময় মতো একদিন গিয়ে দেখা করে' আসব আপনার সঙ্গে। একটা রিসার্চের পথে আপনি আমাকে যেতে দেন নি—হয়তো ভালো ভেবেই দেন নি—তাই আর একটা রিসার্চের পথে আমি অগ্রসর হয়েছি। আমার শিক্ষা এবং শক্তি কতখানি তা আমি যাচিয়ে নিতে চাই। আমি জানি আপনি এপথেও আমাকে যেতে দেবেন না, তাই কিছুদিন আত্মগোপন করে' থাকব। আপনি আমার প্রণাম নিন। ইতি—

প্রণত দিবস

সূর্য চৌধুরি নীরবেই চিঠিখানা পড়লেন প্রথমে। এবং পড়বার পরও নির্বাক হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

"কার চিঠি?"—ব্রজ প্রশ্ন করল।

"দিবুর।"

"দিবুর? কি লিখেছে?"

সূর্য চৌধুরি জোরে চিঠিখানা পড়লেন আবার। ব্রজ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। গোবিন্দ সাণ্ডেলের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করেছিল, তাই ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেল একটু।

কিরণ নিশ্চয়ই দিবসের কাণ্ড শুনে চটে উঠত কিন্তু দিবস

ব্যাপারটাকে এমন একটা বিশিষ্ট উপমা দিয়ে এমন একটা বিচিত্র আলোকে ফুটিয়ে তুললে যে কিরণের কবি-মন রূপকথা-লোকের রঙীন আলোছায়ায় আবিষ্ট হয়ে পড়ল। রাগ করবার কথা মনেই হল না তার। এ উপমাটার কথা দিবসেরও হয়তো মনে হ'ত না যদি না সে শস্তায় সেদিন সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বইয়ের দোকান থেকে আরব্য উপন্যাসখানা কিনে ফেলত। আরব্য উপন্যাস ইতিপূর্ব্বে অনেকবার পড়েছে সে, দ্বিতীয়বার কিনে পড়ার দরকার ছিল না, কিন্তু মলাটের উপর যে ছবিখানা আঁকা ছিল তা এমন মুগ্ধ করে' ফেলল তাকে যে বইটা সে না কিনে পারল না। নিষ্ঠুর সুলতান শাহারজাদি দিনারজাদির কাছে বসে' গল্প শুনছেন। অন্ধকার আকাশের গায়ে আলোর আভাস ফুটে উঠেছে। আলোর ছোঁয়া লেগে অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে আসছে, সুলতানের নিষ্ঠুরতাও যেন প্রেমে রূপান্তরিত হচ্ছে রূপকথার ছোঁয়া লেগে। অদ্ভুত ছবিটা। রমাঁ রলাঁর "I will not rest" বইখানাও কিনেছিল সে, কিন্তু প্রথমেই পড়ে ফেলেছিল আরব্য উপন্যাসখানা। যদিও সমস্ত দিন অনেক হেঁটেছিল তবু রাত্রে অচেনা জায়গায় ভাল ঘুম হচ্ছিল না। অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগেই ছিল সে। আর একটা কারণও ছিল—মশা। মশারি কেনা হয়নি।

আরব্য উপন্যাস কিন্তু তাকে এমন একটা রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিল যেখানে মশার কামড়ের জ্বালা অসহ্য নয়।

কিরণের বাড়ির সামনাসামনি আসতেই আবার এমন একটা দৃশ্যের মধ্যে সে পড়ে গেল যে দ্বিতীয়বার মনে পড়ল আরব্য-উপন্যাসের কথা। গলির সামনে ভিড় জমেছে একটা। লোক জুটেছে নানা জাতের, নানা বয়সের। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একটি নৃত্যপরা বেদে মেয়েকে দেখছে সবাই। কাছেই ঢোলক বাজাচ্ছে একটি বুড়ো। লম্বকর্ণ রামছাগলও রয়েছে একটি। মেয়েটি যেন রামছাগলকেই নাচ দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে এসে তার থুতনিটা নেড়ে আদর করছে। মেয়েটির হাতে আছে একটি ট্যামবুরিন। পরনে ঘাগরা, ওড়না। বুকে কাঁচুলি বাঁধা। কোলকাতা শহরের মাঝখানে দিন দুপুরে একটা ইরানী ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে যেন। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দিবসও নাচ দেখতে লাগল। বেশি বয়স নয় মেয়েটির। ওই ঢোলক-বাজিয়ে বৃদ্ধ ওর বাপ বোধ হয়। দিবসের মনে হল আমাদের তথাকথিত ভদ্র সমাজে ছেলে-মেয়েরা বাপ মায়ের বোঝা স্বরূপ। ছেলেকে পড়াতে আর মেয়ের বিয়ে দিতে অনেকেই সর্বস্বান্ত। যাদের আমরা ছোটলোক বলি তাদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু অল্পবয়স থেকেই যে যতটুকু পারে উপার্জন করে। শিক্ষার আসল লক্ষ্য মনুষ্যত্ব লাভ। বিপুল অর্থ ব্যয় ও প্রাণপাত করে' বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফত আমরা সে মনুষ্যত্ব যতটা লাভ করতে পেরেছি স্কুল কলেজে না গিয়েও ওরা যে তার চেয়ে কম লাভ করেছে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। আমাদের স্কুল কলেজে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল অর্থোপার্জন-ক্ষমতা লাভ করা। কিন্তু আজকাল কলেজের ডিগ্রির আর সে মূল্য নেই। কিন্তু ওই তথাকথিত ছোটলোকেরা যে সব কাজ করে' অর্থোপার্জন করে আসছে চিরকাল তার মূল্য কোনদিন কমবে না, বরং বাড়বে। হঠাৎ দেখতে পেলে দূরে

কিরণ আসছে। কিরণ ফুটপাতের দিকে চেয়ে কবিতার লাইন ভাবতে ভাবতে আসছিল সম্ভবত। দিবসকে সে দেখতে পেল না। ভিড়ের দিকে স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে একবার চেয়ে গলির ভিতর ঢুকে পড়ল। নাচটাও শেষ হল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। মেয়েটি ট্যমবুরিন পেতে পয়সা চেয়ে বেড়াতে লাগল সকলের কাছে। পয়সা, আনি, দোয়ানি পড়তে লাগল। দিবসের কাছে আসতেই দিবস একটা টাকা দিয়ে ফেললে হঠাৎ। মেয়েটি দিবসের মুখের দিকে চেয়ে সেলাম করলে তাকে। দিবস তারপর ভিড় থেকে বেরিয়ে ঢুকল কিরণের গলিতে। কিরণও খোলার ঘরে থাকে। কড়া নাড়তে হল না, কপাট খোলাই ছিল।

"আরে দিবু যে!"

"আমি এখন দিবু নই, আমি হারুণ-অল-রশিদ, ছদ্মবেশে রাজ্য পর্যবেক্ষণ করতে বেরিয়েছি।"

কিরণ তখনও স্বপ্ন-তরণী থেকে অবতরণ করে নি। তখনও তার মনে জাগছিল।

সব লগনের শেষে তাদের লগ্ন কি
নীহারিকায় মূর্তি ধরে স্বপ্ন কি
ঠাঁই পেল না যারা দিনের আলোকে
তাদের পথে এমন আলো জ্বাল কে
আকাশ ভরা কালোকে
রূপ দিয়েছ তোমরা বল কারা
অন্ধকারে আকাশ-ভরা তারা।

দিবসের কথায় তার তরণীর পালে আবার হওয়া লাগল যেন। অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে দিবসের মুখের দিকে।

"মানে ? বুঝতে পারছি না কিছু !"

"ল কলেজ ছেড়ে দিয়েছি বলে' বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন বাড়ি থেকে। সরোদটাও ভেঙে দিয়েছেন। দিনের হারুণ-অল-রশিদ রাতের হারুণ-রল-রশিদ হয়ে গেছে হঠাৎ। অন্ধকারে সে দেখতে চাইছে নিজেকে যাচিয়ে, আবিষ্কার করতে চাইছে উত্তরাধিকারসূত্রে যে রাজত্বটা সে দিনের আলোয় ভোগ করতে তার চেয়েও মহত্তর কোনও রাজত্ব অন্ধকারে লুকিয়ে আছে কিনা !"

কিরণের চোখের দৃষ্টি আরও স্বপ্নময় হয়ে উঠল। উৎসাহিত হয়ে উঠল সে পরমুহূর্তে।

"সব খুলে বল দেখি। ব'স, ভাল করে' ব'স।"

গহনচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিটি যে কেউ-কেটা নন্ এ কথা বিকাশের চক্ষে প্রতিপন্ন করবার সুযোগ পেয়ে চুনীলাল পুলকিত হয়ে উঠেছিল। যে মিউজিক কনফারেন্সে ভারতের বিখ্যাত গুণীরা আমন্ত্রিত হয়ে সমবেত হবেন সেখানে সরোদ বাজাবার জন্যে, গহন-চাঁদও যে অনুরুদ্ধ হয়েছেন এই গর্বে চুনীলাল যেন ফেটে পড়ছিল, কিন্তু তার গর্বের সঙ্গে স্বার্থতো ছিলই, কিঞ্চিত আত্মপ্রসাদও মিশল যখন সে খবর পেল বিকাশও সেই কনফারেন্সের টিকিট কিনেছে। বিকাশবাবুর সম্মতি পেয়ে সে বিকাশবাবুর জ্যাঠা প্রকাশবাবুর সঙ্গেও দেখা করেছিল ইতিমধ্যে। অন্নদা বিশ্বাস প্রকাশবাবুকে যতটা বীভৎসরূপে চিত্রিত করেছিল চুনীলাল দেখল মোটেই তিনি সে রকম নন্। চুনীলালের মনে হ'ল অন্নদা নিশ্চয় কারও 'থ্' দিয়ে পরের মুখে ঝাল খেয়েছে। প্রকাশবাবু লোকটি যদিও খুব গম্ভীর কিন্তু বেশ অমায়িক। বিবাহের প্রস্তাব বেশ মন দিয়ে শুনলেন, ফটোটি দেখে পছন্দ করলেন, বিকাশবাবু যে রঙ্গনাকে দূর থেকে

দেখে পছন্দ করেছেন এ সংবাদটাও প্রণিধান করলেন ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে', তারপর অমায়িকভাবে যে কথাগুলি বলবেন তা আধুনিক-আধুনিকাদের কর্ণে মধু বর্ষণ করবে না হয়তো কিন্তু চুনীলালের কাছে সঙ্গত বলেই মনে হল। তিনি বললেন (অমায়িকভাবেই) —"দেখুন, আমাদের পারিবারিক প্রথা অনুসারে বিকাশের বিয়েতে আমাকেই কর্তৃত্ব করতে হবে। আর আমাকে কর্তৃত্ব করতে হলে আমাদের পারিবারিক নিয়মগুলি, যা এতকাল সবাই মেনে এসেছে তা না মেনে আমি পারব না। সে নিয়মগুলি হচ্ছে এই : কন্যার কুষ্ঠি চাই। কুষ্ঠির যদি মিল হয় তাহলে আমরা মেয়েটিকে দেখতে যাব। বিকাশ যাবে না, আমরা, মানে কর্তৃপক্ষরা যাব। মেয়ে যদি পছন্দ হয় তখন দেনা পাওনার কথা হবে। দেনা পাওনা মানে এ নয় যে আমরা মেয়ের বাপকে পীড়ন করব। তবে খুব কম করে' ধরলেও আজকালকার দিনে হাজার পাঁচেক টাকা লাগবে তার। বিকাশের মেয়েটিকে পছন্দ হয়েছে বলেই এত কম করে' 'বলছি।"

প্রকাশবাবুর এই ধরণের কথাবার্তা অসঙ্গত মনে হয় নি চুনীলালের। এই দুর্মূল্যের বাজারে পাঁচ হাজার টাকায় যদি অমন একটা জামাই পাওয়া যায় তাহলে সেটা 'চীপ্'ই বলতে হবে। 'ড্যাম্ চীপ্' বলতেও আপত্তি নেই চুনীলালের।

আর একটা কথাও ভাবছিল চুনীলাল। ঘড়িতে দম না দিলে ঘড়ি যেমন চলে না জামাইবাবুকেও তেমনি একটা প্যাঁচে না ফেললে উনি রোজকারের চেষ্টা করবেন না। বিয়ের খরচ অবশ্য ধার করে' জোগাড় করতে হবে, কাশীর বাড়িটা বাঁধা দিলে সে টাকা সংগ্রহ করাও অসম্ভব হবে না, কিন্তু সেই ধারটা শোধ করবার তাগিদে জামাইবাবু হয় তো এখানে 'সঙ্গীত-ভবন'-টাতে ভালো করে' মন দেবেন এবং উনি যদি ভালো করে' মন দেন

তাহলে হু হু করে' 'সঙ্গীত-ভবন' চলবে, (গান বাজনা শেখার যা ঝোঁক হয়েছে আজকাল !) চুনীলালের সঙ্গে জামাইবাবু যদি হাপাহাপি ('হাফ এণ্ড হাফ'-এর বাংলা সংস্করণ) করেন তাহলে চুনীলালেরও সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে যদি একটা বাজনার দোকান খোলা যায়, কিংবা যদি কোনও দোকানদারের সঙ্গে কমিশনের বন্দোবস্ত করা যায়, তাহলে তো— ।

সুতরাং মিউজিক কনফারেন্সে গহনচাঁদ নিমন্ত্রিত হওয়াতে চুনীলালের আকাশ-কুসুমের পাপড়িতে পাপড়িতে রঙের ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। বিকাশবাবুরা দেখুক যে গহনচাঁদ যে-সে লোক নয়। আর পাঁচজনও দেখুক ! কত বড় পাবলিসিটি হবে একটা।

চুনীলাল ইতিমধ্যে নিজেই হাণ্ডবিল ছাপতে দিয়েছিল।

গহনচাঁদ যদিও মিউজিক কনফারেন্সে যেতে রাজি হয়েছিলেন কিন্তু তারিখটা মনে ছিল না তাঁর।

চুনীলালের মুখে খবরটা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন তিনি।

"আজই নাকি ? বল কি! সীতারাম আর রমজানকে খবর পাঠাও তাহলে—"

"পাঠিয়েছি"—স্মিতমুখে উত্তর দিলে চুনীলাল।

"রঙ্গনাও যাবে কি ?"

"যাবে বইকি, রঙ্গনাকে গান গাইতে অনুরোধ করেছে যে ওরা।"

"রঙ্গনাকে ? কেন ?"

"আপনার মেয়ে বলে।'

"ও তাই নাকি !"

কিরণের স্বপ্নাচ্ছন্নভাব কিন্তু রইল না বেশীক্ষণ। দিবসও বেশীক্ষণ স্বপ্ন-কুহেলী সৃজন করতে পারল না। যদিও সে বলল যে হারুণ-অল-

রশিদের ভূমিকা শেষ হলে হয়তো তাকে রবিন্সন ক্রুশো বা ক্যাপ্টেন কুকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে কিন্তু কিরণের সহজ বুদ্ধির আলোকে ব্যাপারটার স্থূলরূপ প্রকট হয়ে পড়ল একটু পরেই। দিবস যা ভয় করছিল তাই ঘটল শেষে। কিরণ খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে বলল—"উকিল হওয়ার দোষটা কি ?"

দিবস এ সবের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। মনের নেপথ্যলোকে আর এক দিবস আস্তিন গুটিয়ে মালকোঁচা মেরে অপেক্ষা করছিল। কবি দিবস অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গে সে এগিয়ে এল।

"প্রথম দোষ এযুগে ও পেশা অচল। আমরা যে যুগের স্বপ্ন দেখছি সে যুগে ঝগড়া মারামারি নীচতা মিথ্যাকথার স্থান নেই। দ্বিতীয়ত এটা কি লজ্জার কথা নয় যে চিরকালই আমি নাবালক থাকব ? নিজের পৌরুষে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পাব না ?"

"তাতে তোমাকে বাধা দিচ্ছে কে"—গম্ভীরভাবে কিরণ প্রশ্ন করল।

"বাবার গদিতে বসে' পিতৃসম্পত্তি ভোগ করা মানেই তাই।"

"ইচ্ছে করলে সে সম্পত্তির সদ্ব্যবহার তুমি করতে পার। উকিল হয়েও ঝগড়া মারামারি নীচতা মিথ্যাকথার বিরোধিতা করা অসম্ভব নয়।"

যুক্তিটা অকাট্য বলে' মনে হল দিবসের, ক্ষণকালের জন্য থমকে গেল সে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আর একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। চমৎকার কথা সেটা। তার পরবর্তী উক্তিতে তাই শুধু উৎসাহ নয় একটু ঝাঁজের আমেজও লাগল। কথাটা মনে পড়াতে শুধু যে সে উৎসাহিত হল তা নয়, ক্ষুব্ধও হল।

"আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাণী কি আমরা তোতাপাখীর মতো আউড়েই যাব কেবল ? হাতে কলমে সেটা করবার সামর্থ্য কি এ যুগের ছেলে-মেয়েদেরও হবে না ?"

"কি করতে চাস তুই ?"

"আমি অবিলম্বে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উপার্জন করতে চাই। অর্থাৎ সত্যিকারের শ্রমিক হতে চাই।"

"কিন্তু বাবার সঙ্গে এরকম ভাবে ঝগড়া না করেও সত্যিকারের শ্রমিক হওয়া যেত।"

"তুইও একথা বলছিস্ ? তুই তাহলে কলেজ ছেড়ে ট্রাম ড্রাইভার হতে গেলি কেন ! তোর আদর্শই তো উদ্বুদ্ধ করেছে আমাকে।"

"আমার কথা আলাদা। আমার মা বাবা কেউ ছিল না। মামার গলগ্রহ হয়ে আর থাকতে পারলাম না। আত্মসম্মানে বাধল বলেই চলে' আসতে হল।"

"আত্মসম্মান জিনিসটা কি তোরই একচেটে ? না, মামার জায়গায় বাবা বসালেই তার মানে বদলে যায় ? বাবার উপার্জিত অর্থ ভোগ করতে করতে তাঁর নির্দিষ্ট পথে নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে চলাটাও কি আত্মসম্মানজনক ? তুই-ই বল।"

কিরণ চুপ করে রইল। সে বুঝল দিবসের সঙ্গে এখন তর্ক করে' লাভ নেই। বরং সে এখন ঠিক কি করবে সেইটে জেনে নেওয়াই উচিত।

"তুই বাড়ি ফিরবি না তাহলে ?"

"আপাতত নয়।"

"আমার এখানেই থাকবি ?"

"না, আমি আস্তানা ঠিক করেছি একটা কারফরমা লেনে। চাকরিও জোগাড় হয়েছে একটা।"

"কি চাকরি ?"

"একটা মেসের চাকর হয়েছি।"

"মেসের চাকরি।"

'হ্যাঁ, কি হয়েছে তাতে ?"

দিবসের চোখে মুখে যে গর্বটা ফুটে উঠল তা নিতান্তই শিশু-সুলভ মনে হল কিরণের। সে হেসে ফেললে।

"কিছু হয়নি! কিন্তু ওর চেয়ে ভাল চাকরি তুই পেতে পারিস নিশ্চয়।"

"তা হয়তো পারি। কিন্তু তাহলে হারুণ-অল-রশিদ হওয়া যায় না। আমি দেখাতে চাই যে হারুণ-অল-রশিদ সিংহাসনেও বসতে পারে, ছেঁড়া মাদুরেও বসতে পারে।"

দিবসের মুখের দিকে চেয়ে ভারি কৌতুক বোধ হ'ল কিরণের। ছেঁড়া মাদুরে বসবার শখ হয়েছে—ছেঁড়া মাদুরে বসে' সারাজীবন কাটাতে হচ্ছে যাদের তাদের অবস্থাটা তো জানে না। চকিতে উর্মির কথা মনে পড়ল একবার। হেসে বলল, "হঠাৎ হারুণ-অল-রশিদ সাজবার শখ যে হল তোমার!"

"আমি চাই নিজের মতে নিজের পথে চলতে। হারুণ-অল-রশিদের মতো আমিও চাই একঘেয়েমির কারাগার থেকে বেরিয়ে পড়তে। আবিষ্কার করতে চাই কোথায় আমার শক্তি কোথায় আমার দুর্বলতা। সাধারণ প্রজার বেশ ধরে' হারুণ-অল-রশিদ যেমন রাত্রির অন্ধকারে অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করতেন নিজের স্বরূপ, আমিও তাই করতে চাই।"

কিরণের চোখ আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, আবার স্বপ্নের ছোঁয়াচ লাগল তার মনে।

"একটু চা কর দিকি"—দিবস বলল হঠাৎ।

কিরণের স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল। কবিকে সরিয়ে দিয়ে নানা-ভাবে-বিব্রত শ্রমিক কিরণ বেরিয়ে পড়ল রঙ্গমঞ্চে।

"স্টোভে তেল নেই। পারমিট পাইনি এখনও"—এবার কিরণের

মুখে যে হাসি ফুটে উঠল তার অর্থ আগুন নিয়ে খেলা করতে যেও না। দারিদ্র্য ভয়ানক জিনিস।

"চল দোকানে তোকে চা খাওয়াচ্ছি" বলে' জুতোয় পা গলাতে গলাতে সে হেসে চাইলে একবার দিবসের দিকে। দিবস উঠে গিয়ে তার সরোদটা টুং টাং করছিল।

"আমাকেও সরোদ একটা কিনতে হবে। সুরু করেছি যখন ভাল করে' শিখতে হবে বাজনাটা।"

"ভাল করে' শেখবার একটা সুযোগও উপস্থিত হয়েছে। ঊর্মি বলছিল কাশী থেকে গহনচাঁদবাবু এসে এখানে একটা গানের স্কুল খুলেছেন নাকি। সরোদের বিখ্যাত ওস্তাদ তিনি একজন। আমি ভাবছি ভরতি হব তাঁর স্কুলে যদি অবশ্য আর একটা টিউশনি পাই।"

আবার তার মুখে হাসি ফুটে উঠল একটা। কিন্তু ম্লান হাসি।

"মাইনে কত ক'রে?"

"মাসে দশ টাকা শুনেছি।"

"চলনা দুজনেই একসঙ্গে ভরতি হওয়া যাক, আমার কাছে কিছু টাকা আছে এখনও। মেসে যে চাকরিটা নিয়েছি তাতে আমার খাওয়াটা চলে যাবে। তারপর আরও কিছু জুটে যাবেই একটা নিশ্চয়। সন্ধ্যের পর ভাল গোছের একটা টিউশনি পেলেই চলবে আপাতত। কালই সরোদ একটা কিনে ফেলি আগে, কি বল?"

ছেলেমানুষের মতো উৎসাহিত হয়ে উঠল দিবস। কিরণ হেঁট হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধছিল (পাম্পশু পরে না সে কখনও, মজবুত ডার্বিশুই তার পছন্দ) নিপুণভাবে ফিতে বাঁধা শেষ করে' সে যখন মুখ তুলে চাইল তখন তার মনের গ্লানি কেটে গেছে, মুখে যে হাসি ফুটে উঠেছে তা আর ম্লান নয়, অন্তর্দ্বন্দ্বে জয়ী হয়েছে সে।

"তোর প্ল্যানটা কি বল দেখি, ঠিক বুঝতে পারছি না, এই সব ছোটখাট উঞ্ছবৃত্তি করেই জীবন কাটাবি না কি ?"

দিবসের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল হঠাৎ।

"উঞ্ছবৃত্তি ? উঞ্ছবৃত্তি কাকে বলিস তুই ! মাইনে কম পেলেই সেটা উঞ্ছবৃত্তি হয়ে যায় নাকি ! তুই কি উঞ্ছবৃত্তি করছিস্ ?"

কিরণ আর একটু হাসলে। তার মনে হল দিবসের মন এখন যে তুরীয় অবস্থায় আছে সেখান থেকে তাকে মর্ত্যে নাবিয়ে আনা যাবে না। সে চেষ্টা না করে সে বলল, "চল বেরোন যাক। আমার ব্যাগটা এনেছিস্ তো ?"

"এনেছি।"

দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল এবং নীরবেই পাশাপাশি হাঁটল খানিকক্ষণ। দিবসের মন কিন্তু নিষ্ক্রিয় যে ছিল না তা তার পরবর্তী কথাগুলো থেকেই বোঝা গেল। কিরণের যে কথাটা তাকে আঘাত দিয়েছিল সে কথাটা থেকে সে অনেক দূর সরে' গিয়েছিল। মাঝির হাতের ধাক্কা খেয়ে নৌকা যেমন তীর ছেড়ে ভেসে যায় তেমনি তার মন ভেসে চলেছিল কল্পনার স্রোতে, পালে লেগেছিল আনন্দের হাওয়া। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার পর থেকে যে অদ্ভুত একটা আনন্দ তার সমস্ত সত্তাকে ওতপ্রোত করে রেখেছিল—যা বাইরের ঘটনা-সংঘাতের ধূলোয় মাঝে মাঝে আবৃত হলেও অবলুপ্ত হচ্ছিল না একবারও—সেইটে হঠাৎ যেন জোর হাওয়ার মতো লাগল হঠাৎ এসে তার নৌকার পালে। তর্‌তর্ করে' ভেসে চলেছিল সে।

"তুই বুঝিস্ না কিছু"—ঈষৎ হেসে প্রসন্ন কণ্ঠে বললে সে—"আমি এক জায়গায় বাঁধা থাকব একথা তুই ভাবছিস্ কেন ? ছাতে ওঠাই আমার লক্ষ্য, সিঁড়ি নিয়ে আমি মাথা ঘামাব কেন ? সব সিঁড়িই সমান, সব সিঁড়িই ভাল। আপাতত একটা চাকর হয়েছি কিন্তু সম্ভাবনা

অনেক আছে। হেনরি ফোর্ড, ডেল কার্নেগী, সার আর এন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র,—সম্ভাবনা কি একটা? অনন্ত। এই গণ্ডীর বিরুদ্ধেই তো আমার বিদ্রোহ।”

কিরণ যদিও মনে মনে ভাবছিল কি করে' দিবসকে আবার ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু দিবসের এই কথা শুনে আবার তার মনের সুর বদলে গেল। শাদা কাপড়ে খানিকটা রং ঢেলে দিলে যেন কেউ। কাল ট্রাম চালাতে চালাতে যে কথাটা তার মনে হচ্ছিল (যার ফলে সে কবিতাটা লিখেছে) যা আজও মনে হচ্ছিল একটু আগে সেই কথাটাই মনে পড়ল আবার।

“গণ্ডীর বিরুদ্ধে আমরা সবাই বিদ্রোহ করতে চাই”—মৃদু হেসে বলল সে—“কিন্তু মুশকিল হয়েছে গণ্ডীটা কোথায় তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। পথই দেখতে পাচ্ছি না আমরা। কাল আমার মনে হচ্ছিল আমরা সবাই যেন অন্ধ জোনাকীর দল, আমাদের প্রত্যেকেরই দীপ্তি আছে, কিন্তু সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেউ, অন্ধকারে পরস্পর ঠেলাঠেলি করছি, মারামারি করছি, অন্ধ আবেগে হাত পা ছুঁড়ছি, পরস্পরের চাপে মারা যাচ্ছি শেষে, শুয়ে পড়ছি পথের উপরই এবং শুয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত জানতে পারছি না যে এতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম পথের উপর নয় শব-স্তূপের উপর।”

এই পর্যন্ত বলে' থেমে গেল কিরণ, তার বাকরোধ হয়ে গেল আবেগের আতিশয্যে। দিবস সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চাইতেই কিন্তু সামলে নিলে সে আবার। মৃদু হেসে বললে, “শেষকালে কি মনে হল জানিস্? মনে হল অন্ধকারে যারা পথ হারিয়ে ফেলেছে তারাই বোধ হয় আকাশ-ভরা তারা।”

দিবস কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল কিন্তু থেমে গেল। চায়ের

দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল তারা। দোকানের ভিতর থেকে রেডিওতে সরোদের গৎ বেজে উঠল একটা।

"বাঃ চমৎকার তো, চল শোনা যাক, এই তো চায়ের দোকান" চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল দু'জনে। দু' পেয়ালা চায়ের কথা বলে' তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল সরোদের বাজনাটা।

"বাঃ, কে বাজাচ্ছে?"

"কোন বড় ওস্তাদ নিশ্চয়।"

পাশে আর একজন বসে' চা খাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, "মিউজিক কনফারেন্স থেকে রিলে করছে—"

চা খাওয়া শেষ করে' দু'জনে আবার যখন ফুটপাথে নাবল তখনও সরোদ বেজে চলেছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল দু'জনে। একটু পরেই বাজনা থামল, রেডিও ঘোষণা করল—'কাশীর বিখ্যাত ওস্তাদ সঙ্গীতাচার্য গহনচাঁদ এতক্ষণ সরোদ বাজিয়ে শোনালেন।'

"ও' তাই।" কিরণ বললে।

"ইনি স্কুল খুলেছেন?"

"ঊর্মি বলছিল।"

কিরণ অন্যমনস্ক হয়ে গেল একটু। এর পরই ঠিক তার যে কথাটা মনে পড়ল—যদিও অবশ্য ঊর্মিকে কথা দেয় নি সে—তাতে তার চিন্তাধারা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল একটু।

"একটা সরোদ কিনে ফেলা যাক এখনই, চল।"

"আমাকে টিউশনি করতে যেতে হবে এখন।"

"কাল তোর সময় আছে?"

"কাল সকালে বাড়িতে থাকব।"

"কিন্তু সে সময় আমার যে চাকরি!"

রেডিও আবার ঘোষণা করল—"এর পর গান গাইছেন শ্রীমতী রঙ্গনা দেবী।"

সরোদ কেনার কথাটা চাপা পড়ে গেল। রঙ্গনার গান শুনতে শুনতে আবার পথ চলতে লাগল তারা। এই গানের সুরে নেপথ্যলোকে যে যোগাযোগের সূচনা হল তার ভবিষ্যৎ রূপের আভাসমাত্রও যদিও দিবসের মনে জাগবার সম্ভাবনা ছিল না তবু তার মনে হতে লাগল কি যেন একটা আসন্ন। আসন্ন বসন্তের আশায় গাছের শাখায় শাখায় যেমন কিশলয়ের ঘুম ভাঙে রঙ্গনার গানের সুরে দিবসের মনে তেমনি কি যেন একটা জাগল, কি সেটা তা বিশ্লেষণ করবার জন্যে তার আগ্রহ হল না, একটা অস্পষ্ট আবেশ তবু ধীরে ধীরে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল উষালোকের মতো। কিরণ ভাবছিল উর্মির কথা। উর্মি নিশ্চয়ই গেছে কনফারেন্সে গান শুনতে। তাকেও যেতে বলেছিল! অনেক করে' বলেছিল। বলেছিল তার জন্যে সে একটা টিকিট কিনে রাখবে। পাগল নাকি!

"একদিন টিউশনি করতে না গেলে কি আর হয়?"—উর্মির আবদার-মাখা মুখখানা মনে পড়েছিল কিরণের। কিরণ মানা করেছিল তাকে টিকিট কিনতে। কেনেনি বোধ হয়। কেনা উচিত নয় অন্তত।

······একই গানের সুর দু'জনকে নিয়ে গেল দুই জগতে। নীরবে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল তারা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তার পরদিন দিবস পথ চলছিল একা। ঘাড় হেঁট করে' আপন মনে হাঁটছিল সে, কোলকাতা শহরে নয়, নিজের জগতে। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল না। সরোদ কিনবে বলে বেরিয়েছিল সে বাড়ি থেকে। যে দোকান থেকে প্রথম সরোদটা কিনেছিল সেই দোকানের উদ্দেশেই বেরিয়েছিল। ঠিক করেছিল পায়ে হেঁটেই সেখানে যাবে, ঠিক ভাবে গেলে পায়ে হেঁটেই সেখানে গিয়ে পৌছতেও পারত যথাসময়ে। কিন্তু তা হল না, কারণ বাসা থেকে বেরিয়েই সে, কোলকাতা শহরে নয়, নিজের জগতে হাঁটতে লাগল। বাবা এবং ব্রজর জন্যে মন-কেমন-করার পাতলা কুয়াসায় সে জগতের সমস্তটাই প্রায় ঢাকা। তার একগুঁয়েমিটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের মতো মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে অটল হয়ে। চারিধারে জঙ্গল, জঙ্গলের অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তা অদৃশ্য আলেয়ার মতো প্রলুব্ধ করছে, অচেনা পাখির কাকলী ভেসে আসচে মাঝে মাঝে, মোড় ফিরতেই চোখে পড়ল একটা গাছ, প্রৌঢ় গাছ, অজস্র ফুলে ভরা, হেলে আছে, মনে হচ্ছে সস্নেহে অভ্যর্থনা করছে যেন তাকে। গাছের আড়াল থেকে সহসা ভেসে এল সৌদামিনীর সস্নেহ ভর্ৎসনা —'মাইনে তো পাবে মোটে কুড়িটি টাকা, মোমবাতি কিনে পয়সা নষ্ট করা কেন? কি কাণ্ড!' তারপর কুয়াসা, কুয়াসা, কুয়াসা। একটু পরে কুয়াসা ভেদ করে' দেখা দিল আর একটা গাছ। ঋজু, দীর্ঘ আকাশচুম্বী। আকাশ থেকে গাছটা যেন কথা কইলে তার সাহেব প্রফেসারের কণ্ঠে—'সুযোগ পেলে রিসার্চ করতে পারবে তুমি, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পেলে খুব খুশি হব।' মিলিয়ে

গেল গাছটা। পরমুহূর্তেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলেন গোবর্ধন, হরিদাস, অঘোর আর ধূর্জটি। যে মেসে সে চাকরি নিয়েছে সেই মেসের বাসিন্দা চারজন। তার মালিক চতুষ্টয়। রাজনীতিমত্ত গোবর্ধন, বিশেষত্বহীন অঘোর এবং সঙ্গীত-পাগল ধূর্জটি কলরব করতে করতে এলেন এবং চলে গেলেন। রসিক স্বল্পভাষী হরিদাস কেবল দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল তার দিকে চেয়ে। যে জাতীয় লোক সাধারণতঃ মেসে চাকর হয়ে আসে দিবস যে ঠিক সেই জাতীয় নয় এ সন্দেহ হরিদাসেরই হয়েছিল। কিন্তু একটি কথা বলেননি তিনি। না বললেও তাঁর চোখের দৃষ্টিতে এ খবরটুকু টের পেয়েছিল দিবস। পরমুহূর্তেই সহসা ছবির ফ্রেমের কথা মনে পড়ল তার। হরিদাসবাবুর বিছানার ঠিক উপরে যে ফটোখানা টাঙানো আছে তার ফ্রেমটা চমৎকার। ওই রকম ফ্রেম দিয়েই সে বাবার ছবিটাও বাঁধাবে। ভোরে উঠেই সে চলে গিয়েছিল তার ফটোগ্রাফার বন্ধুর কাছে। বাবার ফটোখানা নিয়ে এসেছে।······সব মিলিয়ে গেল আবার। কুয়াসা নেই, জঙ্গল পার হয়ে এসেছে সে অনেকক্ষণ, প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখান দিয়ে একটা পায়ে-হাঁটা-পথ বিসর্পিত রেখায় চলে গেছে চক্রবালের দিকে। সূর্য উঠছে, লাল হয়ে উঠেছে পূর্বাশা, চতুর্দিক আনন্দে পরিপূর্ণ······

···হঠাৎ দিবসের খেয়াল হ'ল যে গলিটায় ঢুকলে সে বাজনার দোকানে সহজে গিয়ে পৌছতে পারত সে গলিটাকে সে পিছনে ফেলে এসেছে অনেকক্ষণ আগে। হেঁটে যেতে গেলে আরও মাইল খানেক হাঁটতে হয় আবার উলটো দিকে। সামনে ট্রাম আসছিল একটা, যদিও ভিড় খুব, তবু তাতেই উঠে পড়ল দিবস। ট্রামে পুরুষের সীটগুলো সব ভরতি। লেডিজ সীটগুলোও। একটি লেডিজ সীটে রঙ্গনা বসেছিল কেবল। তার পাশে জায়গা খালি

ছিল খানিকটা। অনেকদিন আগে রবীন্দ্রনাথের দু'লাইন একটা কবিতা পড়ে' তার যে রকম মনে হয়েছিলে রঙ্গনাকে দেখে সেই রকম মনে হল তার প্রথমটা। দু'লাইন কবিতাটী একজনের পড়ে তার সমস্ত রস সারা চিত্তে নিমেষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, রঙ্গনাকে দেখেও ঠিক তেমনি হল। নিমেষের মধ্যে ওর সমস্ত রূপটা মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গেল যেন ফটোগ্রাফের মতো ত্বরিত অথচ নিখুঁত পদ্ধতিতে। তার পাশে জায়গা খালি ছিল বলেই তার দিকে চেয়েছিল সে, ক্ষণকালের জন্য চেয়েছিল, কিন্তু ওইটুকুর মধ্যেই কাণ্ডটা ঘটে গেল। রঙ্গনা দিবসকে দেখতে পায়নি, কারণ সে বাইরের দিকে চেয়েছিল। 'ট্রামে' 'বাসে' উঠলে সে বাইরের দিকেই চেয়ে থাকে একাগ্র দৃষ্টিতে, তার ভয় হয় অন্যমনস্ক হলেই বুঝি নাববার জায়গাটা পেরিয়ে যাবে। যে সব ট্রাম-আরোহীরা সমস্তক্ষণ কোনে চোখ বুজে বসে' থেকে ঠিক সময়ে উঠে নেবে যেতে পারেন তাদের মতো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় রঙ্গনার ছিলনা। বাইরের দিকেই চেয়ে বসেছিল সে। দিবসের চকিত দৃষ্টি যে একবার তার সর্বাঙ্গে সঞ্চরণ করে' অন্যদিকে সরে' গেল তাও সে টের পেল না। দিবসকে দেখতে পেল সে একটা দুর্ঘটনার ফলে। ট্রামটা ঘচাং করে' থেমে গেল হঠাৎ এবং দিবস হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল নিজেকে। রঙ্গনার সঙ্গে চোখো-চোখি হয়ে গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গনা একটু সরে' গিয়ে ভদ্রভাবে বললে, "বসবেন ? বসুন না এইখানে।"

"না থাক—দিবসের কণ্ঠস্বরে শুধু যে সমীহ ফুটে উঠল তা নয়, একটু আতংকের সুরও বেজে উঠল। কিছুদিন পরে এ যুগের স্ত্রীপুরুষের সান্নিধ্য বিষয়ে যে বক্তৃতা দিবস করবে রঙ্গনার কাছে তার সঙ্গে তার এখনকার আচরণের কোনও মিল দেখা গেল না। ট্রামের ডাণ্ডাটা

ধরে' সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অপ্রস্তুত মুখে। কানের পাশটা গরম এবং লাল হয়ে উঠল একটু। রঙ্গনাও আর দ্বিতীয় বার অনুরোধ করলে না তাকে। দিবসও আর দ্বিতীয় বার ফিরে চাইলে না তার দিকে। দিবসের মনে যে সব ভাব জাগছিল তা অবর্ণনীয় নয় এবং রঙ্গনা-বিষয়কও নয়। ট্রাম গাড়ির আরও কি কি উন্নতি হওয়া উচিত তাই ভাবছিল সে। ট্রাম গাড়ি দোতলা হলে ক্ষতি কি? আর একটু চওড়া করা সম্ভব নয় বোধ হয়, সম্ভব হলে করত নিশ্চয় ওরা। আর একটা কথা মনে পড়াতে আরও অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। তার মনে পড়ল এইচ, জি, ওয়েল্‌স্ না কে একজন লিখেছেন ভবিষ্যৎ যুগে ফুটপাথই চলবে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে···নিউক্লিয়ার এনার্জির যুগে হবে হয়তো··· হঠাৎ ট্রামটা থেমে গেল। দিবস দেখল অনেকেই নাবছে। তাকেও নাবতে হবে এখানে। তাড়াতাড়ি নেবে পড়ল। নেবেই দেখল সেই মেয়েটিও নেবেছে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয় পরমুহূর্তেই রঙ্গনা মৃদু হেসে তাকে যে প্রশ্নটা করল তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না সে। অবাক হয়ে গেল।

"আচ্ছা, আপনার বসতে সংকোচ হল কেন বলুন তো?"

সংকোচ কথাটা যেন চাবুকের মতো আঘাত করল তাকে। কথাটা সত্য বলেই আঘাতটা বেশি লাগল। সংকোচের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যে কারণগুলো জড়িয়ে থাকে সেগুলো সে অজ্ঞাতসারে এই মেয়েটির উপর আরোপ করেছে বলে' লজ্জাও হল বেশ। জবাব-দিহির সুরে তাই বলল—

"সংকোচ ঠিক নয়, ওটা আপনাদের প্রাপ্য সম্মান!"

"শুধু শুধু আমাকে সম্মানই বা করতে যাবেন কেন আপনি?

কিন্তু আপনার ধরণ-ধারণ দেখে সে কথাও তো মনে হল না। মনে হল আমি যেন অস্পৃশ্যা আর আপনি যেন আমার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে চাইছেন।"

"না, না ওকথা ভাবছেন কেন?"

"না ভেবে কি করি বলুন? আমাদের নিশ্চয়ই আপনারা অশুচি মনে করেন তাই ট্রামে বাসে 'ফর লেডীজ ওনলি' লেবেল সেঁটে আমাদের তফাতে রাখবার চেষ্টা করছেন, আর ভাবছেন আমাদের খুব সম্মান করা হচ্ছে। আপনাদের ওই নকল শিভল্‌রি যে অপমানেরই উলটোপিঠ তা বুঝতে বাকি নেই আমাদের।"

রঙ্গনার চোখে একটা বিদ্যুদ্দীপ্তি খেলে গেল। সে আর কিছু না বলে' গটগট করে' চলে গেল পিছন ফিরে। বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দিবস। আজকালকার মেয়েদের মধ্যেও এমন মুখরা তার চোখে পড়েনি তো! গায়ে পড়ে' ঝগড়া করে' গেল। রঙ্গনা যে দিকে গেল দিবসেরও পথ সেই দিকে। দিবস হয়তো অনুসরণ করত তার, কিন্তু বাধা পড়ে গেল।

"এই যে দিবু দা—"

"আরে বিনোদ যে, কি খবর?"

"আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ভালই হল। আমাদের স্টুডেণ্টস্ গ্যাদারিংয়ে আপনাকে কিছু বলতে হবে এবার। আপনারই বাড়ি যাচ্ছিলাম।"

"বলতে হবে? এত লোক থাকতে আমাকে কেন?"

"বাঃ আপনাকে বলব না তো কাকে বলব? গেল বছর আপনি যা চমৎকার বলেছিলেন। আপনাকে এবার সভাপতি করেছি আমরা।"

"আমাকে না জিগ্যেস করেই?"

"হ্যাঁ ছাপিয়েও ফেলেছি"—একমুখ হেসে বিনোদ ছাপানো

নিমন্ত্রণ পত্র বার করলে পকেট থেকে—"আমার উপরই ভার ছিল আপনার মত নিয়ে কার্ড ছাপতে দেবার কিন্তু আপনার বাড়ি গিয়ে দেখা পেলাম না, তাই কপাল ঠুকে ছাপতে দিয়েছিলাম। আপনাকে রাজি হতেই হবে দিবু দা, তা নাহলে ওই দীনেনবাবু খেয়ে ফেলবে আমাকে।"

"কি মুশকিল!"

"না, কোনও আপত্তি শুনব না দিবু দা।"

"কবে?"

"এই যে সব লেখা আছে এতে দেখুন না।"

দিবস কার্ডটা পড়ে দেখল।

"ইউনিভার্সিটি ইনস্‌টিট্যুটে?"

"হ্যাঁ। আপনি রাজি তো?"

"না হয়ে আর কি করি বল! তোমাকে বাঁচাবার জন্যেই রাজি হতে হবে।"

বিনোদের হাসি আকর্ণ-বিস্তৃত হয়ে উঠল।

"আমি জানতাম আপনি আমার কথা ঠেলতে পারবেন না, তাই ভরসা করে' ছাপিয়ে ফেললাম। আচ্ছা চলি এখন, অনেক কাজ বাকি এখনও।"

বিনোদ চলে গেল। দিবস যেদিকে যাবে ঠিক তার উলটো দিকে চলে গেল সে। দিবস দাঁড়িয়ে রইলো ক্ষণকাল। অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হল তার অতীত জীবনটা, যে জীবনের সঙ্গে তার বাবা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছেন, তাকে যেন ডাক দিয়ে গেল। পরমুহূর্তে সে ঘাড় তুলে চাইল রঞ্জনা যেদিকে গেছে সেই দিকে। অযৌক্তিকভাবে তার মনে হল ঐ মেয়েটি কি সভায় আসবে? কলেজের ছাত্রী হলে আসতে পারে। ধরণ দেখে কলেজের ছাত্রী বলেই মনে হয়······

নিতাই নন্দীর বাদ্যযন্ত্রের দোকানে ঢুকে রঙ্গনা বেশ ভদ্রভাবেই বললে, "আমাকে ভাল দেখে একটা সেতার দিন তো।"

"সেতার ? ও আচ্ছা।"

নিতাই ভিতরে ঢুকে গেলেন এবং যে সেতারটি বার করে' আনলেন তা পছন্দ হল না রঙ্গনার। এবারও বেশ ভদ্রভাবে বললে সে, "আর একটু বড় হলে ভাল হত। বড় নেই ?"

"আছে।"

আবার ঢুকে গেলেন তিনি ভিতরে। রঙ্গনা এদিক ওদিক চাইতে লাগল। হঠাৎ সামনের ক্যালেণ্ডারের একটি ছবির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হল তার। একটি অর্ধনগ্ন যুবতী ঈষৎ অশ্লীল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। পরমুহূর্তেই নিতাই নন্দী একটি বড় সেতার নিয়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। এইবার রঙ্গনার কণ্ঠে যে স্বর ফুটল তা ভদ্র নয় মোটেই। বেশ রুক্ষকণ্ঠেই সে বললে, "আপনারা কি চান না যে কোনও ভদ্রমহিলা আপনাদের দোকানে আসুক ?'

"নিশ্চয়ই চাই, এ কি কথা বলছেন !"

"ওই ছবি টাঙিয়ে রেখেছেন কেন তাহলে ?"

এর উত্তরে আমতা আমতা করা ছাড়া নিতাই নন্দীর অন্য উপায় ছিল না। কাচুমাচু ভঙ্গিতে হাত কচলে তিনি সুরু করলেন—"ওটা মানে, হয়েছে কি"—কিন্তু শেষ করতে পারলেন না।

রঙ্গনা থামিয়ে দিলে তাকে।

"খুলে নামিয়ে রেখে দিন। বাড়িতে গিয়ে টাঙাবেন যদি প্রবৃত্তি হয়।"

রঙ্গনার স্ফুরিতাধর ভেদ করে কথাগুলি এমন একটা তেজের সঙ্গে বেরুল যে প্রৌঢ় নিতাই নন্দী তা অমান্য করতে সাহস করলেন না।

"বেশ, বেশ তাতে আর কি !"

তাড়াতাড়ি ক্যালেণ্ডারখানা নামিয়ে গুটিয়ে টেবিলের একধারে রেখে দিলেন। রঙ্গনা হঠাৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' দেখতে লাগল দ্বিতীয় সেতারটা। তারপর মৃদু হেসে বলল, "এটাও পছন্দ হচ্ছে না।"

ঠিক এই সময় দিবসও ঢুকল এবং বলল, "আমাকে একটা সরোদ দেখান তো।"

"আসুন।"

তারপর রঙ্গনার দিকে ফিরে নিতাই নন্দী বললেন, "এটাও পছন্দ হচ্ছে না? আর একটা আনি তাহলে?"

আবার ভিতরের দিকে চলে গেলেন তিনি। রঙ্গনাকে এখানে দেখে দিবস শুধু যে বিস্মিত এবং পুলকিত হল তা নয় তার সমস্ত পৌরুষ যেন আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল নিজের মহিমা প্রমাণ করবার জন্য। যে মেয়েটি একটু আগে তাকে নিতান্ত হেয় প্রতিপন্ন করে' চলে' এসেছিল, তার কাছে নিজেকে প্রকাশিত করবার দুর্দম বাসনা উতলা করে তুলল তার সমস্ত সত্তাকে সহসা। চোখো-চোখি হতেই কিন্তু ছোট্ট একটা নমস্কার করা ছাড়া আর কিছু করতে পারলে না সে। রঙ্গনাও প্রতি নমস্কার করল মৃদু হেসে। নিতাই নন্দী আবার ঢুকলেন আর একটা সেতার নিয়ে। রঙ্গনা নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল সেটা।

"এর ঘাটগুলো পছন্দ হচ্ছে না, আর একটা দেখাবেন?"

"দেখাব বৈ কি!"

আবার ঢুকে গেলেন নিতাই নন্দী ঘরের ভিতর এবং আর একটা সেতার বার করে' নিয়ে এলেন।

......দিবস চুপ করে' দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মনে মনে সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তার এমন কি ঐশ্বর্য আছে যার প্রভাবে সে মুগ্ধ করে' দিতে পারে এই মেয়েটিকে? সন্ধান করতে গিয়ে হতাশ হয়ে পড়ছিল। যেখানে তার অনন্ত সম্পদ বিচিত্র অজস্রতায় ছড়িয়ে আছে সেই

কল্পলোকে একে নিয়ে যাওয়া যাবে না এখন। কোনও কালেই যাবে না বোধ হয়। একটু পরেই তো এ চলে যাবে, হারিয়ে যাবে ভিড়ের মধ্যে। জানতেও পারবে না ক্ষুদ্র পরমাণুর কি অসীম সম্ভাবনার স্বপ্ন তন্ময় করেছিল তাকে, সুযোগ পেলে পৃথিবীর ইতিহাসই বদলে দিতে পারত হয়তো সে—হঠাৎ সেই প্রফেসারের মুখটা মনে পড়ল আবার —তিনি চিঠিটা পেয়েছেন কি—আজ কত তারিখ—বহুকাল আগে সে যেন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে মনে হচ্ছিল···তারিখ মনে নেই···

এ সেতারটাও পছন্দ হল না রঙ্গনার।

"এর তুম্বাটা বড় ছোট। তুম্বাটা আর একটু বড় হলে—"

"আপনি দয়া করে' একটা কাজ করুন না তাহলে। ভিতরে অনেকগুলো সেতার টাঙানো আছে, নিজেই বেছে নিন যেটা পছন্দ হয়। আসুন, ওই ভিতরের দিকে টাঙানো আছে।"

"সেই ভাল।"

রঙ্গনা ভিতরের দিকে চলে গেল। নিতাই নন্দী তখন দিবসের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনাকে সরোদ দেব একটা?"

দিবস তখন চারদিকে চেয়ে দেখছিল এবং এই প্রশ্নের উত্তরে সে যা বললে তা সরোদ বিষয়ক নয়।

"আপনার এখানে ক্যালেণ্ডার দেখছি না? আজ কত তারিখ বলতে পারেন?"

"আজ তিরিশে। ক্যালেণ্ডার থাকবে না কেন, ছিল, ওই ভদ্রমহিলার ধমকে নামিয়ে রাখতে হল।"

এর পরেই ক্ষুণ্ণ অথচ অনুযোগপূর্ণ কণ্ঠে নিতাই নন্দী বললেন, "আচ্ছা, এই ছবিখানা কি দোষ করেছে বলুন তো, ভালো বিলিতি ছবি—"

ক্যালেণ্ডারের ছবিখানা খুলে দেখালেন তিনি দিবসকে কিন্তু

পরমুহূর্তেই রঙ্গনার পায়ের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি আবার গুটিয়ে রাখতে হল সেটা। খুব ভাল একটি সেতার হাতে করে' রঙ্গনা এসে ঢুকল।

"এইটে পছন্দ আমার, এইটে দিন। দাম কত এর ?"

"পঞ্চান্ন টাকা।"

"পঞ্চান্ন টাকা ;"

রঙ্গনার মুখ শুকিয়ে গেল, একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল সে। এত কাণ্ড করবার পর কোন মুখে দোকানীকে সে বলবে যে তার কাছে মাত্র চল্লিশটি টাকা আছে! গহনচাঁদ তাকে চল্লিশ টাকার বেশি দেন নি, সে-ও ভাবেনি যে চল্লিশ টাকার বেশি লাগতে পারে। কিন্তু সত্যি কথাটা বলতেই হবে, উপায় নেই।

"অত টাকা তো সঙ্গে নেই। গোটা পনের টাকা কম পড়ছে, আচ্ছা, আপনি ওটা আলাদা করে' রেখে দিন, আমি পরে এসে নিয়ে যাব।"

এইবার বাগ পেলেন নিতাই নন্দী। ঝালটা ঝাড়লেন। কিন্তু মধুর হেসে। পাকা দোকানদার তিনি।

"বেশ, আলাদা করেই রেখে দিচ্ছি, আপনি যা বলেন তাতেই রাজি আমি। তবে ওরকম সেতার মাত্র একটিই আছে, নগদ টাকা নিয়ে যদি কোনও খদ্দের আসে তাহলে, মানে, একটু—বুঝতেই পারছেন—"

নিজের দলের গোল হয়-হয় দেখে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ফুটবল খেলোয়াড় যেমন ছুটে আসে দিবসও অনেকটা তেমনি করে' ছুটে এল মনে মনে। শোভন-অশোভন জ্ঞান রইল না তার আর।

"যদি কিছু মনে না করেন টাকাটা আমি দিয়ে দিতে পারি। আমার কাছে টাকা রয়েছে। আপনি না হয় পরে দিয়ে দেবেন আমাকে।"

"আপনি দেবেন ? না থাক, আমিই পরে এসে নিয়ে যাব।"

"বিক্রি হয়ে যায় যদি। নিয়ে যান না, আমাকেই টাকাটা পরে দিয়ে দেবেন, ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি।"

"বেশ, দিন তবে।"

মুচকি হেসে রঙ্গনা কথাটা এমন ভাবে বললে যেন সে দিবসকে অনুগ্রহ করছে।

......দিবসের বাসার ঠিকানা এবং সেতারটা নিয়ে রঙ্গনা চলে গেল। দিবস নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার নূতন জীবনে যে নূতনতর পর্ব আকস্মিকভাবে আরম্ভ হয়ে গেল তারই অভিনবত্বটা আচ্ছন্ন করে' রাখল তার মনকে খানিকক্ষণ। এর পরিণতি কি হবে তা তখন যদিও সে ভাবতে পারে নি (কে-ই বা পারে) কিন্তু এই পরিচয়টা যে ক্ষণস্থায়ী সামান্য পরিচয় মাত্র নয়, এ যে অসামান্য কিছু একটা, এ যেন তার অন্তরাত্মা সভয়ে অনুভব করছিল। যে যোগাযোগ পরে উৎফুল্ল করবে গোবিন্দ সাণ্ডেলদের, বিভ্রান্ত করবে চুনীলালকে, হতভম্ব করবে গহনচাঁদকে তার প্রথম সূত্রপাত ভীত করে তুলেছিল দিবসকে। দুর্গপ্রাকারে শত্রু হানা দিয়েছে খবর পেলে সেনাপতির যেমন ভয় হয়, সংঘদ্বারে প্রথম নারীর আবির্ভাবে বুদ্ধ যেমন ভীত হয়েছিলেন সেই ধরনের একটা ভয় যেন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও জটিলতর ব্যাপারও ঘটছিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে মনে মনে যেমন সশস্ত্র হয়ে উঠছিল তেমনি জ্ঞাতসারে আবার উৎসুক হয়েও উঠেছিল। অধীর চিত্তে ভাবছিল কখন আবার দেখা হবে তার সঙ্গে। আজই সে দামটা দিতে আসবে কি ? কখন ?

"আপনাকে সরোদ দেখাই ?"

দিবসের ঘোরটা কেটে গেল।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ভাল জিনিস দেবেন।"

কিরণ নিজের ঘরে একা বসে কবিতা লিখছিল।

আমার হৃদয়ে মনে আস যাও ক্ষণে ক্ষণে
মুগ্ধ নয়ন-পথ দিয়া,
এই দেখা এই চাওয়া এই ক্ষণিকের পাওয়া
এই তব পরিচয় প্রিয়া,
এর বেশী আছে যাহা নাগাল পাব না তাহা
থাক দূরে থাক তা নিভৃতে
পেয়েছি যতটা আমি তাই মোরে দিবাযামী
ভরে' তোলে রঙে রসে গীতে।

এই পর্যন্ত লিখে থেমে গেল সে। কলমটা নামিয়ে রেখে বসে' রইল চুপ করে'। উর্মির কথাই ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ আগে এসেছিল সে। সত্যিই সে তার জন্যে প্রাইভেট টিউশন যোগাড় করেছে একটা। মিউজিক কনফারেন্সে তার জন্যে টিকিটও কিনেছিল। ভর্তি হয়েছে গহনচাঁদবাবুর স্কুলে। রঙ্গনাকে তার গানগুলো দিয়ে এসেছে। নূতন বাসার একটা সন্ধান পেয়েছে না কি! সেই বাসার সুবিধা-অসুবিধার নিখুঁত বর্ণনা করছিল এতক্ষণ ধরে'। এক মিনিট চুপ করে ছিল না। ঝরণার মতো কলকল করছিল সর্বক্ষণ। কেন আসে, কি চায় ও? চুপ করে' বসে রইল কিরণ। যা তার মনে হতে লাগল তাকে ভাষায় লিপিবদ্ধ করবার প্রবৃত্তি আর হল না। একটা অপূর্ব রস ধীরে ধীরে আবিষ্ট করে ফেলতে লাগল তার সমস্ত চিত্তকে। চুপ করে বসে রইল সে।

মেস। আপিস থেকে ফিরেছেন সবাই। ধূর্জটিবাবু আপিসে যান না, তিনি দিবানিদ্রা শেষ করে উঠেছেন একটু আগে। গোবর্ধন বাবুর সকালবেলায় কাগজ পড়বার অবসর হয় না। কাগজটা কেনেন হরিদাসবাবু, তিনিই পড়েন সকালে। তাঁর পড়া শেষ হতে না হতেই অঘোরবাবু ছোঁ মেরে নিয়ে নেন্ সেটা। ন'টার সময়ই আপিসে বেরুতে হয় গোবর্ধনবাবুকে। তাছাড়া অঘোরবাবুর মতো অমন করে' ছোঁ মেরে নিয়ে দায়-সারা-গোছ কাগজ পড়ায় তৃপ্তি হয় না গোবর্ধনবাবুর। তিনি প্রত্যেক খবরটি খুঁটিয়ে রসিয়ে রসিয়ে পড়তে চান। আপিস থেকে এসে হাত,মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে কাগজটি নিয়ে বসেন তিনি।

……হরিদাসবাবু দাড়ি কামাচ্ছিলেন। হরিদাসবাবু লোকটিও সাধারণ-পন্থী নন্। সকালবেলা দাড়ি কামান না। কারণ ঘুমোন অনেক রাত্রে, ওঠেন দেরিতে। উঠে চা খেয়ে খবরের কাগজ পড়ে' চিঠিপত্র লিখতে লিখতেই দশটা বেজে যায় তাঁর। এগারটার সময় আপিস। তাই বিকেলে দাড়ি কামান।

গোবর্ধন নিবিষ্টচিত্তে বসে' কাগজ পড়ছিলেন। ভুরু এবং কপাল বেশ কুঁচকে ছিল।

ভৃত্য-বেশী দিবস দু'জনের পাশে দু' পেয়ালা চা রেখে গেল।

গোবর্ধন হঠাৎ হরিদাসের দিকে চেয়ে বললেন, "উফ, এই লোকটাই ডোবাবে।"

হরিদাসবাবুর দাড়ি কামানো শেষ হয়েছিল। তিনি আয়নার সামনে নানারকম মুখভঙ্গি করে' নানাভাবে নিজের মুখশ্রী দেখছিলেন। অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন, "কে ?"

"কে আবার! আমাদের জহরলাল। যারা বেশি বাক্যবাগীশ

তারা কাজের লোক হয় না প্রায়ই। একেই তো দেশ ডুবে আছে তার উপর বক্তৃতার বান ডাকাচ্ছে ও।”

হরিদাস কোনও জবাব দিলেন না। তাঁর চোখ দুটি হাস্যদীপ্ত হয়ে উঠল শুধু। মুখটি মুছে চায়ের পেয়ালা তুলে চুমুক দিলেন একটা। দিবস আবার ঘরে ঢুকল এবং ঘর ঝাড়ু দিতে লাগল। দিবস যতক্ষণ এখানে থাকে একটি কথা বলে না। নীরবে কাজগুলি শেষ করে' চলে যায়।

“দেশে অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, সে সব চুলোয় গেল, ইণ্ডোনেশিয়ার জন্যে মাথা ঘামিয়ে মরছেন উনি।”

হরিদাস তবু কোন কথা বললেন না, নীরবে চা খেয়ে যেতে লাগলেন। গোবর্ধন কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন্। তিনি হরিদাসবাবুর চোখের দৃষ্টি থেকেই তাঁর সম্ভাব্য জবাবটা অনুমান করে' নিয়ে বললেন—

“তুমি বলছ কি করবে তাহলে? ওই ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারগুলোকে টপাটপ ধরুক আর লটকে দিক। এইটেই তো হল প্রথম কাজ।”

হরিদাস তবু কিছু বললেন না। হাসলেন একটু।

“আমার মতে ঘরটি সামলানো দরকার আগে। ঘরটি সামলে সুমলে তারপর যত খুঁশি ফপরদালালি কর না তুমি, কে বারণ করছে। কি বল?”

এর উত্তরে হরিদাস যে প্রশ্নটি করলেন তা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক মনে হল গোবর্ধনবাবুর।

“কিছ যদি মনে না করেন গোবর্ধনবাবু, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। আপনি কোন্ বছর ম্যাট্রিক পাশ করেছেন বলুন তো?”

“ম্যাট্রিক? ম্যাট্রিক তো পাশ করি নি। কেন?”

“না এমনি। আচ্ছা, রাজনীতি চর্চা করছেন কতদিন থেকে?”

"রাজনীতি? সে আর করবার সময় পেলুম কোথায় ভাই? গোঁফ উঠতে না উঠতেই তো বাবা আপিসে ঢুকিয়ে দিলেন।"

"ও।"

হরিদাসবাবু গম্ভীরভাবে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগলেন। দিবস নীরবে ঝাড়ু দিয়ে যেতে লাগল। তার মুখের পেশী বিচলিত হল না একটু। সে এদের সব কথা মন দিয়ে শুনছিলও না। সে দোকান থেকে সরোদটা কিনে সেটা সৌদামিনীর হাতে দিয়ে চলে এসেছে। কিরণকে সরোদটা দেখানো হয় নি এখনও। এই সব কথাই মনে হচ্ছিল তার। রঙ্গনার কথাও। দামটা দিতে আজই সে আসবে না কি? তার ইচ্ছে হচ্ছিল সৌদামিনীকে বলে আসতে যে একটি মেয়ে হয়তো আসতে পারে······কিন্তু লজ্জা করল····লজ্জাই বা করল কেন, ভাবছিল সে······।

"হঠাৎ এসব কথা জিগ্যেস করবার মানে?"—গোবর্ধন প্রশ্ন করলেন ভুরু কুঁচকে।

হাসি চিকমিক করে' উঠল হরিদাসবাবুর চোখে।

"আপনি যে একটা জিনিয়াস এ সন্দেহ আমার গোড়াগুড়িই ছিল, এখন অকাট্য প্রমাণ পেলাম। জহরলাল, বেভিন, স্ট্যালিন, মলটভ, ট্রুম্যান, টিটো, ম্যাকার্থার প্রতিদিন সকলকে এমনভাবে তুলো-ধোনা করা সহজ কথা নয়।"

গোবর্ধন বুঝলেন ছোকরা ইয়ার্কি করছে।

"খুব ইয়ার হয়েছ, নয়"—এই বলে' তিনি গিরিবালা মার্ডার কেসে মনঃসংযোগ করতে যাচ্ছিলেন এমন সময় অঘোর এসে ঘরে ঢুকলেন।

"দিবু আমার সিগারেট এনেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে।"

ফতুয়ার পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করে' দিলে সে অঘোরকে।

"আজও ছ' আনা ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"উঃ, আর বাঁচতে দেবে না !"

তারপর হরিদাসের দিকে চেয়ে বললেন, "যদিও রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন 'বোলো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে।"

"ভুল কোটেশন কর কেন !"—কাগজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে গোবর্ধন বললেন অপ্রত্যাশিত ভাবে—"রবীন্দ্রনাথ নয়, নবীন সেন"—তারপর হরিদাসের দিকে তিনিও চাইলেন, "নবীন সেন নয় ?"

"আমার তো মনে হচ্ছে সেক্স্পীয়র"—হাস্যদীপ্ত চক্ষে গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন হরিদাস।

"দেখ ইয়ার্কির একটা সীমা আছে। খুব বেশি ফাজিল হওয়াটা ভাল নয়"। উপদেশ দিয়ে আবার কাগজে মন দিলেন গোবর্ধন।

অঘোরবাবু কিন্তু কবিতা নিয়ে মাথা ঘামালেন না আর। হরিদাস-বাবু লেখাপড়া করেন, তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যেই দু'লাইন কবিতা আউড়েছিলেন তিনি। মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে দেখে একেবারে কাজের কথা পাড়লেন।

"তোমার সেই ইনসিওরেন্সের টাকাটার কি করলে হে ?"

"ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছি।"

"এই সময়ে টাকাটা যদি শ্রেন্সে ইন্ভেস্ট্ করতে পারতে বেশ কিছু হ'ত! রোজ কেন রোজ বেচে দাও—বেশি কিছু করতে হবে না—ক্লিয়ার টেন পারসেণ্ট।"

"আমি তো গোড়াতেই বলেছি—আমি বড়লোক হ'তে চাই না।"

"অতগুলো টাকা ফেলে রাখবে ?"

হরিদাস এ কথার উত্তর দিলেন না। অঘোর একটা সিগারেট ধরিয়ে তর্ক করবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। দিবস ঘর ঝাড়ু দেওয়া শেষ করে' চলে গেল পাশের ঘরে। অন্য কথা পাড়লেন গোবর্ধন। হরিদাসের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি টুরে বেরুচ্ছ কবে ?"

"দেরি আছে এখনও।"

"কোন্ দিকে যাবে ?"

"কাটোয়া।"

"ডাঁটা পাও তো এনো।"

সহসা পাশের ঘরে যুগপৎ হারমোনিয়ম ও বেহালা বেজে উঠল। ভাঙা গলায় ধূর্জটি গান ধরলেন—"এইসো এইসো প্রিয়তমো হে-এ"

"এই লোকটাই তাড়াবে আমাকে এখান থেকে, বুঝলে অঘোর ?" অত্যন্ত বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন গোবর্ধন।

"যাই বলুন, ভদ্রলোক সিনসিয়ার কিন্তু"—হরিদাস ফোড়ন দিলেন হাস্যদীপ্ত দৃষ্টি তুলে—"সঙ্গীতের প্রতি যাকে বলে অনুরাগ, তা আছে ভদ্রলোকের।"

অঘোর বললেন, "তা আছে বই কি। সেতার এস্রাজ ম্যাণ্ডোলিন গীটার দমাদ্দম কিনেই চলেছে—সিনসিয়ার বটে।"

"সিনসিয়ার ফিনসিয়ার নয়, উন্মাদ। হরিদাস, বুঝিয়ে সুজিয়ে ওকে কোনও ওস্তাদের আখড়ায় ভরতি করে দাও না তুমি। সেই-খানে গিয়ে যত খুশি চিৎকার করুক। এখানে কানের পাশে এভাবে চেঁচালে তো টেকা যাবে না—আর ও চেঁচাবেই—যে রকম দেখছি—"

অঘোর বলে উঠলেন, "কাল যে রাস্তায় একটা হাণ্ডবিল পেলুম কোন এক গঁহনচাঁদ বন্দোপাধ্যায় কাশী থেকে এসে এখানে এক

সঙ্গীত ভবন খুলেছেন, আনাড়িকেও সঙ্গীতজ্ঞ করে তুলছেন, সেইখানে ভিড়িয়ে দিলে কেমন হয়? কোথায় রাখলাম হাণ্ডবিলটা—"

জামার পকেট থেকে হাণ্ডবিলটা খুঁজে বার করলেন তিনি।

"এই যে—"

হরিদাসকে দিলেন কাগজখানা।

"যা হোক একটা ব্যবস্থা কর ভাই"—মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে গোবর্ধন হরিদাসকে বললেন, "এখান থেকে যাবই বা কোথা? চট্ করে' বাড়ি তো পাওয়া যাবে না। কিন্তু এ যে সাপের ছুঁচো-গেলা হয়েছে আমাদের।"

বাড়িটা ধূর্জটিবাবুরই। মফঃস্বলের জমিদার তিনি। সম্প্রতি পত্নীবিয়োগ হওয়াতে কোলকাতায় এসে সঙ্গীত নিয়ে নিজেকে ভুলে থাকবার চেষ্টা করছেন। সমস্ত বাড়িতে তিনি একাই ছিলেন এতদিন। হরিদাসবাবুর সঙ্গে ধূর্জটির বন্ধুত্ব ছিল। তাঁরই অনুরোধে তিনি পাশের ঘর দু'খানা এঁদের মেস করবার জন্যে দিয়েছেন। নিজেও এঁদের মেসেই খাওয়া দাওয়া করছেন আজকাল। সুতরাং ধূর্জটিকে এ বাড়ি থেকে তাড়ানো অসম্ভব।

চুনীলালের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপনটা পড়ে হরিদাসবাবু বললেন, "তা চেষ্টা করা যেতে পারে।"

"দোহাই তোমার, কিছু একটা কর ভাই"—গোবর্ধন বললেন।

"এত বাড়াবাড়ি করত না, কিন্তু ওকে ওসকাচ্ছে ওই উমেশ" একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললেন অঘোর।

"উমেশ ওসকাবে না কেন, তার দোকানের জিনিস বিক্রি হচ্ছে যে।"

পাশের ঘরে বেহালা হাতে করে' ধূর্জটি বসেছিলেন। তাঁর সমস্ত চেষ্টা যে ব্যর্থ হচ্ছে, গান বাজনা, কিছুই যে জমছে না তা নিজেই অনুভব

করছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি জমিদার মানুষ। তাঁর শুধু যে অজস্র টাকা আছে তা নয় বদ্ধমূল ধারণাও আছে যে টাকার জোরে সব হয়। তাঁর বন্ধু উমেশ দত্ত (বাদ্যযন্ত্রের দোকান খুলেছেন যিনি সম্প্রতি ধূর্জটির কাছ থেকে ক্যাপিটাল নিয়ে) তাঁর মনে আর একটা ধারণাও পাকা করে দিয়েছেন। তাঁর গলায় নাকি দানা আছে! দিনকতক সাধনা করলেই তাঁর গলা আরও নাকি দানাদার হয়ে উঠবে এবং তখন রসিক সমাজ তার রসাস্বাদন করে মুগ্ধ হয়ে যাবেন।

দিবস ঘরে ঢুকতেই ঝাপসা কণ্ঠে ধূর্জটি বললেন, "দিবু দেখতো ঠাকুরকে গরম জল করতে বলেছি সেটা হল কি না। গলাটায় একটু সেক দেওয়ার দরকার।"

"দেখি"—দিবস চলে যেতে উদ্যত হল।

"আর শোন, উমেশবাবু বলছেন ঘিয়ের সঙ্গে গোলমরিচ ফুটিয়ে খেতে। ঘি আনতে পারবে একটু চট্ করে?"

"পারব।"

চট্ করে নিয়ে এস তো বাবা। পয়সা নিয়ে যাও। গোলমরিচও এনে দিও। ঠাকুরকে বল ঘি-গোলমরিচটা আগেই ফুটিয়ে দেয় যেন।"

"আচ্ছা।"

দিবস চলে যাচ্ছিল এমন সময়ে উমেশ বললেন, "একটু আদা দিলে আরও ভাল হয়।"

"দিবু, একটু আদাও এন তাহলে। একটাকায় কুলুবে কি? এই পাঁচ টাকার নোটটাই নিয়ে যাও না হয়। ভাল ঘি এন, দালদা মেশানো যেন না হয়, দেখে নিও একটু।"

দিবস পাঁচ টাকার নোট নিয়ে চলে গেল। যন্ত্রবৎ কাজ করে যাচ্ছিল সে। তার মনিবদের কথাবার্তা, আচরণ প্রথমটা ঈষৎ অদ্ভুত

মনে হচ্ছিল তার, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছিল এরাই স্বাভাবিক আমিই অদ্ভুত। তারপর থেকে কাজের দিকেই সমস্ত মন লাগিয়ে রেখেছে সে। এদের দিকে মনোযোগ দেওয়া শুধু যে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে তা নয়, বিপজ্জনকও মনে হয়েছে। হঠাৎ যদি এদের কোনও কথার বা আচরণের প্রতিবাদ করে' ফেলে সে, তাহলে হয়তো চাকরিটি যাবে। চাকরি যোগাড় করা যে কি কঠিন ব্যাপার একদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তা সে বুঝেছে। তাই তার কেবলই মনে হচ্ছে এই অকূল সমুদ্রে যে ভেলাটা সে পেয়েছে সেটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকাই উচিত। চোখ বুজে তাই সে সেটাকে আঁকড়ে ভেসে চলেছিল। দিবসের আচরণ হরিদাসবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কিন্তু। যদিও মুখে তিনি কিছু বলেননি কিন্তু মনে মনে তিনি এই নব নিযুক্ত মৌন কর্তব্যনিষ্ঠ চাকরটির আচরণে বিস্ময়বোধ করছিলেন।

……দিবস চলে যাবার পর ধূর্জটি নীরবে বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ একটা প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। উমেশের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "বেহালাটার সুর ঠিক বেরুচ্ছে না তো!"

"কাঠটা ভাল নয় বোধ হয়। আজ দোকানে নিয়ে যাবেন বদলে দেব।"

ধূর্জটি জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলেন। দূরে তেতলা বাড়ির চিলে-কোঠাটা পার হয়ে তাঁর দৃষ্টি ঠেকল গিয়ে আকাশে। সমস্ত গুলিয়ে গেল যেন, কি রকম যেন মনে হ'তে লাগল।

যে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাটা আশা-আশংকায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে বাসার দিকে, পথে চলতে চলতে দিবস হঠাৎ ঠিক করে'

ফেললে কিছুতেই তাকে আমোল দেবে না। দেওয়া উচিত নয়। সেই মেয়েটি টাকা ফেরত দিতে এসেছে কিনা এই খবরটাকে এখন প্রাধান্য দেওয়া মানেই নিজেকে নিজের কাছে অবনত করা, হঠাৎ মনে হল তার। সে ঘুরে কিরণের বাসার দিকে অগ্রসর হল। কিছুদূর গিয়ে নজরে পড়ল একটা সিনেমার সামনে প্রচুর ভিড়। সেকেণ্ড শো সুরু হচ্ছে বোধ হয়। একবার লোভ হ'ল টিকিট কিনে ঢুকে পড়লে হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হ'ল কোনও চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। হয়তো বাবার সঙ্গেই। অবসর পেলেই সূর্য চৌধুরি সেকেণ্ড শোয়ে সিনেমা দেখতে আসেন। ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইল দিবস খানিকক্ষণ। না, তাদের মোটরটা দেখা যাচ্ছে না তো। একটু এগিয়ে আবার ভাল করে দেখল। না, নেই। তবু সে পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল। না, সিনেমায় যাবে না সে। এখন যার মাসিক আয় মাত্র কুড়ি টাকা আপাতত সিনেমা দেখার লোভ সম্বরণ করতে হবে তাকে।

······কিরণের বাড়ির সামনে গিয়ে দেখতে পেলে কপাট যদিও বন্ধ কিন্তু কিরণ বাড়িতে আছে। খোলা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। নিবিষ্টচিত্তে কি যেন লিখছে। কবিতা নিশ্চয়, দিবস ভাবলে। কবিতাই লিখছিল কিরণ। সকালে যে কবিতাটা আরম্ভ করেছিল সেইটেই নূতন ছন্দে লিখছিল আবার।

দিবস ডাকতেই উঠে কপাট খুলে দিলে সে।

"কবিতা লিখছিস নাকি?"

"হ্যাঁ।"

খাতাটা মুড়ে একপাশে সরিয়ে রেখে দিলে।

"কি লিখলি, পড় না শুনি।"

"শুনবি?"

দিবস পাশের বিছানায় বসল। কিরণ পড়তে লাগল—

দূর হতে শুনি তব বাঁশী, দূর হ'তে দেখি তব শোভা,
অয়ি মনোলোভা,
সুদূর আকাশে তুমি মেঘে মেঘে বিচিত্র-বরণী
আমি নিম্নে স্বপ্নাতুর দরিদ্র ধরণী
দিবা যামী শুধু চেয়ে থাকি
তোমার মদিরবর্ণে পূর্ণ করি আঁখি।
তারপর ধীরে ধীরে
বর্ণ-জলধির তীরে
নামে অন্ধকার,
নামে শঙ্কা, জাগে ক্ষোভ মূঢ় ব্যর্থতার,
আকাশের লক্ষ তারা করে যেন লক্ষ উপহাস
রুদ্ধ হয়ে আসে যেন শ্বাস
আঁধার প্রান্তরে তুমি সহসা আবার শিখা জ্বালো
হে আলেয়া আলো।

কবিতাটা শুনতে শুনতে দিবসের মনে রঙ্গনার ছবিটা মূর্ত হয়ে উঠল। এই ছবিটাই যেন ভাব জোগাল তার মন্তব্যের।

"কবিতাটা চমৎকার হয়েছে, কিন্তু অন্ধকারের কাছে আমি হার মানতে রাজি নই। শঙ্কা, ক্ষোভ, ব্যর্থতার উর্ধে উঠতে হবে আমাদের। দূর থেকে বাঁশী শুনে কেবল মুগ্ধ হয়ে থাকলেই চলবে না, বাঁশীটা দখল করে সেটা বাজাতে হবে নিজে।"

"বাজাবার চেষ্টা করতে হবে বল, সত্যি সত্যি বাজান যাবে কিনা কে জানে!"

"কিন্তু তোর কবিতার সুর শুনে মনে হচ্ছে তুই যেন ধরে' নিয়েছিস তোর আকাঙ্ক্ষা কখনই পূর্ণ হবে না।"

"হয় কি কখনও?"

কিরণের ঠোঁটে ছোট্ট একটু হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল।

"হয় বই কি"—দিবসের খেয়ালই রইল না যে যে-কথাগুলো সে বলতে যাচ্ছে সেগুলোর সঙ্গে তার কিছুদিন আগেকার একটা উক্তির মিল নেই এবং আগেকার সেই উক্তিটা কিরণের মনে থাকা সম্ভব—"খুব হয়, হরদম হচ্ছে। আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবেই এ বিশ্বাস নিয়ে যদি আমরা না অগ্রসর হই তাহলে কাজে উৎসাহ পাব কেন?"

কিরণের চোখে এক ঝলক আলো চকমক করে' উঠল।

"কিছুদিন আগে তুই যে 'মা ফলেষু'র বক্তৃতাটা করছিলি আজকের বক্তৃতাটার সঙ্গে সেটাকে খাপ খাওয়াচ্ছিস কি করে' তাহলে?"

রাস্তার মোড় ঘুরেই অপ্রত্যাশিতভাবে রাস্তা বন্ধ দেখলে 'রোড ক্লোজ্‌ড্‌' লেখাগুলোর দিকে মোটর ড্রাইভার যেমনভাবে চেয়ে 'গিয়ার' বদলে গাড়ি ব্যাক্ করতে থাকে দিবসও অনেকটা তেমনি করলে।

"খাপ খাওয়াবার চেষ্টা আমি করছি না। 'মা ফলেষু'র মানে এ নয় যে ফল সম্বন্ধে তুমি উদাসীন থাকবে। ওর মানে ফল যা হবে তা তোমার আয়ত্তের বাইরে, কাজ করাটাই তোমার আয়ত্তাধীন, তাই কর্তব্যেই তোমার অধিকার। কিন্তু প্রত্যেক কাজেরই একটা উদ্দেশ্য থাকবে নিশ্চয় এবং সে উদ্দেশ্য সফল করতেই হবে, তা সফল হবেই, এরকম একটা বিশ্বাস থাকলেই যে গীতাকে অমান্য করা হবে তা আমি মনে করি না। তবে একটা কথা, চেষ্টা সত্ত্বেও উদ্দেশ্য যদি বিফল হয় তাহলে মুষড়ে পড়া উচিত নয়, তাতে লজ্জারও কিছু নেই—"

কিরণ হাসিমুখে দিবসের দিকে চেয়ে রইল, কিছু বললে না। তার মুখভাব দেখে মনে হল দিবসের আবোলতাবোলের প্রতিবাদ করে' সময় নষ্ট করতে সে রাজি নয়। বাঁশী বাজাবার লোভ তারও যথেষ্ট আছে, মনে মনে বাঁশীটার দিকে হাতও বাড়াচ্ছে সে বারবার, আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে সেটাকে ধরতে পারলে সে বাজাবেও, কিন্তু সেটা পারা যাবে কি না সেইটেই সমস্যা এবং সেই সমস্যার সংশয়ই তো কবিতার উৎস। কবিতার উৎস? তাই বা কে বলতে পারে? কবিতা দেখে কি তার উৎসের খবর জানা সম্ভব? ফুল দেখে কি বোঝা যায় যে তার উৎস মাটির অন্ধকারে? আকাশে নয়, তাই বা কে বললে······যে মন আমাদের মুখভাব পরিবর্তন করে কিরণের সেই মন নানা জটিল চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে পড়াতে তার মুখের হাসিটা মুখোশের হাসির মতো দেখাতে লাগল।

"কি ভাবছিস তুই?"

"কিছু না, তোর চাকরি কেমন লাগছে?"

"খারাপ নয়। কেরানীগিরির চেয়ে ভাল, মাইনে কম যদিও—"

"রেস্‌পেক্‌টেব্‌লও নয়" কিরণ বললে মুচকি হেসে।

"ওই ঝুটো রেস্‌পেক্‌টেবেলিটিই তো দফা নিকেশ করেছে আমাদের। ওরই মোহে পড়ে সমর্থ ছেলেরা রোজকার করছে না, মেয়েরা খুঁজে বেড়াচ্ছে রাজপুত্র, ফলে কারও বিয়ে হচ্ছে না, সমাজ উচ্ছন্ন যাচ্ছে।"

"মোহই বল আর যা-ই বল উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা মানুষের মজ্জাগত প্রবৃত্তি এবং সম্ভবত উন্নতিরও সোপান—"

"আহা উচ্চাকাঙ্ক্ষা খারাপ কে বলছে! কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা করলেই তো শুধু হবে না, তার যোগ্য হতে হবে। সেই যোগ্যতার প্রথম ধাপ আত্মসম্মান। আত্মসম্মানহীন রেস্‌পেক্‌টেবেলিটির নামই ঝুটো রেস্‌পেক্‌-টেবেলিটি, যা রক্ষা করবার জন্যে ধোপা, নাপিত, দর্জির সাহায্য নিতে

হয়, ধার করে’ গাড়ি বাড়ি করতে হয়, মুখস্থ করে’ বুলি আওড়াতে হয়—”

কিরণ হেসে ফেললে দিবসের উত্তেজনা দেখে। নিতান্ত ছেলে-মানুষ—মনে হল তার।

“চল তোর বাসাটা দেখে আসি। তর্ক থাক এখন।”

“জানিস আমি সরোদ কিনেছি”—আবার উৎসাহিত হয়ে উঠল দিবস—“এইবার চল একদিন গহনচাঁদবাবুর কাছে যাওয়া যাক।”

“তুই না এলে এখন সেখানেই আমি যেতাম। ঊর্মি ঠিকানাটা দিয়ে গেছে আমাকে।”

“ও, বেশ তো, সেখানেই চল না তাহলে। ভরতি হয়ে আসা যাক।”

“বেশ। চা খাবি ? স্টোভে তেল আছে, পারমিট পেয়েছি।”

“বেশ তো !”

কিরণ স্টোভ জ্বালতে বসল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটছিল আর একটি ঘটনা দিবসের কারফরমা লেনের বাসায়। বাসার বারান্দায় একটা ভিজে কাপড় শুখোচ্ছিল। সৌদামিনী এবং গিরিবালা এসে ঢুকল।

“এখনও তো আসে নি দেখছি”—লণ্ঠন তুলে সৌদামিনী বললে।

“মেস থেকে ঠিক আটটার সময়ে বেরিয়েছে কিন্তু। এলে মনে করে’ বোলো কথাটা। উকিলের ছেলে, কোনও একটা হদিস বাতলাতে পারে হয়তো। মুখপোড়ার চোখ রাঙানি আর সহ্য হয় না।”

“বলব। কাপড় কাচার ছিরি দেখ।”

দিবস নিজের কাপড়টা নিজেই কেচে শুখোতে দিয়ে গিয়েছিল।

কিরণ হাসিমুখে দিবসের দিকে চেয়ে রইল, কিছু বললে না। তার মুখভাব দেখে মনে হল দিবসের আবোলতাবোলের প্রতিবাদ করে' সময় নষ্ট করতে সে রাজি নয়। বাঁশী বাজাবার লোভ তারও যথেষ্ট আছে, মনে মনে বাঁশীটার দিকে হাতও বাড়াচ্ছে সে বারবার, আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে সেটাকে ধরতে পারলে সে বাজাবেও, কিন্তু সেটা পারা যাবে কি না সেইটেই সমস্যা এবং সেই সমস্যার সংশয়ই তো কবিতার উৎস। কবিতার উৎস? তাই বা কে বলতে পারে? কবিতা দেখে কি তার উৎসের খবর জানা সম্ভব? ফুল দেখে কি বোঝা যায় যে তার উৎস মাটির অন্ধকারে? আকশে নয়, তাই বা কে বললে……যে মন আমাদের মুখভাব পরিবর্তন করে কিরণের সেই মন নানা জটিল চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে পড়াতে তার মুখের হাসিটা মুখোশের হাসির মতো দেখাতে লাগল।

"কি ভাবছিস তুই?"

"কিছু না, তোর চাকরি কেমন লাগছে?"

"খারাপ নয়। কেরানীগিরির চেয়ে ভাল, মাইনে কম যদিও—"

"রেস্‌পেক্‌টেব্‌লও নয়" কিরণ বললে মুচকি হেসে।

"ওই ঝুটো রেস্‌পেক্‌টেবেলিটিই তো দফা নিকেশ করেছে আমাদের। ওরই মোহে পড়ে সমর্থ ছেলেরা রোজকার করছে না, মেয়েরা খুঁজে বেড়াচ্ছে রাজপুত্র, ফলে কারও বিয়ে হচ্ছে না, সমাজ উচ্ছন্ন যাচ্ছে।"

"মোহই বল আর যা-ই বল উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা মানুষের মজ্জাগত প্রবৃত্তি এবং সম্ভবত উন্নতিরও সোপান—"

"আহা উচ্চাকাঙ্ক্ষা খারাপ কে বলছে! কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা করলেই তো শুধু হবে না, তার যোগ্য হতে হবে। সেই যোগ্যতার প্রথম ধাপ আত্মসম্মান। আত্মসম্মানহীন রেস্‌পেক্‌টেবেলিটির নামই ঝুটো রেস্‌পেক্‌-টেবেলিটি, যা রক্ষা করবার জন্যে ধোপা, নাপিত, দর্জির সাহায্য নিতে

হয়, ধার করে' গাড়ি বাড়ি করতে হয়, মুখস্থ করে' বুলি আওড়াতে হয়—"

কিরণ হেসে ফেললে দিবসের উত্তেজনা দেখে। নিতান্ত ছেলে-মানুষ—মনে হল তার।

"চল তোর বাসাটা দেখে আসি। তর্ক থাক এখন।"

"জানিস আমি সরোদ কিনেছি"—আবার উৎসাহিত হয়ে উঠন দিবস—"এইবার চল একদিন গহনচাঁদবাবুর কাছে যাওয়া যাক।"

"তুই না এলে এখন সেখানেই আমি যেতাম। ঊর্মি ঠিকানাটা দিয়ে গেছে আমাকে।"

"ও, বেশ তো, সেখানেই চল না তাহলে। ভরতি হয়ে আসা যাক।"

"বেশ। চা খাবি ? স্টোভে তেল আছে, পারমিট পেয়েছি।"

"বেশ তো !"

কিরণ স্টোভ জ্বালতে বসল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটছিল আর একটি ঘটনা দিবসের কারফরমা লেনের বাসায়। বাসার বারান্দায় একটা ভিজে কাপড় শুখোচ্ছিল। সৌদামিনী এবং গিরিবালা এসে ঢুকল।

"এখনও তো আসে নি দেখছি"—লণ্ঠন তুলে সৌদামিনী বললে।

"মেস থেকে ঠিক আটটার সময়ে বেরিয়েছে কিন্তু। এলে মনে করে' বোলো কথাটা। উকিলের ছেলে, কোনও একটা হদিস বাতলাতে পারে হয়তো। মুখপোড়ার চোখ রাঙানি আর সহ্য হয় না।"

"বলব। কাপড় কাচার ছিরি দেখ।"

দিবস নিজের কাপড়টা নিজেই কেচে শুখোতে দিয়ে গিয়েছিল।

কাপড়ের একজায়গায় দাগ লেগেছিল খানিকটা। সেইটে দেখিয়ে সৌদামিনী মন্তব্য করলে।

"পরশু দিন চা নিয়ে যেতে যেতে চা চলকে পড়েছিল যে খানিকটা।" মুচকি হেসে গিরিবালা বললে।

"বড়লোকের ছেলে ওসব কাজ পারবে কেন?"

"কাজ খুব চমৎকার করছে। মুখ বুজে করে' যায়, বাবুরা খুব খুশি।"

"তোর কাছে সাবান আছে?"

"আছে।"

"দে দিকিন। থুবে কেচে দি ভাল করে।"

কাপড়টা নিয়ে সৌদামিনী কলতলায় গেল। সাবানও দিয়ে গেল গিরিবালা। রাস্তার আলো এসে পড়েছে কলতলায়। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে হাঁসের জাল-দেওয়া খাঁচাটা। জালের ভিতর দিয়ে হাঁসটাকেও দেখা যাচ্ছে। কাপড় কাচতে কাচতে হাঁসটার দিকে নজর পড়ল সৌদামিনীর, পড়তেই একটা কথা মনে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

"ওই যাঃ ধানের কথাটা বলতে আবার ভুলে গেলাম আজ। নিজেই গিয়ে আনতে হবে কাল দেখছি।"

অন্ধকার গলিটার মুখে একটা টর্চের আলো জ্বলে উঠল দপ করে'। 'সেই মুখপোড়া আসছে না কি আবার! জ্বালাতন করে' তুললে তো'—সৌদামিনীর স্বগতোক্তি বাধা পেল কিন্তু পরমুহূর্তেই। টর্চ জ্বালতে জ্বালতে এগিয়ে এল রঙ্গনা।

"আচ্ছা, দিবসবাবু বলে' কেউ কি থাকেন এখানে?"

সৌদামিনী এগিয়ে এসে নিরীক্ষণ করতে লাগল রঙ্গনাকে। বিস্মিত হল তার বেশবাস দেখে।

"দিবসবাবুর কি এইটেই বাসা ?"

"হ্যাঁ। তিনি এখনও ফেরেন নি।"

"ও আচ্ছা, তিনি এলে বলে দেবেন তাঁর সেই টাকাটা আমি দিতে এসেছিলাম। একটু কাগজ দিতে পারেন, একটা চিঠি লিখে রেখে যেতাম তাহলে।"

দিবসের ব্যবহারে রঙ্গনা কম বিস্মিত হয় নি। তার বাসা দেখে সে আরও বিস্মিত হয়ে গেল। এখানে লেখবার মতো কাগজ পাওয়া যাবে কিনা এ সন্দেহও তার হল।

"ওর ঘরে যান—ওই যে ওইটে ওর ঘর, কপাট খোলাই আছে, ওইখানে টেবিলের উপর সব আছে। লণ্ঠনটাও আছে দোর গোড়ায়।"

এইবরে রঙ্গনা হঠাৎ হাঁসটা দেখতে পেলে।

"বাঃ, বেশ চমৎকার হাঁসটি তো! দিবসবাবুর ?"

সৌদামিনী মাথা নাড়লে হাসিমুখে। তারপর কাপড়টা কাচতে লাগল আবার। রঙ্গনা একটু ঝুঁকে টর্চ ফেলে ফেলে দেখতে লাগল হাঁসটাকে। সৌদামিনী ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে আবার, একটা কৌতুকোজ্জ্বল হাসি জল জ্বল করে' উঠল তার চোখের দৃষ্টিতে। অনুপস্থিত দিবসকে কেন্দ্র করে' দুটি অপরিচিত নারী-হৃদয় নিজেদের অজ্ঞাতসারেই যে কাব্য রচনা করছিল সে কাব্যের রূপও মূর্ত হয়ে উঠেছিল তখনকার ওই আলো-আঁধারিতে, খাঁচায় বন্দী একক হংসের তন্দ্রাতুর দৃষ্টির সহসা-চকিত বিস্ময়ে। প্রদীপ্ত টর্চটার দিকে হাঁসটা যে-ভাবে চেয়েছিল অনুপস্থিত দিবসের দিকে রঙ্গনাও মনে মনে চেয়েছিল অনেকটা সেই-ভাবে। দু'জনেই দেখছিল অপ্রত্যাশিত কিছু একটা। রঙ্গনা সোজা হয়ে দাঁড়াল অবশেষে।

"ওই ঘরটা ?"

সৌদামিনী পুনরায় মাথা নাড়তেই এগিয়ে গেল সেই দিকে

কমানো লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে ঢুকল ঘরের ভিতর। লণ্ঠন তুলে ঘুরে ঘুরে দেখলে ঘরখানা। টেবিল, চেয়ার, বিছানা, বইয়ের শেল্ফ,—ভদ্রলোক স্টুডেণ্ট বোধ হয়, মনে হল রঙ্গনার। অবস্থা খারাপ তাই এখানে এসে আছে। হঠাৎ খুব আনন্দ হল তার, একটা দমকা হাওয়া যেন অজস্র ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে গেল তার মনের ভিতর। দিবস চৌধুরি গরীব এই ধারণাটাকে ঘিরে তার মন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে গেল সহসা। এগিয়ে গেল সে টেবিলের দিকে। টেবিলে এটা কি? কার ফটো? সূর্য চৌধুরির ফটোর দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর চিঠি লেখার প্যাডখানা দেখতে পেলে। প্যাডটা টেনে নিয়ে লিখতে লাগল। ফাউণ্টেন পেন তার সঙ্গেই ছিল।

দিবসবাবু,

আপনার টাকাটা দিতে এসেছিলাম। কিন্তু আপনার দেখা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছি। আবার আসব কাল, বিকেল পাঁচটার পর, ছ'টার মধ্যেই। আশা করি বাড়িতে থাকবেন। তখন টাকা দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়িতে আপনাকে বোধ হয় ধন্যবাদ দিতেই ভুলে গিয়েছিলাম। খেয়ালই হয় নি। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। নমস্কার। ইতি—

রঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌদামিনী এসে ঢুকল।

"কিছু বলবার থাকে তো আমাকে বলে যেতে পারেন, এলে আমি বলে দেব।"

"আমি লিখে রেখে গেলাম। কাল আবার আসব।

"ও, আচ্ছা। আপনার নামটি?"

"রঙ্গনা। রঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"আচ্ছা।"

"আমি চললাম তাহলে।"

রঙ্গনা চলে গেল। রঙ্গনার প্রস্থানপথের দিকে চেয়ে সৌদামিনী দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গালে হাত দিয়ে ঘাড়টি কাৎ করলে। দিবসের পরিচয় সে শুনেছিল। তার সঙ্গে রঙ্গনার আবির্ভাব জড়িয়ে তার মনে যে সব ভাব জাগল তা অবর্ণনীয়। ফলে দিবসের প্রতি তার স্নেহ হঠাৎ যেন গাঢ়তর হয়ে গেল। স্বগতোক্তি করলে—কি দুষ্টু ছেলে বাবা, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে কি কাণ্ডই করছে! লণ্ঠনটা তুলে দিবসের বিছানাটা দেখলে, তারপর ঝেড়ে পরিষ্কার করে' দিলে আর একবার। একবার সন্ধ্যাবেলা করেছিল। আর একবার তার মনে হল—মশারির কথা তো পই পই করে' বলে দিয়েছি, কিন্তু আনে তবে তো—।

"সদু, ও সদু, কোথা গেলি তুই—"

গিরিবালার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"আমি এখানে আছি।"

গিরিবালা এসেই বললে, "তুই ক্ষেপে যাবি না কি তোর দিবুকে নিয়ে। ওদিকে ভাত ঠাণ্ডা হচ্ছে যে।"

"চল।"

চুনীলালের বাড়িতে গানের আসর জমে উঠেছে। ছাত্র ছাত্রী অনেকগুলি জুটে গেছে ইতিমধ্যে। সারি সারি বসে আছে তারা। গহনচাঁদ সরোদে দরবারি কানাড়া বাজাচ্ছেন। সঙ্গৎ করছে সীতারাম আর রমজান। ঊর্মিও একপাশে বসে' আছে। দরবারি কানাড়া খুব জমে' উঠেছে। ছোট ঘরটার পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে। ঘরটা সত্যিই কখন যেন রূপান্তরিত হয়ে গেছে বিরাট এক রাজ দরবারে। অদৃশ্য সিংহাসনে অদৃশ্য সম্রাট বসে' আছেন যেন রাজকীয় মহিমায়,

আর তাঁকে ঘিরে স্থরের আরতি চলছে তালে, লয়ে, মানে, মীড়ের টানে টানে, স্থরসপ্তকের উদাত্ত ঝংকারে ঝংকারে। অবর্ণনীয় পরিবেশ হয়েছে একটা। তন্ময় হয়ে চোখ বুজে বাজিয়ে চলেছেন গহনচাঁদ। দুটি ছাত্রী দরবারি কানাড়া শিখতে চেয়েছে তাঁর কাছে। দরবারি কানাড়ার রূপটা তাদের দেখাচ্ছেন তিনি। স্বপ্নলোক থেকে নেমে এসেছে যেন স্থরময়ী অপ্সরীরা, তাদের নৃত্যনিক্কণে মূর্ত হয়ে উঠেছে দরবারি কানাড়া। সকলেরই মনে হচ্ছে, চলুক, এ যেন না থামে। কিন্তু একটু পরে সমে এসে থেমে গেলেন গহনচাঁদ। নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন সবাই। কারও মুখ দিয়ে একটা কথা সরল না। রমজানের ঠোঁট দুটো নড়ল শুধু, মনে হল অস্ফুটকণ্ঠে সে যেন বললে— 'ওয়া, ওয়া'। সীতারাম স্তব্ধ বিভোর হয়ে বসে রইল, তার মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরুল না।

গহনচাঁদই প্রথমে কথা কইলেন।

"এই হল দরবারি কানাড়ার রূপ। সবটা অবশ্য একেবারে তোমরা পারবে না, সাধতে হবে ক্রমশ। আজ একটা সোজা গতের স্বরলিপি লিখে দেব তোমাদের। রঙ্গনা আস্থক, রঙ্গনার কাছে লেখা আছে গৎটা।"

"রঙ্গনা কোথা গেছে?"—ঊর্মি জিগ্যেস করলে।

"সে বেরিয়েছে একটু, আসবে এখুনি।"

"আমাকে কবে থেকে নাচ শেখাবেন?"

"ও তুমি বুঝি কথ্‌থকি নাচ শিখতে চাও? ময়ূর নাচটা শেখ তবে। সকালে আসতে হবে তাহলে।"

"বেশ তো, কখন আসব বলুন?"

চুনীলাল বারান্দায় ওৎ পেতে বসেছিল। সে ঘরের ভিতর মুখ বাড়িয়ে বললে, "ন'টার পর। তার আগে তো জামাইবাবুর পূজোই শেষ হবে না"—বলেই বারন্দা থেকে নেমে গেল বিড়ি ধরাবার জন্যে।

হ্যাঁ, নটার পরই এস। কিছু আবীরও কিনে এন।"

"আবীর? আবীর কি হবে?"

"মেজের উপর আবীর ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর পাতলা চাদর পেতে দিতে হবে একটা সেই চাদরের উপর নাচতে হবে। নাচটা যখন তোমার শেষ হয়ে যাবে তখন নাচের পর চাদরটা তুললে দেখতে পাবে আবীরের উপর একটা ময়ূর আঁকা হয়ে গেছে। ময়ূরটা যেন পেখম তুলে নাচছে।"

"তাই না কি! বাঃ চমৎকার তো!"

উর্মির মনও সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরের মতো পেখম মেলে নেচে উঠল যেন। গহনচাঁদ সস্নেহে চেয়ে রইলেন তার দিকে। রমজান এবং সীতারামের দৃষ্টিও স্নেহসিক্ত হয়ে উঠল। তারাও স্মিতমুখে চেয়ে রইল উর্মির দিকে।

"কতটা আবীর আনব?"

"কালই আবীর আনবার দরকার নেই। কাল বরং একটা খড়ি এন। ময়ূরটা মেজেতে এঁকে দাগে দাগে পা ফেলে ফেলে নাচটা অভ্যাস করে নাও আগে। তারপর আবীর বিছিয়ে দেখলেই হবে একদিন, ঠিক হচ্ছে কি না।"

"বেশ খড়িই আনব তাহলে। এই যে রঙ্গনাদি এসে গেছেন।"

রঙ্গনা এসে ঢুকল!

"কি হল? দিয়ে এলি টাকাটা?"

"দেখা পেলাম না ভদ্রলোকের।"

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন গহনচাঁদ।

"ছি ছি, টাকাটা আজই দিয়ে আসা উচিত ছিল ভদ্রলোককে। দেখা পেলি না? ছি ছি!"

"বড়ী আপশোষ কি বাত"—সীতারামও ক্ষোভ প্রকাশ করলে।

"কি করা যায় বল দেখি সীতারাম ? উনি অতটা ভদ্রতা করলেন, আমাদেরও যেমন করে' হোক আজই টাকাটা দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তুমি আর রমজান না হয় টাকাটা নিয়ে যাও, বাড়ি যাবার সময় আর একবার চেষ্টা করে' দেখ যদি ধরতে পার ভদ্রলোককে।"

"আমি চিঠি লিখে রেখে এসেছি। কাল গিয়ে দিয়ে আসব এখন।"

"আবার তুই যাবি কাল ?"

এমন সময় ঊর্মি রঙ্গনার কানে কানে কি একটা বলাতে কথাটা চাপা পড়ে গেল। রঙ্গনা মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে বললে, "হ্যাঁ, সুর দেওয়া হয়ে গেছে আমার। তবে বাবাকে এখনও শোনাই নি।"

"কি ?"—উৎসুক হয়ে উঠলেন গহনচাঁদ।

"ঊর্মি আমাকে গান দিয়ে গিয়েছিল একটা, সুর বসিয়ে দেবার জন্যে।"

"তুই গানে সুর দিতে পারিস না কি ? তাতো জানতাম না।"

বিস্ময়ে প্রশ্ন ফুটে উঠল রমজান এবং সীতারামের দৃষ্টিতেও।

"শুনবে ?"—রঙ্গনা ফিরে চাইলে গহনচাঁদের দিকে।

"জরুর জরুর"—উত্তর দিলে সীতারাম। গহনচাঁদও রাজি হলেন।

রঙ্গনা হার্মোনিয়ামটা টেনে নিয়ে বাজাতে লাগল।

"গানটা মনে আছে আপনার ? আমার খাতায় টোকা আছে, দেব ?" একটা ছোট খাতা দেখিয়ে ফিস ফিস করে' জিগ্যেস করলে ঊর্মি।

"আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।"

মুচকি হেসে হার্মোনিয়াম বাজাতে লাগল রঙ্গনা। খানিকক্ষণ বাজিয়ে কিরণের লেখা গানটা ধরলে সে।

আসিবে সে আসিবে সে আসিবে সে
জানি আমি, জানি আমি, জানি গো।
আঁধার রজনী শেষে
আলোক উজল বেশে
আসিবে সে আসিবে সে
আসিবে সে
জানি আমি জানি আমি জানি গো।

বলেছে রাতের পাখী
আসিবে সে আসিবে সে
পরাবে রঙীন রাখী
অরুণ আলোতে এসে

বলেছে জ্যোছনা ধারা
বলেছে ভোরের তারা
আসিবে সে আসিবে সে
আসিবে সে
জানি আমি জানি আমি জানি গো।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দিবস এবং কিরণ এসে ঢুকল। গানে যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছিল তা মূর্ত হয়ে গেল যেন সহসা।

"এ কি! আপনি আমার ঠিকানা জানলেন কি করে!" বলে উঠল রঙ্গনা।

দিবস বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। দুজনেই এক দোকান থেকে বাজনা কিনেছে এবং দুজনেই আবার একই গুরুর কাছ থেকে পাঠ নিতেও এসেছে এই বিস্ময়ের সঙ্গে তার অবচেতন লোকের স্বপ্ন মিলে

অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল তার মনে। অপ্রত্যাশিত এবং প্রত্যাশিত পাশাপাশি দাঁড়াল যেন সামনে এসে। এক হয়ে মিশে গেল যেন দেখতে দেখতে।

"আপনিও এখানে গান শিখতে এসেছেন ? আশ্চর্য !"

"এইটেই তো আমার বাড়ি"—তারপর গহনচাঁদের দিকে ফিরে রঙ্গনা বললে—"বাবা, ইনিই দিবসবাবু, কাল আমাকে সেতার কেনবার জন্যে টাকা দিয়েছিলেন।"

ভদ্রতার আতিশয্যে গহনচাঁদ উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং সাগ্রহে দুই বাহু প্রসারিত করে' অভ্যর্থনা করলেন।

"আসুন, আসুন, আসুন। আপনার ভদ্রতার কথা শুনে—"

একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল দিবস। এ ধরণের অভ্যর্থনা সে প্রত্যাশা করেনি।

"আমাকে 'আপনি' বললেন না। আমি আপনার শিষ্য হতে এসেছি।"

"শিষ্য ? ও, নিশ্চয়ই ! তার আর কথা কি ! বেশ, বেশ, বেশ। বস বস বস।"

শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন গহনচাঁদ। সীতারাম এবং রমজান নীরবে উপভোগ করতে লাগলেন মিলনটা। গহনচাঁদের উদার চরিত্র তাদের অবিদিত নেই, এই নবাগত উদার যুবকটিকে তারা সকৌতূহলে প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

কিরণকে দেখে ঊর্মির মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল।

"কিরণদা, একটা কথা শুনুন !"

ঊর্মির পিছু পিছু কিরণ বাইরে চলে গেল।

দিবস বসল।

রঙ্গনা বললে, "আমি এক্ষুণি আপনার বাড়ি থেকে ফিরে এলাম।"

"তাই না কি!"

"এইমাত্র আসছি। বড় নোংরা বস্তিতে আপনার বাড়িটা। আপনার হাঁসটি কিন্তু সুন্দর!"

"হাঁসটিও দেখে এসেছেন?"

হ্যাঁ চমৎকার হঁসটি। এই নিন আপনার টাকাটা।"

একখানা দশটাকার এবং আর একটা পাঁচটকার নোট বার করে' তুলে ধরলে সে দিবসের দিকে।

"টাকার জন্যে ব্যস্ত কি? থাক না,—তাছাড়া আমি—"

শশব্যস্ত গহনচাঁদ কিন্তু দিবসের কথা শেষ হতে দিলেন না।

"না, না, সে কি কথা, ওটা নিতে হবে বই কি—"

"আমি তো সরোদ শিখব বলে' আপনার স্কুলে ভরতি হতেই এসেছি। আমার বন্ধু কিরণও ভরতি হবে। আমাদের দুজনের মাইনেই তো কুড়ি টাকা লাগবে—"

"মাইনে? অ্যাঁ, বল কি—"

গহনচাঁদ আকাশ থেকে পড়লেন। বারান্দায় উপবিষ্ট চুনীলালের মাথাতেও যেন বম্‌ পড়ল। ছোকরা দুটি কখন ফট্‌ করে' ঢুকে পড়েছে টের পায় নি তো সে মোটেই। নূতন ছাত্র ছাত্রীদের ধরবার জন্যেই সে সর্বদা বসে থাকে বারান্দায় ওৎ পেতে। রাস্তায় যেই বিড়িটি ধরাতে গেছে, অমনি সর্বনাশটি হয়ে গেছে। সাধে মুনি ঋষিরা বলেছেন যে নেশা করা মহাপাপ! যাক, পরে সামলে নিলেই হবে, এখন যা হবার তা হয়ে যাক। এই ধরণের স্বগতোক্তি করে' শিস্‌ দিতে দিতে বেরিয়ে গেল চুনীলাল।

ঘরের ভিতর গহনচাঁদ তাঁর সাকরেদদের দিকে ফিরে বললেন "রমজান, সীতারাম, শুনছ? মাইনে, ছি ছি ছি!"

রমজান 'তোবা, তোবা' করে উঠল।

সীতারাম ঘাড় নেড়ে বলল, "বিচত্র।"

দিবস একটু হেসে বললে, "না, না, এটা আপনারা সে ভাবে নেবেন না, সামান্য প্রণামী—"

"না না, আগে থাকতে প্রণামীই বা নেব কেন আমি? তোমাকে যদি উপযুক্ত পাত্র বলে' মনে করি তাহলেই আমি প্রসন্ন মনে শেখাবো 'তোমাকে যতটুকু জানি, টাকার বদলে নয়। এর মধ্যে টাকা কড়ি প্রণামী দক্ষিণা এ সবের কোন কথাই আসতে পারে না। তোমার প্রদীপটি জ্বালিয়ে দেব আমার প্রদীপের শিখা থেকে। প্রদীপটাই দরকার, টাকাকড়ি নিয়ে কি হবে? এইতেই তো গেছি আমরা!"

রমজান আনন্দে গর্বে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। সে ধীরে ধীরে গা দুলিয়ে দুলিয়ে মুগ্ধ গদগদ কণ্ঠে বলে উঠল, "ওয়া ওয়া ওয়া।"

সীতারাম শুধু বিস্ফারিত নয়নে চেয়েছিল। চোখ দুটো জ্বলছিল তার। যে ছাত্র-ছাত্রীগুলি বসেছিল তাদের সঙ্গে চুনীলালের একটা প্রাথমিক আলাপ হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং তারা কেউ বিস্ময় প্রকাশ করছিল না। তাদের মধ্যে দু'একজন ঘাড় হেঁট করে' বা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল বরং। ঊর্মিও কিরণকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল এই জন্যেই। বারান্দার একধারে দাঁড়িয়ে ঊর্মি কিরণকে বলছিল—"মাইনের কথা গহনচাঁদবাবুর কাছে পাড়বেন না যেন, চুনীলালেবাবু মানা ক'রে দিয়েছেন। উনি সেকেলে ধরণের লোক, বিদ্যা বিক্রয় করতে চান না।"

ঘরের ভিতর থেকে গহনচাঁদের উচ্চ কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল—"না না, তা কিছুতেই হতে পারে না, একটি কপর্দকও চাই না আমি। রঞ্জনার কাছে তোমার যে পরিচয় পেলাম কাল তাতে মুগ্ধ হয়ে গেছি। এই তো চাই—বাঃ!"—তারপর আরও উত্তেজিত কণ্ঠে—"তাছাড়া,

ভদ্রলোক হবার অধিকার তোমারই একচেটে থাকবে, এই বা কেমন কথা—বাঃ !"

ঊর্মির চোখের হাসি চিকমিক করে উঠল।

"শুনছেন ? চমৎকার লোক সত্যি ! এরকম লোক যে এযুগে থাকতে পারে চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা শক্ত। হ্যাঁ, আর একটা কথা, রঙ্গনাদি আপনার গানে চমৎকার সুর দিয়েছেন। ওঁকে দিয়েই যদি রেকর্ড করানো হয় খুব ভাল হবে। তাই বলি, কি বলেন ? আপনার বন্ধু দিবসবাবুর সঙ্গে রঙ্গনাদির আলাপ আছে মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ আমারও তো মনে হচ্ছে। দিবস আমাকে কিন্তু বলেনি কিছু।"

ঊর্মির চোখে আবার একটা হাসি চিকমিক করে উঠল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দিবস বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

"না, ভদ্রলোক কিছুতেই নেবেন না টাকা। চল যাওয়া যাক" রঙ্গনাও বেরিয়ে এল।

"বাবা বলেছেন কাল থেকে আপনারা আসবেন নিশ্চয়।"

আচ্ছা"—দিবস হাসি মুখে বললে—"আসতেই হবে, উপায় কি ? আমরা এখন চলি তাহলে, নমস্কার।"

"নমস্কার।"

ঊর্মি এগিয়ে এসে বললে, "রঙ্গনাদি এখনি আপনি যে গানটা গাইলেন সেটা এঁরই রচনা।"

কিরণের দিকে সগর্বে চেয়ে রইল সে হাসিমুখে। কিরণ যেন তারই কীর্তি। রঙ্গনা নমস্কার করল। কিরণও প্রতিনমস্কার করলে নীরবে। কিরণের দিকে চেয়ে আর এক ঝলক হেসে ফেললে ঊর্মি (তার এই হাসির টুকরাগুলিও যে রূপান্তরিত কান্না তা সে নিজেও বুঝতে পারছিল না)। তারপর রঙ্গনাকে বললে, "লোকটি ভারী

লাজুক। ওঁর হয়ে কথাটা আমিই বলি তাহলে। ওঁর গানটা যদি আপনি রেকর্ডে দেন কেমন হয়? শুনেছি গ্রামোফোন কোম্পানিরা আপনার বাবাকে খুব খাতির করেন।"

"জানি না তো!"

"আচ্ছা আমিই জিগ্যেস করছি ওঁকে।"

তারপর কিরণের দিকে ফিরে বললে, "আপনারা যান, আমি একটু পরে আসছি।"

পুনরায় আর একদফা নমস্কার বিনিময় করে' দিবস ও কিরণ রাস্তায় নেবে পড়ল। নেবেই দেখা হয়ে গেল চুনীলালের সঙ্গে। এদেরই অপেক্ষায় চুনীলাল দাঁড়িয়েছিল।

"নমস্কার। একটুর জন্যে আজ 'মিস্' করেছি আপনাদের। আমার নাম চুনীলাল। গহনচাঁদবাবু আমার ভগ্নিপতি। ওঁর লেকচারটা শুনলেন তো? এইবার আমার কথাটা শুনুন। উনি যা বলেন তা সত্যযুগের কথা, কিন্তু সত্যযুগ তো এখন নেই, তাই আমার কলিযুগের কথাটাও শুনতে হবে আপনাদের। আমার জামাইবাবুটি মস্তবড় গুণী একজন, কিন্তু একদম আত্মভোলা লোক। সংসার করতে গেলে যে টাকার দরকার এবং সে টাকাটা যে রোজকার না করলে পাওয়া যাবে না এই কথাগুলো রাগ-রগিনী নয় বলেই বোধ হয় উনি ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না। দিদি মারা যাওয়ার পর থেকে মেয়েটিকে আমার কাছে রেখে কাশীবাস করছিলেন এতদিন। সেখানে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ পেয়ে, সাকরেদদের কাছ থেকে কলাটা মূলোটা নিয়ে চলে যাচ্ছিল ওঁর। কিন্তু মেয়েটি যে ক্রমশ বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে সেদিকে ওঁর খেয়ালই নেই। মেয়ের বিয়ে দিতে হলেই টাকা চাই। সেইজন্যে ওঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে এই সঙ্গীত-ভবনটি খুলেছি মশাই" আসল উদ্দেশ্য কিছু টাকা রোজকার করা। সেইজন্যে ওঁকে গোপন করে' মাইনের টাকাটা

আমিই নিচ্ছি। উনি জানতে পারলে খুনোখুনি করবেন, সেইজন্যে যাতে না জানতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বুঝতে পারছেন কথাটা ?"

দিবস বললে, "তার মানে টাকাটা আপনাকেই দিয়ে দেব ?"

"হ্যাঁ এবং কথাটা ওঁর কাছে গোপন রাখবেন।"

"বেশ! তাই হবে। টাকাটা কি এখনই নেবেন ?"

"না। আমার বাড়ির বাইরের দিকে যে ঘরটা আছে সেখানে সকালে রোজ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করি আমি। সেইখানেই আসবেন। টাকা নিয়ে রসিদ দিয়ে দেব। আমাকে চেনেন না শোনেন না, রাস্তায় আমার হাতে টাকা দেবেন কি! আমি জোচ্চরও তো হতে পারি ?"

দন্ত বিকশিত করে দুজনের মুখের দিকে চাইলে চুনীলাল।

"আচ্ছা, তাই হবে তাহলে, নমস্কার।"

"নমস্কার।"

নীরবে অগ্রসর হল তারা কিছুদূর।

কিরণ সহসা বললে, গহনচাঁদবাবু যদি সোজাসুজি মাইনে না নেন তাহলে ওখানে ভরতি হব না আমি।"

"কেন ?"

"চুনীলালবাবু যা বললেন তা সত্যি কি মিথ্যে কি করে' জানব বল ? এ-ও হতে পারে চুনীলালবাবু নিজেই টাকাটা গাপ করছেন।"

"তাতো একটু খোঁজ করলেই বোঝা যাবে।"

"তা বোঝা গেলেও আমি স্বস্তি পাব না। গহনচাঁদবাবু জানতে পারছেন না, অথচ তার মতের বিরুদ্ধে তাঁকে লুকিয়ে মাসে মাসে টাকা দিয়ে যাচ্ছি, এ রকম গোঁজামিলের মধ্যে আমি নেই। গুরু বলে' যাঁকে শ্রদ্ধা করব তাঁর সঙ্গে লুকোচুরি চলে না।"

"বেশ তো, তুমি ইচ্ছে করলে তাঁকে মাইনে না দিতে পার। তিনি তো আসতেই বলেছেন আমাদের।"

"না, তাতেও আমার আত্মসম্মানে বাধবে। আমি বিনা বেতনে কাউকে খাটিয়ে নিতে চাই না।"

"ব্রাহ্মণত্বের আদর্শে বিশ্বাস নেই তাহলে তোর বল?"

"যে বর্ণাশ্রমধর্মের পটভূমিকায় ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ উজ্জ্বল ছিল সেই বর্ণাশ্রমধর্মের যখন লোপ পেয়েছে তখন কেবলমাত্র ব্রাহ্মণত্বের আদর্শটাকে আঁকড়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। আজ হঠাৎ যদি কেউ রোমান টোগা পরে রাস্তায় বেরোয় তাহলে তা যেমন হাস্যকর এও তেমনি হাস্যকর।"

"যদিও তুই কবি তবু আমার মনে হয় রোমান টোগার সঙ্গে ব্রাহ্মণত্বের আদর্শের উপমাটা খুব লাগসই হল না। রোমান টোগা একটা সাময়িক ব্যাপার। ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ কিন্তু সভ্য সমাজের চিরন্তন আদর্শ। যে দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম নেই সে দেশেও ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ আছে—"

হঠাৎ সাহেব প্রফেসারটির মুখ তার মনে পড়ে গেল।

"ওদেশের যাঁরা বড় বড় অধ্যাপক তাঁরা সত্যিই ব্রাহ্মণ। এদেশেও ব্রাহ্মণ ছিল এবং আবার হবে। না হলে আমাদের মুক্তি নেই।"

"যখন হবে তখন ব্রাহ্মণত্বের আদর্শকে মানব। আজ আমি ব্রাহ্মণ ট্রাম ড্রাইভারি করছি আর তুমি ব্রাহ্মণ একটা মেসে চাকর হয়ে আছ। আমাদের কোনও অধিকার নেই ব্রাহ্মণত্বের আদর্শের ছুতোয় কাউকে বিনাপয়সায় খাটিয়ে নেবার।"

"বেশ বেশ নিও না। সব বিষয়ে তর্ক করা তোর কেমন একটা স্বভাব হয়ে গেছে দেখছি!"

আবার নীরবে পথ চলতে লাগল দু'জনে। কিরণের কেমন যেন

লজ্জা করছিল। তার যে আত্মসম্মান বোধটা নিষ্ঠুর অত্যাচারীর মতো তার দুর্বলতার টুঁটি টিপে আছে সর্বদা অথচ যার স্বপক্ষে সে যুক্তিও আহরণ করে চলেছে অহরহ সেটাকে এমনভাবে আস্ফালন করেনি সে কোনদিন। হঠাৎ উর্মিকে দেখেই বোধ হয় মানসিক সমতাটা নষ্ট হয়ে গেল। উর্মির সান্নিধ্যে এলেই তার আত্মসম্মান বোধটা কেমন যেন উগ্র হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ সে জিগ্যেস করলে, "গহনচাঁদবাবুর মেয়ে রঙ্গনার সঙ্গে তোর আলাপ আছে না কি?"

"আজই হয়েছে। আমি যে দোকান থেকে সরোদ কিনছিলাম উনিও সেখানে সেতার কিনছিলেন। ওঁর কয়েকটা টাকা কম পড়ে গিয়েছিল, আমি সেটা দিয়ে দিলাম।"

দিবস হাসিমুখে চাইলে কিরণের দিকে। কিরণেরও মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সে বললে, "এবং, বলে যা, থামলি কেন?"

"এবং-এর পর ড্যাশ, আধুনিক রীতিতে ফুটকি ফুটকিও বলতে পার।"

আবার সেকেণ্ড কয়েক নীরবে চলবার পর দিবস হঠাৎ বললে, "দেখ গহনচাঁদবাবুর ওখানে তুই যদি যাস তাহলে আমার আসল পরিচয়টা যেন ফাঁস করে' দিস না ওদের কাছে। আমি ওদের কাছে নিজেকে মেসের চাকর বলেই পরিচয় দেব যদি দরকার হয়।"

"কেন?"

"পরে বলব।"

কিরণ ভ্রূকুঞ্চিত করে চাইলে দিবসের দিকে। দিবসের মুখে ফুটে উঠল মুচকি হাসি।

* * * *

খানিকক্ষণ ঢুলে ঢুলে সৌদামিনী শেষে দিবসের ঘরের মেজেতেই আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছিল। দিবসের ঘরের চাবি তার কাছেই আছে, ঘরটা খোলা রেখে নিজের ঘরে যেতে পারে নি সে তাই।

দিবস এবং কিরণ যখন এল তখন দশটা বেজে গেছে। মোহন ঠাকুরের হোটেল থেকে খেয়ে এসেছিল সে। দিবসের সাড়া পেয়ে সৌদামিনী উঠে বসল।

"এত রাত অবধি ছিলে কোথায়? সেই থেকে ঠায় বসে' বসে' শেষে এইখানেই আঁচল পেতে শুয়ে পড়লুম। ছিলে কোথা এতক্ষণ? বাড়ি গিয়েছিলে না কি?"

"না।"

"তাহলে?"

"এমনি একটু দরকার ছিল।"

"খাওয়া হয়েছে?"

"হয়েছে।"

"কোথা খেলে?"

"মোহন ঠাকুরের হোটেলে।"

কমানো লণ্ঠনটা উস্কে টেবিলের উপর রাখতেই রঙ্গনার চিঠিটা চোখে পড়ল সৌদামিনীর।

"সন্ধ্যেবেলা একটি মেয়ে এসেছিল, এই চিঠি লিখে রেখে গেছে। টাকা না কি দিতে এসেছিল বললে।"

চিঠিটা পড়তে পড়তে দিবস বললে, "দেখা হয়েছে এর সঙ্গে। এদের বাড়িতেই দেরি হয়ে গেল।"

"তোমার কেউ হয় না কি?"

"না।"

এইবার আসল কথাটা মনে পড়ল সৌদামিনীর।

"মশারি এনেছ?"

"ওই যাঃ, আজও ভুলে গেছি।"

"রোজ রোজ মশার কামড়ে শুলে অসুক করবে যে!"

"কিছু হবে না।"

দিবস নিজের মোমবাতিটা জ্বেলে ফেললে। তারপর কিরণের দিকে চেয়ে বললে, "রমঁ্যা রলাঁর 'I will not rest' বইটা কিনেছি। এই দেখ—।"

সৌদামিনী কিরণের দিকে একবার চেয়ে বেরিয়ে গেল। কিরণ বইটার সম্বন্ধে কোনও আলোচনা না করে ঘরের চার দিকটা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

"তুই কি এ ঘরে থাকতে পারবি?"

"কেন পারব না?"

"তার চেয়ে আমার বাসায় চল না!"

"আপত্তি ছিল না, কিন্তু তোর বাসায় থাকবার মতো অবস্থা নয় এখন আমার। তোমার বাসায় থাকতে গেলে তোমার বাসার অর্ধেক ভাড়া আমার দেওয়া উচিত, কিন্তু অত টাকা পাব কোথা, তাছাড়া এই বাসার তিন মাসের অগ্রিম ভাড়া দিয়ে দিয়েছি।"

কিরণ চুপ করে রইল। আত্মসম্মান বিষয়ে একটু আগেই বক্তৃতা দিয়েছে সে। সৌদামিনী এসে ঢুকল আবার। তার হাতে একটা মশারি।

"আমার একটা ছেঁড়া-খোঁড়া ছিল এইটে টাঙিয়েই শোও আজ। সর, টাঙিয়ে দিই।"

কিরণ উঠে পড়ল।

"আমি এখন উঠি ভাই। কাল ভোরেই আমার আবার ডিউটি। যেতেও হবে অনেকটা দূর।"

"চল তোকে একটু এগিয়ে দি তাহলে।"

দিবসও উঠে দাঁড়াল।

সৌদামিনী দিবসকে বললে, "গল্প করতে করতে আবার বেশি দূরে চলে যেও না যেন। তোমারও কাল সকালে ডিউটি।"

"আমি এখনই আসছি।"

দুজনে বেরিয়ে গেল।

মশারি টাঙাতে গিয়ে সৌদামিনী দেখলে যে শুধু মশারি হলেই হবে না, পেরেক চাই, দড়ি চাই। অর্থাৎ গিরির সাহায্য নিতে হবে।

...সৌদামিনীর কথা শুনে রাস্তায় যেতে যেতে কিরণ বলছিল—

"একে বেশ পেয়েছিস তো!"

"চমৎকার!" উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দিবস উত্তর দিলে এবং কাল থেকে যে কথাটা তার মনে হচ্ছিল সেটা বলে' ফেললে "যাদের আমরা ছোটলোক বলে' ঘৃণা করে' এসেছি এতকাল, এখন দেখছি তারা মোটেই ছোট নয়, তাদের মধ্যেই সনাতন ভারতবর্ষ বেঁচে আছে এখনও।"

...গিরি এবং সৌদামিনী দুজ'নে মিলেই টাঙাচ্ছিল মশারিটা। দিবস আবার বেরিয়ে যাওয়াতে বিরক্ত হয়েছিল সৌদামিনী।

"অত্যন্ত বারফটকা স্বভাব দেখছি। আবার বেরিয়ে গেল।"

"পটলির কথাটা বলেছিলি?"

"সময় পেলাম কই? সঙ্গে কে একজন ছিল, যার তার সামনে কি ওকথা পাড়া যায়? বলব এখন সময় মতো।"

দিবস এসে ঢুকল এবং শেষ কথাগুলো শুনতে পেয়ে গেল।

"কি বলবে? বাঃ, মশারি তো চমৎকার হয়েছে। আরে, গিরিবালাও যে, তুমিও ঘুমোও নি এখনও?"

"এইবার যাই।"

মাথায় আধঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেল গিরিবালা। সৌদামিনীর একবার ইচ্ছে হল পটলির কথাটা এখনই বলে কিন্তু তখনই আবার মনে হল—না আজ রাত হয়ে গেছে, কাল সকালে বললেই হবে।

"এইবার আলোটি নিবিয়ে তুমিও ঘুমোও।"

"শুচ্ছি, কিন্তু এখন ঘুম আসবে না। পড়ব।"

"কতক্ষন পড়বে ?"

"যতক্ষণ না ঘুম আসে।"

"কি কাণ্ড !"

আবার ঘাড়টি কাৎ করে গালে হাত দিলে সৌদামিনী। তারপর বেরিয়ে গেল।

টেবিলে মোমবাতিটা ঠিক করে' রাখতে গিয়ে রঙ্গনার চিঠিটা আবার চোখে পড়ল দিবসের। ভ্রূকুঞ্চিত করে' আবার পড়লে চিঠিটা। তারপরমুচকি হাসি ফুটে উঠল মুখে। আবার ভ্রূকুঞ্চিত হল।

কিরণ বাসায় ফিরে দেখল উর্মি একটা চিঠি নিয়ে বসে আছে তার আশায়।

"গহনচাঁদবাবু বললেন গ্রামোফোন কোম্পানিদের কারও সঙ্গে তাঁর নিজের কোনও আলাপ নেই। মলঙ্গা লেনে এক ভদ্রলোক থাকেন, তাঁর না কি হাত আছে। গহনচাঁদবাবু চেনেন তাঁকে। তাঁর নামে একটা চিঠিও দিয়েছেন। আপনি এই চিঠিটা নিয়ে যাবেন তাঁর কাছে ?"

কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে কিরণ বললে, "না।"

"কেন, গেলে ক্ষতি কি ?"

"তা তোমাকে বোঝাতে পারব না, কিন্তু আমি যাব না।"

"বেশ, আমিই যাব তাহলে।"

চিঠিখানা নিয়ে ঊর্মি চলে গেল।

"সময় মত আমি নিজেই এসে দেখা করে' যাব" দিবসের এই আশ্বাসটুকুর উপর নির্ভর করে' সূর্য চৌধুরি দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল দিবস ঠিক আসবে, এবং সব ঠিকও হয়ে যাবে। তবু অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল একটা, বিশেষত ব্রজর এক একটা তীক্ষ্ণ কথা মাঝে মাঝে আকুল করে' তুলছিল তাঁকে। কিন্তু এ ছাড়া আর একটা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন তিনি এবং এই দ্বন্দ্বটা তাঁর উকিল মনকে এত ব্যাপৃত করে' রেখেছিল যে দিবসের চলে যাওয়ার দুঃখটাও তত তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন না তিনি। দ্বৈরথটা চলছিল প্রিয়বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলের সঙ্গে। সাণ্ডেল নানারকম উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে আজকালকার ছেলেমেয়েরা অতি পাজি, অতি বখা, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দিবসের এই চলে' যাওয়াটাকেই একটা উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করছেন তিনি। সূর্য চৌধুরি—উকিল সূর্য চৌধুরি —হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে দাঁড়িয়েছেন আজকালকার ছেলেমেয়েদেরই পক্ষে এবং বদ্ধপরিকর হয়েছেন যে মামলাটা তিনি জিতবেন। মনে মনে তিনি আশা করে' আছেন দিবসের আচরণই তাঁকে জিতিয়ে দেবে। প্রমাণের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন তিনি।

…মক্কেলদের কাজ শেষ করে' আহারান্তে তিনি ছাতে বসেছিলেন এবং কোনদিন যা করেন না আজ তাই করছিলেন। আকাশের দিকে চেয়েছিলেন। কয়েকটা তারার আকম্পিত আলোর দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন তিনি। ব্রজ আসতে মর্ত্যে নেবে এলেন আবার। ব্রজ গড়গড়াটা নামিয়ে তার মাথায় কলকেটা বসিয়ে দিয়ে বললে, "কই দিবু আজও তো এল না।"

"আসবে, ব্যস্ত কি।"

"উঃ, বাপ যে এমন পাষাণ হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। আজ ওর মা থাকলে কি এমন নিশ্চিন্ত থাকতে পারতে তুমি, না সে নিশ্চিন্ত থাকতে দিত তোমাকে।"

সূর্যকান্ত কোন জবাব দিলেন না। ব্রজ দাঁড়াল না। তাঁর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হেনে নিচে নেবে গেল। সূর্যকান্ত পা দোলাতে দোলাতে গড়গড়ায় টান দিতে লাগলেন।

"সূর্যকান্ত, ঘুমিয়েছ না কি হে?"

সাণ্ডেলের গলা। সূর্যকান্ত উঠে আলসে থেকে ঝুঁকে বললেন— "না। উপরে এস।"

"ও বাবা, ছাতে চড়ে' বসে আছ!"

একটু পরে সাণ্ডেল এসে হাজির হলেন এবং চেয়ারে বসেই প্রশ্ন করলেন, "বাবাজীর কোনও খবর পেলে?"

"না, আর তো কিছুই পায়নি।"

"গতিক ভাল নয়। উঠে পড়ে লেগে খুঁজে বার কর।"

"ব্যস্ত হবার দরকার কি? শিক্ষিত ছেলে, নিতান্ত ছেলেমানুষও নয়, তাকে অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ দেখি না।"

"তুমি দেখ না তার কারণ তুমি অন্ধ, স্নেহান্ধ।"

গোঁফের ফাঁকে একটু মৃদু হেসে সূর্যকান্ত বললেন, "যদি বলি আমি আধুনিক—"

"দেখ শিং ভেঙে বাছুরের দলে মেশা যায় না। ওই এক ঝুড়ি কাঁচা পাকা গোঁফ নিয়ে আধুনিক হতে পারবে না, সে চেষ্টা করো না। ছেলেটিকে খুঁজে বের করে' গলায় গামছা দিয়ে হিড়হিড় করে' টেনে নিয়ে এস, নিয়ে এসে অবিলম্বে একটি বিয়ে দিয়ে দাও। আমাদের যোগীনের ছেলেটাও গা-ঢাকা দিয়েছিল। কি করেছে জান সে?"

"কি?"

"এঁটো আঁটি চুষতে চুষতে বাড়ি ফিরেছে।"

"তার মানে!"

"গুণ্ডা-বিদ্ধস্ত এক মেয়েকে বিয়ে করে' এনেছে! কালে কালে কতই যে দেখব!"

"এতে অন্যায়টা হয়েছে কি? দুঃশাসন-বিদ্ধস্ত দ্রৌপদীকে পাণ্ডবরা যখন ত্যাগ করে নি তখন—"

সূর্য চৌধুরিকে কথা শেষ করতে দিলেন না সাণ্ডেল মশাই।

"নাঃ, তোমার মতিভ্রম হয়েছে দেখছি। দুঃশাসন-দ্রৌপদী করছ কর, কিন্তু এই বলে দিলুম, গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগবে।"

গোবিন্দ সাণ্ডেল উঠে দাঁড়ালেন।

"এর মধ্যেই উঠছ যে?"

"আজ আর বসব না। সমস্ত দিন একাদশীর উপোস গেছে, ঘুম পাচ্ছে। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম ভাবলাম দিবুর খবরটা একবার নিয়ে যাই। আধুনিকতার বারফট্টাই করতে চাও কর, কিন্তু ছেলেটিকে খুঁজে পেতে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এস, তা না হলে পস্তাতে হবে এই বলে দিলুম।"

গোবিন্দ সাণ্ডেল চলে গেলেন। সূর্য চৌধুরি পা দোলাতে দোলাতে তামাক খেতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ উঠে পড়লেন। নিচে নেমে গিয়ে দেরাজটা খুলে শালটা বার করলেন। দিবস যে শালটা পাঠিয়েছিল সেই শালটা। অনেকবার দেখেছেন তবু আর একবার দেখতে লাগলেন। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগলেন। দেখে রেখে দিলেন সেটা। তারপর আর একটা টেবিলে গিয়ে কাগজপত্তর হাঁটকে কার্ডটা বার করলেন। ইউনিভার্সিটি ইনস্‌টিট্যুট থেকে তাঁকেও নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে গিয়েছিল। কার্ডটার দিকে চেয়ে রইলেন নির্মিমেষে।

রঙ্গনা নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে কাঁদছিল। চুনীলালের সঙ্গে

তার কথা হয়েছে গোপনে। তার বাবার অন্তঃসারহীন মহত্ত্বের পরিণাম যে কি তা চুনীলাল বুঝিয়ে দিয়েছে তাকে। চুনীলালের কথার প্রতিবাদ করতে পারে নি সে। কিন্তু অন্তরের ভিতরটা হায় হায় করছে। কেবলই তার মনে হচ্ছে মামা কেন দিবসবাবুকে এসব কথা বলতে গেলেন! না হয় দু'একজন মাইনে না-ই দিত। বাইরের লোকের সামনে বাবাকে—তার অমন সরল বাবাকে—খেলো না করলেই কি চলছিল না?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দিবস হরিদাসবাবুর জুতো বুরুষ করছিল এবং দ্বন্দ্ব করছিল নিজের সঙ্গে। সে যে পেরেছে এই আনন্দে মনটা ভরপুর হয়ে উঠেছিল তার। জুতো বুরুষ শেষ করে' একটু পরেই সে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে গিয়ে বক্তৃতা দেবে। এই দুই আপাত-বিরোধী ব্যাপারের সে যে সমন্বয় করতে পেরেছে এরই আনন্দটা যাতে তার চোখে মুখে উপছে পড়ে' আত্মশ্লাঘার ছোঁয়াচ লেগে কুৎসিত বাহাদুরিতে পরিণত না হয় সেই দ্বন্দ্বই করছিল সে মনে মনে। সে যে খুব একটা বাহাদুরি করেছে এটা সে মনে মনেও মানতে চাইছিল না। ভাবছিল মনে মনে মানলেই তার অজ্ঞাতসারে চোখে মুখেও ফুটে উঠবে সেটা। ঘরের কোণে ছোট্ট একটি প্রদীপ জ্বালা থাকলেও তার অস্তিত্ব যেমন বদ্ধদ্বারের সূক্ষ্ম ফাটল দিয়েও বোঝা যায় তেমনি বোঝা যাবে। না, ও প্রদীপ সে জ্বালবেই না। কিছুতেই না। এতে বাহাদুরি কি আছে? এইই তো করা উচিত। আদর্শকে অনুসরণ করার মধ্যে কোনও বাহাদুরি নেই। কিন্তু তার মনের বালক-প্রকৃতি মাঝে মাঝে প্রদীপটা জ্বেলেও ফেলছিল দু'একবার। তখনই আবার নিবিয়ে দিচ্ছিল তাড়াতাড়ি। সেদিন সৌদামিনীর মুখে গিরিবালার আত্মীয়া পটলির কথা শুনে সে যখন নিজের রিস্ট-ওয়াচটা বিক্রি করে' পঁচাত্তরটা টাকা এনে দিয়েছিল তখনও তার মনে এই ধরণের বাহাদুরির ভাব জেগেছিল একটা। সৌদামিনীকে যদিও সে জানায় নি যে রিস্ট-ওয়াচ বিক্রি করে' সে টাকা এনে দিয়েছে (বলবার লোভ হচ্ছিল যদিও প্রচুর, সিনেমার নায়কের মতো সে যে তার শেষ সম্বলটুকুর বিনিময়ে জনৈকা বস্তিবাসিনী যুবতীকে পাপের

পথ থেকে নিবৃত্ত করতে পেরেছে এর নাটকটা আস্ফালন করতে খুবই প্রলুব্ধ হয়েছিল সে) কিন্তু মনে মনে আত্মগৌরবের অহংকৃত মদিরাটা সে পান করেছিল বই কি। অন্যায় জেনেও পান করেছিল। ছেলেবেলায় ব্রজকে লুকিয়ে দুপুরবেলা আচার চুরি করে খেত যেভাবে সেইভাবে সে এই আত্মশ্লাঘাটাকে উপভোগ করেছিল। হঠাৎ পটলির যৌবন-লিপ্সু ঝাঁকড়া-চুল-ওলা আরক্তচক্ষু লোকটার মুখচ্ছবি এবং কাহিনী তার মনে জেগে উঠল। পটলির স্বামী কাজ করত লোকটার বাড়িতে। তারপর পটলির স্বামী অসুখে পড়ে। সে অসুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এখনও ভুগছে। অসুখের জন্য পটলি লোকটার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার করে এনেছিল। সেই ধার সুদে আসলে এখন পঁচাত্তর টাকায় দাঁড়িয়েছে। ঝাঁকড়া-চুল-ওলা লোকটা বলছে নগদ টাকা সে চায় না, পটলি গতর খাটিয়ে সে টাকা শোধ করে দিক। পটলিকে গতর খাটাতে হবে অবশ্য তার বাড়িতে গিয়েই। পটলির পরিবর্তে সৌদামিনী গিয়ে গতর খাটাতে সম্মত হয়েছিল কিন্তু ঝাঁকড়া-চুল-ওলা তাতে রাজি নয়। সে পটলিকেই চায়। অর্থ সুস্পষ্ট। গিরিবালা (পটলির দূর সম্পর্কের কাকী) সৌদামিনীর মারফত উকিল-পুত্র দিবসের উপদেশ প্রার্থনা করেছিল যে আইনত এর কোন প্রতিকার হতে পারে কিনা। দিবস বলেছিল—"অত ঘোর প্যাঁচের মধ্যে না গিয়ে টাকাটা দিয়ে লোকটাকে বিদেয় করে দাও। তোমাদের যদি টাকা না থাকে আমি টাকা দিচ্ছি।" বাড়ি থেকে চলে আসবার আগে সে তার আড়াইশ' টাকা দামের রিস্ট-ওয়াচটা অয়েল করতে দিয়েছিল একটা দোকানে। সেই দোকানেই ঘড়িটা সে একশ' টাকায় বিক্রি করে' তার থেকে পঁচাত্তর টাকা সৌদামিনীকে দিয়েছে। একটা মস্ত সুবিধে হয়েছে কিরণ কিছুই জানতে পারে নি। জানতে পারলে ঠিক বাধা দিত।

বলাবাহুল্য সেই ঝাঁকড়া-চুল-ওলা লোকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে সুদসুদ্ধ টাকা নগদ পেয়ে মোটেই খুশি হয় নি, বরং অসংস্কৃত ভাষায় যা সব বলে গেল তা একটুও শ্রুতিরোচক নয়। একটা জিনিস অবশ্য সংস্কৃত ছিল তার—দন্ত্য'স'-এর উচ্চারণটা। এই চিন্তার সূত্র ধরেই রঙ্গনার কথাটাও মনে পড়ল তার। সূত্রটা অবশ্য ঈষৎ জটিল। সেই ঝাঁকড়া-চুল-ওলা লোকটা যা ইঙ্গিত করেছিল তার অর্থ—ও, টাকাটা দিয়ে পটলিকে তুমিই গ্রাস করতে চাও? বটে! তার এই ইঙ্গিতের উত্তরে মনে মনে হাসতে গিয়েই রঙ্গনার কথাটা মনে পড়ে গেল তার। রঙ্গনাও কি আজকের সভায় যাবে? কে জানে!

জুতো বুরুষ করতে লাগল সে ত্বরিত-হস্তে। আর মিনিট দশেক পরেই বেরুতে হবে তাকে। হরিদাসবাবুও একটা কোন মিটিংয়ে যাবেন এখনই, জুতোটা তাঁর এখনই চাই। গোবর্ধনবাবুর 'টাইম-পীস'টার দিকে এক নজর চেয়ে তাড়াতাড়ি জুতোবুরুষ শেষ করে' সে নেবে গেল নিচে। মনিবদের কাছে সে আগেই ছুটি চেয়ে নিয়েছিল।

অসময়ে বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা। চেৎলা অঞ্চলের একটা সরু গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে (এবং কিঞ্চিৎ ছুটে) আপাদমস্তক ভিজে গেলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল। একটা গাড়িবারান্দার নিচে আশ্রয় পাবার পর প্রথমেই তিনি জুতো জোড়াটার দিকে তাকালেন। কাদায় জলে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। মাত্র দিন দুই আগে কিনেছেন। মর্মান্তিক রাগ হল বদ্যিনাথ মৈত্রর উপর। সাধে লোকে বলে সতেরোটা গাধা মরে একটা মাস্টার হয়। তুই যখন ঠিক জানিস না তখন একটা উড়ো খবর দিতে গেলি কোন আক্কেলে! একবারে ঠিকানা পর্যন্ত দিয়ে বলে দিলি যে দিবু বলে এক ছোকরা

পান বিড়ির দোকান খুলে বসেছে! সাণ্ডেল মশাই গিয়ে দেখেন দিবু বলে এক ছোকরা পান বিড়ির দোকান খুলেছে বটে কিন্তু এ দিবু দিবস নয় দিব্যেন্দু। দিবাকর হতেও বাধা ছিল না। সাণ্ডেল মশাই এটা যে ভাবেন নি তা নয়। বঙ্কিনাথকে জেরাও তিনি করেছিলেন, কিন্তু সে ওই কালো শুঁটকো ছোকরার এমন বর্ণনা দিলে যে মনে হল দিবসই হবে বোধ হয়। ওই রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ? না, ওই চেহারাকে দোহারা বলা চলে? এর পর আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলেন সাণ্ডেল মশাই। তিনিই বা মরতে এলেন কেন এতদূর, কি দরকার ছিল তাঁর। উত্তরটাও তখনই মনে এল—না এসে উপায় কি! বন্ধুর দুর্দশাটা চোখের ওপর দেখা যায় কি? তিনি তো একেলে 'ফ্রেণ্ড' নন্ যে মৌখিক সহানুভূতির ফুলঝুরি কেটে কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা হয়ে যাবেন। সামর্থ্যে যতটা কুলোয় ততটা তাঁকে করতে হবে। ছেলেকে ফিরে না পেলে ওর মুখের হাসি যে ফিরবে না তা তাঁর চেয়ে বেশি আর কে জানে! তাঁকেই চেষ্টা চরিত্র করে' ফিরিয়ে আনতে হবে ছেলেটাকে। সূর্যি নিজে আর খুঁজবে না। ভাঙবে তবু মচকাবে না—চেনেন তো! ছেলের উপর অগাধ বিশ্বাস করে' আধুনিক সেজে বসে আছে। এদিকে মনে মনে সে গুমরে মরছে তা আর কেউ না বুঝতে পারুক তিনি বোঝেন।...হঠাৎ আবিষ্কার করলেন মনি-ব্যাগটা পকেটে নেই। পকেট থেকে তুলে নিলে না কি কেউ? না, ছুটতে গিয়ে পড়ে গেল? বৃষ্টি থেকে মাথাটা বাঁচাবার জন্যে রুমালখানা বার করেছিলেন একবার। সেই সময়ে পড়ে গেল না কি! মহা মুশকিল হল তো। ট্রাম বাসের পয়সা পর্যন্ত নেই যে। শ্যামবাজার পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া তো অসম্ভব। ট্যাক্সি করতে হবে না কি? পরিমিত পেন্সন থেকে অকারণে এতগুলো টাকা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু উপায়ই বা কি! ঘোড়ার গাড়িও কম নেবে না। কাছে পিঠে ট্যাক্সিও তো

দেখা যাচ্ছে না একটাও। কোঁচাটি বাঁ হাতে ধরে আধুনিক ছেলেদের এবং মাস্টারদের মুণ্ডপাত করতে করতে মোড়ের দিকে অগ্রসর হলেন তিনি।

দিবস নিজেও ভাবেনি যে তার বক্তৃতাটা এমন জমে উঠবে। শেষের দিকটা আরও বেশি জমে উঠল যেন। বিস্মিত রঙ্গনা সামনেই বসেছিল। চিত্রার্পিতবৎ বসেছিল সে। মানে, তার দেহটাই বসেছিল। মনে মনে সে চলে গিয়েছিল অনেক দূরে। দিবসের সব কথা সে শুনছিলও না। দু'একটা কথা মাঝে মাঝে যা কানে আসছিল তা না এলেও কিছু ক্ষতি হত না। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ যে আলোটা সে দেখতে পেয়েছিল সেই দিকেই চেয়েছিল সে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে।

আবেগভরে বলে চলেছিল দিবস—"বন্ধুগণ, বাঙালীরা অলস, বাঙালীরা অপদার্থ, বাঙালীরা পরশ্রীকাতর, বাঙালীরা স্বপ্নবিলাসী বাবু এ অপবাদ ঘোচাতে হবে আমাদের। সার্থক প্রতিবাদ করতে হবে এর। হাতে-কলমে প্রমাণ করে' দিতে হবে যে দরকার হলে আমরা সব করতে পারি, কোনও সৎকাজই ঘৃণ্য নয় আমাদের কাছে। কেবল গুটিকতক শৌখিন বৃত্তি ছাড়া অন্য কোন কাজ করতে আমরা অক্ষম এ নিন্দা আমাদের যেন আর শুনতে না হয়। আমাদের মাথার উপর বজ্র-গর্ভ কৃষ্ণমেঘ ঘনিয়ে এসেছে বন্ধুগণ, আত্মরক্ষা করতে হবে আমাদের। ইমার্সনের সেই অমর বাণীকে সার্থক করতে হবে জীবনে—The best Lightening rod for your protection is your own spine. একথা ভুললে চলবে না যে পৌরুষই মানুষের একমাত্র সম্পদ, একমাত্র নির্ভর। কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ এই জাতকে কোমর সোজা করে' মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে আবার। বাঁচতে হবে মানুষের মতো

কাজ করতে হবে, আলস্য পরিহার করে' যে কোনও কাজ করবার সাহস ও শক্তি সংগ্রহ করতে হবে, প্রমাণ করে দিতে হবে যে 'ডিগ্‌নিটি অব লেবার' কথাটা কেবলমাত্র আমাদের মুখের কথাই নয়। ছোট বড় যাই হোক না কেন সমাজ-হিতকর যে কোনও কাজই যে সৎকাজ এই সত্যকে আঁকড়ে থাকবার মতো সাহস যেন আমরা সংগ্রহ করতে পারি, এই সত্যকে সার্থকভাবে ঘোষণা করবার যোগ্যতা যেন আমরা অর্জন করতে পারি। আলস্য নয়, লম্বা লম্বা বুলি নয়, কাজকেই করতে হবে আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র। যে কুৎসিত মূঢ়তা, যে জঘন্য অহংকার শিক্ষিত সমাজকেও পঙ্গু, সীমাবদ্ধ করে' ফেলছে দিন দিন তার করাল কবর থেকে মুক্ত হতে হবে আমাদের। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে বন্ধুগণ, ভারতবর্ষের অমরগ্রন্থ গীতার কর্মযোগ স্বাধীন মন নিয়ে নূতন করে' পড়তে হবে আবার। উপলব্ধি করতে হবে শ্রীকৃষ্ণের এই পৌরুষপূর্ণ উক্তির মর্ম কি—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর
অসক্তো হ্যাচরণ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।

অনাসক্ত হয়ে কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম করতে হবে। অর্থলোভে নয়, বিলাস-লালসায় নয়, যশাকাঙ্খায় নয়, কর্তব্যের জন্য, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য, আত্মশুদ্ধির জন্য, আনন্দের জন্য।

ভদ্রমহিলাগণ, আপনাদেরও প্রতি একটা বিশেষ অনুরোধ আছে আমার। আপনারাই আমাদের ঘরে ঘরে জননী ভগ্নী ও বধূরূপে বিরাজ করছেন। আপনারা উদ্বুদ্ধ করুন এই হতভাগ্য জাতির পৌরুষকে। আপনারা শ্রদ্ধা করতে শিখুন ধনীকে নয় চরিত্রবানকে, ভীরুকে নয় বীরকে, অক্ষম পরগাছাকে নয় সক্ষম বৃক্ষকে, অলসকে নয় কর্মীকে, অভদ্রকে নয় ভদ্রকে। আপনারা জাগিয়ে তুলুন আমাদের মহত্ত্ব, বাঁচিয়ে তুলুন আমাদের মনুষ্যত্ব, উদ্বুদ্ধ করুন আমাদের আদর্শ।

আপনাদের স্নেহ ভালবাসা শ্রদ্ধাই তো আমাদের প্রেরণা। আমাদের অতীতের দিকে চাইলে বুক ভরে' ওঠে, আমাদের ভবিষ্যতও কি তেমনি মহিমোজ্জ্বল হবে না? নিশ্চয়ই হবে। আমার বিশ্বাস আছে নিশ্চয় হবে। জাগতেই হবে আমাদের, সাড়া দিতেই হবে আদর্শের আহ্বানে। মুমূর্ষু দেশ প্রতীক্ষা করে' আছে—

বাক্যেই নহে কর্মে প্রমাণ করিবে শক্তি তার
কই সে সতেজ সুস্থ সে যৌবন
মন্ত্র সাধনে সিদ্ধ হইবে যাহার পুরুষকার
তাহারই লাগিয়া করিবে জীবন পণ
বাধার পাহাড় যার পদতলে গুঁড়াইয়া হবে ধূলি
আগাইয়া যাবে বজ্র মুঠিতে বিজয়-পতাকা তুলি
স্কন্ধে বহিবে দায়িত্ব ভার—নহে ভিক্ষার ঝুলি
কই সে যুবক, কই সে জাতিস্মর
তারই আশাপথ চাহিয়া রয়েছি সকল দুঃখ ভুলি
হৃদয় মথিয়া উঠিছে কাতর স্বর।

যে দেশ কপিল, গোপাল, ধর্মপাল, চৈতন্য, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, প্রভৃতির মহিমায় সমুজ্জ্বল, আমার আশা আছে আবার সে দেশে দেখা দেবে নূতন যুগের নূতন কর্মবীর। নূতন সূর্যোদয় হবে আবার নবদিগন্তে।"

তুমুল করতালির মধ্যে দিবস অবতরণ করল মঞ্চ থেকে। দিবসের সহপাঠী এবং অনুরাগীবৃন্দ দিবসের বক্তৃতায় আনন্দিত হয়েছিল খুব কিন্তু বিস্মিত হয় নি। তারা এইরকমই প্রত্যাশা করেছিল কিছু একটা।

বিস্মিত হয়েছিলেন সূর্যকান্ত। দিবস যে এমন বক্তৃতা করতে পারে তা তাঁর ধারণার অতীত ছিল। কিন্তু যাঁর বিস্ময় সীমা অতিক্রম করে' গিয়েছিল, সত্যিসত্যিই চমৎকৃত হয়েছিলেন যিনি তিনি হচ্ছেন হরিদাস বাবু দিবসের মনিব। প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে তিনিও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন এই মজলিসে। প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে বরাবরই তিনি নিমন্ত্রিত হন, কিন্তু চাকরির জন্য বাইরে থাকতে হয়েছে এতদিন, নবযুগের ছাত্র-ছাত্রীদের সভায় যোগদান করবার সুযোগ হয়নি। ঈষৎ অবজ্ঞা মিশ্রিত কৌতূহল ভরেই আজ এসেছিলেন তিনি এই সভায়। এই সভাতে আসবেন বলেই তিনি নব-নিযুক্ত চাকর দিবুকে জুতোটা পরিষ্কার করতে দিয়েছিলেন একটু আগে। সেই দিবুই দিবস চৌধুরি, আজকের সভার সভাপতি!...সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। দিবুকে দেখে কেমন একটু সন্দেহ হয়েছিল তাঁর গোড়াতেই। সাধারণ লোক হ'লে তিনি হুড়মুড় করে' এগিয়ে গিয়ে দিবসকে আবেগভরে আলিঙ্গন করে নাটকীয় কাণ্ড করে' বসতেন একটা। কিন্তু তিনি তা করলেন না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কেবল। তাঁর মনে হল তিনি যে দিবসের সত্য পরিচয়টা জানতে পেয়েছেন এটা এখন সাড়ম্বরে ঘোষণা করা ঠিক হবে না। তার তপস্যায় বাধা সৃষ্টি করা হবে তা করলে। ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

...দিবসও তার বর্তমান জীবনের কথা কাউকে বলল না। সে কেন কলেজে আসছে না দু' একজন বন্ধু এ প্রশ্ন তাকে যে না করেছিল তা নয় (নিজেকে জাহির করবার যথেষ্ট সুযোগ সে পেয়েছিল) কিন্তু মুচকি হেসে প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেল সে। নবার্জিত কৃতিত্বের গৌরবটা মনে মনে যতই সে উপভোগ করছিল ততই তার ভয় হচ্ছিল খবরটা যেন তার ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে। নব গর্ভিণী তার নবজাত ভ্রূণের বার্তাটা যে সংকোচ সহকারে গোপন রাখতে চায়

সেই ধরণেরই একটা সকোচ হচ্ছিল তার। তবু সে একবার উৎসুক নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখলে চারদিকে রঙ্গনা কোথা গেল। ভিড়ের মধ্যে কোথায় আত্মগোপন করল সে সহসা ? কেমন যেন একটা সশংক প্রত্যাশা তার মনে জাগতে লাগল যে রঙ্গনা যদি এ নিয়ে আলোচনা করতে চায় তাহলে হয়তো সে আত্মসম্বরণ করতে পারবে না, সব বলে ফেলবে।

...ফুটপাথে নেবে রঙ্গনার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল তার। রঙ্গনা কিন্তু কিছু বললে না। মুচকি হেসে আর একটি সঙ্গিনীর সঙ্গে গল্প করতে করতে চলে গেল।

তারপরই চোখে পড়ল মোটরটা, তাদের মোটরটা। ঘাড় ফিরিয়েই দেখতে পেল তার বাবা, সূর্য চৌধুরি, এগিয়ে আসছেন তার দিকে। সে-ও এগিয়ে গেল তাড়াতাড়ি এবং হেঁট হয়ে প্রণাম করল, যেন কিছুই হয় নি। সূর্য চৌধুরিও এমন ভাবে চেয়ে রইলেন তার দিকে যেন কিছুই হয় নি। তারপরে মৃদু হেসে বললেন, "তোমার বক্তৃতাটা শুনলাম। বলেছ ভালই, তবে এ সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বলবার আছে। তোমার যদি আপত্তি না থাকে আলোচনা করতে পারি।"

শেষের কথাগুলো শুনে দিবস চকিতে চাইল একবার তাঁর মুখের দিকে। তাঁর মুখের যেন'কিছুই-হয়-নি' ভাবটা যে মেকি তা বুঝতে দেরি হল না তার।

"না, আপত্তি কি ?"—সংক্ষেপে উত্তর দিলে সে।

"তাহলে এস"।

মোটরে গিয়ে উঠলেন এবং একটু ইতস্তত করবার পর দিবসকেও গিয়ে উঠে বসতে হল। মোটর ছেড়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে।

সূর্য চৌধুরি বললেন, "তোমার বক্তৃতাটা শুনতে বেশ লাগল। কিন্তু তোমার বক্তৃতায় যুক্তির চেয়ে সেন্টিমেন্টই বেশি আছে।"

দিবস সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পিতার দিকে চাইল।

সূর্যকান্ত বললেন, "স্ট্রাগল্ ফর এগজিস্টেন্সে আশা করি বিশ্বাস কর। বাঁচবার জন্যে প্রত্যেককে অহরহ যুদ্ধ করতে হচ্ছে আশা করি এ কথাটা মান তুমি ?"

"হ্যাঁ, তা মানি বই কি !"

"তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এটাও তোমাকে মানতে হবে যে প্রত্যেক যোদ্ধার উচিত তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করা, যে করে না সে বোকা।"

দিবস যদিও বুঝতে পারছিল যে তার বাবা কোন্ দিকে তাকে নিয়ে যাচ্ছেন তবু তাকে বলতে হল—"তা-ও মানি।"

"অপদার্থ বোকা লোকের পক্ষে পেশী সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র হতে পারে কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র পেশী নয়, বুদ্ধি। সুতরাং ওই বুদ্ধি চালনা করেই বাঁচবার চেষ্টা করা তার পক্ষে সঙ্গত হবে, পেশী চালনা করে' নয়। তুমি দু' একদিন শখ করে রিক্শ টেনে বা মোট বয়ে দেখতে পার কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে যে ও পথ তোমার নয়।"

এ যুক্তির সঙ্গে দিবসের বিরোধ থাকবার কথা নয়, বিরোধ ছিলও না। কিন্তু তর্কে পরাজিত হয়ে অপ্রতিভ হয়ে যাবার ছেলে সে নয়, তাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"কিন্তু যুগ বদলেছে, একজন লোক বুদ্ধির প্যাঁচে ফেলে অসংখ্য লোককে এক্স্‌প্লয়েট্ করবে তা এ যুগের নীতি নয়। সনাতন ভারতবর্ষের আদর্শও নয়।"

একটু হেসে সূর্য চৌধুরি বললেন, "দেখ এক্স্‌প্লয়েট্ কথাটা তোমরা আজকাল এমনভাবে ব্যবহার করছ যেন ওটা একটা কোন লোক-বিশেষের বা শ্রেণী-বিশেষেরই একচেটে অস্ত্র। আসল কথা হচ্ছে প্রত্যেকেই এক্স্‌প্লয়টার, প্রত্যেকেই এক্স্‌প্লয়টেড। অপরকে শোষণ

না করে বাঁচা যায় না। কেউ বাঁচতে পারে না। বাঘ এক্স্‌প্লয়েট্ করে থাবার জোরে, মানুষ করে বুদ্ধির জোরে, আর ব্যাটিরিয়ারা করে তাদের সূক্ষ্মতার জোরে, তাদের সংখ্যার জোরে। আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওই কুলিরা কি আমাদের এক্স্‌প্লয়েট করছে না? তাদের শক্তি পেশীতে। সেইটেরই পুরো সুযোগ নিচ্ছে তারা। সার্জনের ছুরি আর মজুরের কাটারি একই জিনিসের দুই রূপ। কিন্তু প্রতিভাবান ডাক্তার কি কাটারি হাতে করে কাট কেটে বেড়াবে, না, সেটা মানাবে তাকে? প্রতিভার কি কোনও কদরই থাকবে না এ যুগে বলতে চাও?"

"নিশ্চই থাকবে। সত্যিকার কদর তো প্রতিভারই থাকবে। কিন্তু এ যুগের প্রতিভাবানেরা প্রতিভাকে বিক্রি করবে না সামান্য পণ্যের মতো। সমাজের হিতার্থে তা দান করবে এবং সেইজন্যে সত্যিকার মর্যাদা হবে তার।"

"কিন্তু সেই প্রতিভাবানটি বাঁচবেন কি করে?"

"আর পাঁচজনের মতো সহজ সরল পরিশ্রম করে'। তাছাড়া সত্যিকার প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সমাজই উন্মুখ হয়ে থাকবে।"

"সে সমাজ আর নেই, অদূর ভবিষ্যতে গড়ে উঠবার সম্ভাবনাও নেই। ওসব শুনতে বেশ ভাল কিন্তু কার্যকালে কাজে লাগে না। বহুযুগ আগে আমাদের দেশের মুনি ঋষিরাও আদর্শ ব্রাহ্মণত্বের স্বপ্ন দেখেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেকে নি। প্রাচীন গ্রীসে প্লেটোও দেখেছিলেন অনেক স্বপ্ন, 'ইউটোপিয়া' পড়েছ আশা করি, কিন্তু ওসব স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। থেকে যাবেও চিরকাল।"

"হয়তো যাবে, কিন্তু চেষ্টা করতে হবে যাতে না যায়। স্বপ্নকে সফল করবার চেষ্টাই তো মনুষ্যত্ব। এ যুগে আবার আমরা একস্‌পেরিমেণ্ট করে' দেখতে চাই যে স্বপ্নকে সফল করা যায় কি না।

মানুষের অনেক স্বপ্ন সফল হয়েছে বই কি। মানুষ একদিন আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখেছিল আজ সে সত্যি সত্যি উড়ছে।"

মোটরটা যে বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে তা দিবসের খেয়াল ছিল না, বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে খেয়াল হল। সূর্য চৌধুরি আর কোনও কথা না বলে নেমে পড়লেন। বস্তুত কথা বলবার মতো মানসিক অবস্থা তাঁর ছিল না। মোটরটা বাড়ির সামনে এসে থামতেই আশা-আংশকার যে ধাক্কটা যুগপৎ মনে লাগল তার আভাস মুখভাবে যাতে প্রকাশ না পায় সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন তিনি প্রাণপণে দিবসের দিকে চাইতে সাহস হচ্ছিল না। মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

দিবসও গাড়ি থেকে নেবেছিল। সে এগিয়ে এসে প্রণাম করে বলল, "আমি এবার যাই তাহলে!"

নিদারুণ চেষ্টায় মুখে একটু হাসি টেনে এনে সূর্যকান্ত বললেন, "তুমি ভেতরে আসবে না ? তোমার একস্‌পেরিমেন্ট তো এখানে থেকেও করতে পার ?"

"না তা করা যায় না। আমি যা করতে চাইছি তা প্রাসাদে বাস করে' করা সম্ভব নয়।"

দিবস চলে গেল। তার প্রস্থান পথের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন সূর্য চৌধুরি। তাঁর একবার মনে হল ব্রজর কথাটা পাড়লে হ'ত, কিন্তু মনে হওয়ার সঙ্গে আর একটা কথা মনে হল তাঁর এবং ব্রজর কথা না পাড়ার আপশোষটা আর রইল না। ব্রজর কথা শুনে সে যদি আসত তাহলে অপমানিত বোধ করতেন তিনি। তাঁর চেয়ে ব্রজ দিবসের কাছে বড় হবে এ তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু হয়তো ব্রজই দিবসের কাছে বড়—কথাটা মনে হওয়া মাত্র ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে গেল তার। তিনি ফুটপাথ থেকে ঘুরে কড়া নাড়তে গিয়ে দেখেন কপাট খোলাই রয়েছে। একটু

বিস্মিত হয়ে ভিতরে ঢুকলেন তিনি। ঢুকেই দেখা হয়ে গেল ব্রজর সঙ্গে।

"কপাটটা খুলে রেখেছ যে? যা চুরি হচ্ছে—"

"তোমরা আসবে বলেই খুলেছি এক্ষুনি। চায়ের জলটা বসাতে গিয়েছিলুম। দিবু কই?"

কিছু না বলে' সূর্যকান্ত বৈঠকখানায় ঢুকলেন।

"কলেজে ওদের সভায় যাও নি তুমি?"

"গিয়েছিলাম।"

"দিবু ছিল না?"

"ছিল। আমার সঙ্গে গাড়ি করে' এসেও ছিল। কিন্তু ভিতরে ঢুকতে চাইল না, চলে গেল।"

"আর তুমি অমনি যেতে দিলে! আমাকে ডাকলে না কেন?"

সূর্যকান্তের ভ্রূ আর একটু কুঞ্চিত হয়ে গেল। কিছু না বলে' উপরে উঠে গেলেন তিনি। দিবস বক্তৃতায় গীতার যে শ্লোকটা উদ্ধৃত করেছিল সেইটে মনে পড়ল একবার। ভাবলেন—নাঃ, আসক্তিটাই যত অনর্থের মূল। ওটা ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আরাম কেদারায় যে ভাবে তিনি শুয়ে পড়লেন তাতে মনে হ'ল না যে গীতার উক্ত শ্লোক থেকে তিনি শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছেন, বরং মনে হল তাঁর মেরুদণ্ডটাই বুঝি ভেঙ্গে গেছে এবং সেই যন্ত্রণাটা তিনি চাপতে চেষ্টা করছেন।

দিবসও আত্মবিশ্লেষণ করতে করতে পথ হাঁটছিল। আসক্তির কথা সে-ও ভাবছিল। বাবার ডাকে গেল না কেন সে? প্রাসাদে বাস করে' এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করা যাবে না এটা কি সত্য কথা? প্রাসাদটা তো বড় কথা নয়, প্রাসাদের আসক্তিটাই বড় কথা।

গীতাতেই তো আছে সুখেষু বিগতস্পৃহ হতে পারলেই,—কিন্তু না, তখনই তার আবার মনে হল, 'দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা' হওয়াটাই আগে দরকার; বিশেষত আজকাল ; তাছাড়া যে আদর্শ দেখাতে চায় সে, তা প্রাসাদে বসে' হবে না। স্বয়ং জনকও যদি এ যুগে জন্মাতেন তাহলে তাঁর পক্ষেও খোলার ঘরে যাওয়া উচিত হত। কিন্তু যে কথাটা সে ভাবছিল না, যা তার অজ্ঞাতসারেই তার মনে কৃচ্ছ্রসাধনের প্রেরণা জোগাচ্ছিল তা গীতা নয়, রঙ্গনা।

রঙ্গনা মিটিং থেকে গিয়েছিল তার এক বান্ধবীর বাড়ি, গিরিডি যাওয়ার দিনটা কবে ঠিক হল জানবার জন্যে। সেখানে থেকে আবার গিয়েছিল হস্টেল। হস্টেল থেকে ফিরছিল সে আর একটি বান্ধবীর সঙ্গে। এই বান্ধবীটিও দিবসের বক্তৃতা শুনেছিল এবং সেই আলোচনাই হচ্ছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে হঠাৎ বান্ধবীটি বলে উঠল "অনেকদিন আগে রম্যাঁ রলাঁর 'I will not rest' বইটা পড়ে যে রকম আনন্দ পেয়েছিলাম আজ দিবসবাবুর বক্তৃতাটা শুনে সেই রকম আনন্দ পাওয়া গেল।"

চকিতে রঙ্গনার মনে পড়ে গেল দিবসের খোলার ঘরের ছবিটা। শেলফে যে ক'খানা বই ছিল তার মধ্যে 'I will not rest' বইটাও সে দেখেছিল। বইটার সম্বন্ধে তখন তার কোনও কৌতূহল হয় নি, এখন হল।

"'I will not rest' বইটা তুই পড়েছিস না কি ?"

"হ্যাঁ, অপূর্ব বই ! না পড়ে থাকিস তো পড়িস।"

হঠাৎ রঙ্গনা যেন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে পড়ল দিবসের ঘরে যাওয়ার আর একটা ওজুহাত পেয়ে। পরমুহূর্তেই কিন্তু আনন্দের সূর্যকে ঢেকে দিলে বিষাদের মেঘে। মনে পড়ল মামা তার বিয়ের সম্বন্ধ করছেন,

"রঙ্গনা এখনও কলেজ থেকে ফিরল না কেন বুঝতে পারছি না। অন্য দিন তো বিকেলেই চলে আসে।"

মিটিংয়ের কথা গহনচাঁদ জানতেন না।

"আয়েগী অভি।"

"এখন তো তোমরা বাসায় যাবে?"

"জী হাঁ।"

"আচ্ছা, এস তাহলে। আমি এবার পূজোয় বসি। তুমি অপেক্ষা করবে না কি রঙ্গনার জন্যে?"

ঊর্মির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"না, আমিও যাই।"

সে যে নাচটা ঠিক মতো পেরেছে কিরণকে এই খবরটা দেবার জন্যে মনে মনে ছটফট করছিল সে।

সীতারাম, রমজান, ঊর্মি চলে গেল। চুপ করে' বসে রইলেন গহনচাঁদ খানিকক্ষণ। তারপর গুণ গুণ করে গান ধরলেন—

"কস্তূরিকা চন্দন লেপনায়ৈ, শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়
সৎ কুন্তলায়ৈ ফণি কুণ্ডলায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়!"

গান কিন্তু শেষ হল না, চুনীলাল এসে ঢুকল।

"এখন টাকাটা জোগাড় করতে পারলেই শুভকার্যটি হয়ে যায়। কাশীতে লিখেছেন আপনি?"

"বিশ্বনাথ কথককে লিখেছি।"

"উত্তর আসবার সময় হয় নি এখনও বোধ হয়?"

"না। এই সেদিনই তো লিখেছি।"

রঙ্গনা ঢুকল এসে। ঢুকে ভিতরে যাচ্ছিল এমন সময় চুনীলালের কথাগুলো তার কানে গেল।

"কাল যদি উত্তর না আসে তো আর একবার তাড়া দিতে হবে।

বিয়ে যখন দিতেই হবে তখন একরকম পাত্র হাতছাড়া করা অনুচিত।”

“কার বিয়ে?—ঘাড় বেঁকিয়ে জিগ্যেস করলে রঙ্গনা।

“আবার কার, তোর”—হেসে গহনচাঁদ বললেন। রঙ্গনা চুপ করে’ দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার সমস্ত চোখমুখ কেমন যেন জ্বালা করতে লাগল। তারপর বলে’ ফেলল—

“যারা ওরকম পণ দাবী করে তাদের বাড়িতে বিয়ে করব না।”

বলেই গটগট করে’ চলে গেল সে বাড়ির ভিতরে।

“দেখ দেখ, পাগলির কাণ্ড দেখ একবার!”

চুনীলালের দিকে হাস্যপ্রদীপ্ত দৃষ্টিতে এক নজর চেয়ে গহনচাঁদ তার অনুসরণ করলেন। চুনীলাল ভ্রূকুঞ্চিত করে’ ভাবলো একটু। রঙ্গনার এই উক্তি সে প্রত্যাশা করে নি। তার ব্যবসায়ের মগ্ন তরীকে যে সব রশিরশা বেঁধে সে টেনে তোলবার চেষ্টা করছিল তার ভাগ্নীর আচরণে যে সে সব ছিঁড়ে যাবে এও তার কল্পনাতীত ছিল। তবু সে ভ্রূকুঞ্চিত করে’ ভাবলে একটু। ঈশপের এক চক্ষু হরিণের গল্পটা তার মনে পড়ল একবার। সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত আর একটা কথাও মনে পড়ল, ‘বিয়ের কথা হলেই আজকালকার মেয়েরা ও রকম বলেই থাকে, ওটা একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে’—এ কথা মনে হওয়া মাত্র তার কুঞ্চিত ভ্রূ মসৃণ হয়ে গেল।

কর্মক্লান্ত কিরণ বাড়ি ফিরে আহারাদি শেষ করে চুপ করে’ বসেছিল। আর একটা কবিতা গুঞ্জন তুলেছিল তার মনে—

কার সুরে ওগো কার
তিমির রজনী শেষে
খুলিছে উষার দ্বার।

তার সত্যিই যেন মনে হচ্ছিল—কেন মনে হচ্ছিল তা সে বলতে পারত না যদিও—কিন্তু মনে হচ্ছিল যে তার তিমির রজনী এবার বোধ হয় শেষ হবে। দৈনন্দিন এই গ্লানির অবসান হয়ে দেখা দেবে আনন্দ। কল্পনা করতে ভাল লাগছিল—বাধ্য হয়ে এই যে কঠিন কর্মশৃঙ্খল তাকে পরতে হয়েছে, যার মধ্যে কোনও আনন্দ নেই, বৈচিত্র্য নেই, যা উদ্বুদ্ধ করে না, পরিপূর্ণ করে না, যা কেবল প্রাণহীন যান্ত্রিক পুনরাবৃতি মাত্র—সে শৃঙ্খল একদিন খসে যাবে। স্বাধীন চিত্তে এমন একটা লোকে সে উত্তীর্ণ হবে যেখানে কর্ম ক্লেশদায়ক নয়, আনন্দদায়ক। কুসুমের বিকাশের মতো, আলোকের উন্মেষের মতো যা স্বাভাবিক এবং সুন্দর। কল্পনানেত্রে এই অপরূপ সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করে' সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। একটু দূরে পথের বাঁকে সেই সম্ভাবনাটা যেন দাঁড়িয়ে আছে মনে হল, আর একটু এগিয়ে গেলেই দেখা হবে, চিনতে পারবে। এটা যে অলীক কল্পনা মাত্র একথাও সে যে অনুভব করছিল না তা নয় কিন্তু তাকে নিরুৎসাহিত করছিল না। বরং তার মনে হচ্ছিল এই কল্পনাকে আশ্রয় করেই তো ভারতবর্ষের সভ্যতা দৈনন্দিন বাস্তবের ঘূর্ণাবর্তে ডুবে যায়নি, ওই কল্পনার ভেলা অবলম্বন করেই বহু শতাব্দী ধরে' ভেসে আছি আমরা। আত্মা, পরলোক, কর্মফল, সবই বহুবর্ণের বিচিত্র কল্পনা। সে কল্পনা সত্যেও রূপান্তরিত হয়েছে অনেকের উপলব্ধিতে। তারই বা হবে না কেন? নিবিষ্ট চিত্তে বসে' কবিতা লিখতে লাগল সে।

"কিরণ দা, ঘুমিয়েছেন না কি?"

দড়াম করে' কপাট খুলে ঢুকল ঊর্মি।

"ঘুমোন নি? জানেন, আমার ময়ূর নাচটা প্রায় হয়ে এসেছে। সিনেমা ডিরেকটারকেও দেখাব এই নাচটা একদিন, এটা যদি কোথাও ঢুকিয়ে দিতে পারেন তিনি—লিখছিলেন না কি—আর একটা গান না

কি? হ্যাঁ, আমি সেই গ্রামোফন কোম্পানির ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেছি, তিনি গানটা নিয়েছেন, তবে রঙ্গনাকে দিয়ে গাওয়াবেন না বোধ হয়, তাঁর আবার কে একজন পেটোয়া গাইয়ে আছে, তাকে দেবেন। এ গানটাও দিন, রঙ্গনাকে দেব—নিই?”

এক ঝলক হাওয়ার মতো এসে উর্মি যেন সব এলোমেলো করে দিলে নিমেষের মধ্যে। নির্জনে কিরণের মনের মেঘে যে ইন্দ্রধনু ফুটে উঠেছিল মেঘসুদ্ধ তা উড়ে গেল কোথায়। একটু হেসে কিরণ বললে—“নেবে? নাও।”

“আপনি বাঁশী শিখতে গেলেন না গহনচাঁদবাবুর কাছে?”

“সময় কই?”

দিবসের কাছে কিরণ যে কারণটা দেখিয়েছিল তা উর্মিকে বলতে পারলে না। তার মনে হতে লাগল উর্মির কাছে তা বলা যাবে না। আর একটা কারণও দেখালে সে—“ওখানে যা ভিড় হচ্ছে তাতে ওখানে আমার ভালও লাগবে না! তুমি ওই ভীড়ের মধ্যেই নাচছ কি করে?”

“আমাকে উনি আলাদা শেখান, তাই তো এত রাত্রে ফিরছি। লোক খুব চমৎকার! আপনাকেও আলাদা শেখাবেন, গিয়েই দেখুন না।”

কিরণ চুপ করে’ রইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণী-বাহিনী নদী ক্রমে ক্রমে গতিপথ পরিবর্তন করতে করতে একদা যেমন উত্তর-বাহিনী হয়ে পড়ে দিবসেরও তাই হল। পাহাড় থেকে নদী যখন নামে তখন সে ঢালু পথই অনুসরণ করে। পথে কোন বাধা থাকলে সে বাধাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কিংবা অতিক্রম করে। দুরতি-ক্রম্য হলে সে পথ পরিবর্তন করে, ঘুরে অন্য পথে যায়। এইটেই সাধারণত ঘটে। কিন্তু নদীর সম্মুখ গতিতে আর এক ধরণের বাধাও ঘটে মাঝে মাঝে সম্মুখে যদি গহ্বর থাকে। সমুদ্র-মুখিনী নদী হঠাৎ গর্তে পড়ে যায় কিছু কালের জন্য এবং তার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে কিছুকাল। এই দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটা দিবসের জীবনে ঘটছিল তার অজ্ঞাতসারেই। স্বকীয় পৌরুষ বলে প্রাচীন প্রথার পাষাণ প্রাচীর ভেদ করে' সে বেরিয়েছিল নিজের আদর্শ অনুসরণ করে। আদর্শ অনুসারেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিতও করেছিল সে কর্মজগতে। একটা প্রাইভেট ট্যুশনি জুটে যাওয়াতে অবস্থাও একটু সচ্ছল হবার আশা হয়েছিল (সেদিন বক্তৃতা দিয়ে ফিরেই সে চিঠি পেয়েছিল একটি ছেলেকে অঙ্ক পড়াবার জন্যে, মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা করে' দিতে রাজি আছেন একজন); যে উত্তেজনার আবেগ নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তা মন্দীভূত হয়ে যেত হয়তো কাল-ক্রমে, স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে অর্থোপার্জন করার কৃতিত্বটা একঘেয়ে কর্মবন্ধনে পরিণত হয়ে গ্লানিকর হয়েও উঠত হয়তো, অবশেষে হয়তো সে অপেক্ষমান সূর্য চৌধুরির ঔৎসুক্যকে ধূলিসাৎ এবং পিতৃস্নেহকে পরিতৃপ্ত করে' বাড়িতেই ফিরে যেত শেষ পর্যন্ত, যদি তার কল্পনা নূতন একটা উদ্দীপনা না পেত। রঙ্গনাকে ঘিরে তার মন স্বপ্নজাল রচনা করতে লাগল এইটুকু বললেই তার মনের

অবস্থাটা অবশ্য ঠিক বলা হবে না। 'স্বপ্নজাল' প্রভৃতি কথা ব্যবহার করলেই যা মনে হওয়া স্বাভাবিক তা এক্ষেত্রেও ছিল, কিন্তু তাছাড়া আরও কিছু ছিল। সাধারণ যুবক যে জাতীয় ঐশ্বর্য আস্ফালন করে' প্রণয়িনীর হৃদয় হরণ করতে চায় সে জাতীয় ঐশ্বর্য দিবসের যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সেটাকে সে আস্ফালন করতে চাইছিল না। সে তার নবার্জিত ঐশ্বর্যে মুগ্ধ করতে চাইছিল রঙ্গনাকে। সে চাইছিল মেসের চাকর দিবস চৌধুরির গলাতেই মাল্য দান করবার জন্যে রঙ্গনা উৎসুক হোক। তাই সে সেদিন কিরণকে অনুরোধ করেছিল তার আসল পরিচয়টা সে যেন গহনচাঁদবাবুর কাছে বা রঙ্গনার কাছে বলে' না দেয়। রঙ্গনাকে পাবার জন্যে ততটা নয়, রঙ্গনা তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছে কি না দেখবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল সে। যে আদর্শের জন্য সে নিজে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে সেই আদর্শে বিশ্বাসী একজন সঙ্গিনীকে সে আবিষ্কার করতে চায় রঙ্গনার মধ্যে। তার বিজ্ঞানী রিসার্চ-পটু মন এই উত্তেজনায় যে বিচিত্র স্বপ্নজাল বয়নে প্রবৃত্ত হল তা বিচিত্রতর হয়ে উঠতে লাগল পরবর্তী ঘটনা পরম্পরায়। সে ভুলে গেল কিছুদিনের জন্য কি উদ্দেশ্য নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল প্রথম দিন এবং তার এই আত্মবিস্মৃতির খবরটা কিছুদিন পরে পল্লবিত হয়ে যে গোবিন্দ সাণ্ডেলের পক্ষকে শক্তি জোগাতে পারে এ কথাও তার মনে হল না একবারও। মনে হওয়ার কথা নয়, কারণ সূর্য চৌধুরি যে তাঁর বন্ধুর সঙ্গে দ্বৈরথে নেমেছেন এ খবর অজ্ঞাত ছিল তার কাছে। গোবিন্দ সাণ্ডেল অবশ্য খবরটা পেয়েছিলেন কয়েকদিন পরে জগু সেনের মারফত। জগু সেন দিবস আর রঙ্গনাকে না কি রাত বারোটার সময় সিনেমা থেকে রোমিও জুলিয়েট দেখে ফিরতে দেখেছিলেন এবং—যাক্, যথাসময়েই ঘটনাটা বলা যাবে।

দিবস কিন্তু যা করবার মনে মনেই করছিল। সরোদ শেখবার

ওজুহাতে সে অনায়াসেই গহনচাঁদবাবুর বাড়ি যেতে পারত, কিন্তু যায় নি। তার কেমন যেন ভয় করছিল, মনে হচ্ছিল তার তাসের সাজানো ঘরটা একটু ছুঁলেই বোধ হয় পড়ে যাবে। দূরে থেকেই সে উপভোগ করছিল সেটা এবং আরও কিছুদিন হয়তো করত রঙ্গনা নিজেই যদি না এসে পড়ত তার বাসায়। আর একটা যোগাযোগও গেল। রঙ্গনা যখন এল তখন দিবস বাড়িতে ছিল না, কিন্তু সৌদামিনী ছিল। সৌদামিনীর মুখে দিবসের সব কথা শুনে (এমন কি দিবস যে সেই ঝাঁকড়া-চুল-ওলা লোকটাকে টাকা দিয়ে পটলিকে উদ্ধার করেছে একথাও সাড়ম্বরে বলেছিল সৌদামিনী) রঙ্গনার মনে যা হয়েছিল তা অবর্ণনীয় নয়, অনেক কবিই তা বর্ণনা করেছেন সালংকারে। রঙ্গনার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তার তৃষ্ণার্ত মন অপ্রত্যাশিতভাবে পরিষ্কার পাত্রে নির্মল জল দেখে অবাক হয়ে গেল, এ যুগে যে এরকম সম্ভব তা বিশ্বাস করতেই পারছিল না সে প্রথমে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত করতে হল।

....রঙ্গনা যখন এসেছিল তখন কাউকেই দেখতে পায় নি সে। শুধু দেখলে দিবসের ঘরে তালাটা ঝুলছে। সোজা চলে গেল উঠোনের দিকে এবং গিয়েই দেখতে পেলে হাঁসটাকে। হাঁসটাকে দেখবার জন্যেই সে উঠোনের দিকে গিয়েছিল, ওই রাজহংসটার সঙ্গে দিবসকে সে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িয়ে ফেলেছিল অদ্ভুতভাবে। হাঁসটা উঠোনেই চরছিল, রঙ্গনাকে দেখে সে কলরব করে' উঠল। রঙ্গনা তার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে একটু আদর করতে পারলে আনন্দিত হ'ত, কিন্তু হাঁসটা কেবল সরে' সরে' যেতে লাগল, দু'একবার গলা বাড়িয়ে কামড়াতেও এল তাকে। রঙ্গনাও ছাড়বার পাত্রী নয়, নানাভাবে কাছে যাবার চেষ্টা করতে লাগল সে। হাঁসের চিৎকার শুনেই সৌদামিনী পটলির ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পটলির রুগ্ন স্বামীর অসুখটা বেড়েছিল, তার কাছেই ছিল সে।

"ও, আপনি—।"

"দিবসবাবুর কাছে একটা বই নিতে এসেছিলাম। তাঁর ঘরে দেখলাম তালা বন্ধ।"

"সে এখনই আসবে, তাকে ডাকতে পাঠিয়েছি, পটলির স্বামীর অসুখটা বেড়েছে আজ দুপুর থেকে—।"

"পটলি কে?"

"চলুন সব বলছি। ঘরেই চলুন, চাবি আছে আমার কাছে—।"

হরিদাসবাবু চুপ করে' ছিলেন। তিনি যে দিবসের আসল পরিচয়টা জানতে পেরেছেন তা দিবসকে তো বলেনই নি, মেসের আর কাউকেও বলেন নি। কোনও গুপ্তস্থানে এক হাঁড়ি মোহর আবিষ্কার করে' সাধারণ লোকের যে মনোভাব হয় তাঁরও তাই হচ্ছিল। গুপ্ত স্থানটার উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে আশেপাশে তিনি ঘোরাফেরা করছিলেন মনে মনে। হাঁড়িটা ছুঁতেও সাহস হচ্ছিল না তাঁর। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ছোঁবার সুযোগও তিনি পাচ্ছিলেন না। দিবসকে একা পাওয়া যায় না। সে ঠিক নিয়মিত সময়ে আসে, নীরবে কাজকর্ম করে আবার নিয়মিত সময়ে কর্তব্য শেষ করে' চলে যায়। যতই দেখছিলেন ততই মুগ্ধ হচ্ছিলেন। মুখবন্ধকরা হাঁড়ির ভিতর পোলাও যেমন ভিতরে ভিতরে গুমে সিদ্ধ হতে থাকে তাঁরও অবস্থা তাই হয়েছিল অনেকটা। দিবসের সঙ্গে আলাপ করতে ঔৎসুক্য খুবই হচ্ছিল কিন্তু সাহস পাচ্ছিলেন না, সুযোগও ঘটছিল না। তা ছাড়া তাঁর মনে হচ্ছিল আলাপ করলেই বোধ হয় সব নষ্ট হয়ে যাবে, গোপনতার অন্তরালে যে মহজ্জীবন গড়ে' উঠছে ধীরে ধীরে, প্রকাশ্যে তাকে নিয়ে টানাটানি করতে গেলেই তা খেলো হয়ে যাবে। আর একটা মুশকিলেও পড়েছিলেন হরিদাসবাবু। দিবসকে দিয়ে জুতো বুরুষ করানো প্রভৃতি নোংরা কাজগুলো করাতে

পারছিলেন না তিনি। এমন কি নিজের কাপড়টাও নিজের হাতে কেচে নিতে হচ্ছিল তাঁকে।

......সেদিন বিকেলে হরিদাস বসে' দাড়ি কামাচ্ছিলেন, কাগজ পড়ছিলেন গোবর্ধনবাবু, অঘোরবাবু ফাটকা মার্কেট থেকে ফেরেন নি তখনও, ধূর্জটিবাবু বাড়ি ছিলেন না। তাঁকে কে যেন বলেছিল যে রাধাবাজারের একটা গলিতে ইটালিয়ান রজন পাওয়া যায়, সেই রজন ছড়ে লাগালে বেহালা থেকে চমৎকার আওয়াজ বের হয় নাকি। তারই সন্ধানে বেরিয়েছিলেন ভদ্রলোক। দিবস ঘরে ঢুকে দু'জনের পাশে দু'পেয়ালা চা রেখে গেল। হরিদাসবাবু আড়চোখে দিবসের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার শুধু। দিবসের দিকে সোজা চাইতেও আজকাল একটু ইতস্তত করেন তিনি। দিবস চলে গেলে মুখটি মুছে তিনি চা খেতে লাগলেন। হঠাৎ নজরে পড়ল গোবর্ধন চা খাচ্ছেন না, নীচের ঠোঁট দিয়ে উপরের ঠোঁটটাকে চেপে ভুরু কুঁচকে খবরের কাগজে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' বসে আছেন।

"গোবর্ধনবাবু, চাটুকু খেয়ে নিয়ে চিন্তা করুন। বল পাবেন। কি ভাবছেন কি ?"

"ভাবছি চিয়াংকাইশেক কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে সন্ধি করতে চাইছে কেন। পেছনে অত বড় খুঁটো ট্রুম্যান রয়েছে।"

দিবস আবার ঢুকল ছোট একখানা নূতন গামছা হাতে করে'।

"এই গামছাটা কিনেছি আপনার জন্যে।"

গামছাটা গোবর্ধনের হাতে দিলে সে।

"এঃ এটা যে বড্ড ছোট হল হে!"

"এরই দাম এক টাকা বলছে।"

গোবর্ধন স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ দিবসের মুখের দিকে, তারপর হরিদাসের দিকে চেয়ে বোমার মতো ফেটে পড়লেন—

"গোল্লায় যাবে সব। আজকের কাগজে আমাদের নেতাদের গরম গরম বক্তৃতাগুলো পড়ে' দেখো। একটা গামছার দাম কমাবার মুরোদ নেই, দামোদর বাঁধতে যাচ্ছেন ওঁরা!"

এমন সময় নিচে থেকে ঠাকুরের গলা শোনা গেল—"ও দিবু তোমাকে বাইরে থেকে কে ডাকছে, নেবে এস একবার—"

দিবস নেবে গেল। একটু পরে যখন ফিরে এল তখন শুনলে হরিদাসবাবু গোবর্ধনবাবুকে বলছেন—"আপনার স্কীমগুলো লিখে পাঠিয়ে দিন না সকলকে। চাটুকু খেয়ে নিন আগে।"

দিবস বলল, "আমি যে বাসায় থাকি সেখানে একটি অসুস্থ লোক আছে। তার অসুখটা বাড়াবাড়ি হওয়াতে ডাকতে এসেছে আমাকে। আমার ছুটি চাই একটু।"

"বেশ যাও, আমাকে এক প্যাকেট বিড়ি এনে দিয়ে যাও তাহলে।" —গোবর্ধন বললেন এবং বিড়ির পয়সা দিলেন।

দিবস চট করে' নিচে নেবে গেল আবার এবং বিড়ি নিয়ে এল এক প্যাকেট।

প্যাকেটটা হাতে করে গোবর্ধন হরিদাসবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "প্রাণ খুলে দুটো যে বিড়ি খাব তার পর্যন্ত উপায় নেই। ধরাবার আগেই বিড়িতে আগুন জ্বলছে। গোলাপ মার্কা এনেছ তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তাহলে যাই এবার?"

"যাও।"

দিবস চলে গেল। রাস্তায় নেবেই সে আগে গেল তার এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়িতে। একসঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। মেডিকেল স্কুল থেকে পাশ করে' সে বছর দুই হ'ল ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছে। তাকে গিয়ে সে বলল যে বিনা পয়সায় একটি রুগী দেখতে হবে এবং হয়তো বিনা পয়সায় ঔষুধও দিতে হবে। সৌরেন ডাক্তার লোক ভাল—

তাছাড়া দিবস চৌধুরির অনুরোধ—সে রাজি হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। তার গাড়ি চড়েই দিবস হাজির হল নিজের বাসায়।

রঙ্গনাকে দেখবে সে প্রত্যাশা করে নি।

"আপনার 'I will not rest' বইখানা চাইতে এসেছি যদি দু'চার দিনের জন্য পড়তে দেন তাহলে"—রঙ্গনা হেসে বললে।

"হ্যাঁ নিশ্চয় দেব। একটু অপেক্ষা করুন। ডাক্তারবাবু এসেছেন, এ ব্যাপারটা আগে সেরে ফেলি—"

সৌরেন ডাক্তার একটু বিস্মিত হয়েছিল। দিবসের সঙ্গে এ ধরণের বস্তির যোগাযোগ কি করে' যে সম্ভবপর হতে পারে তা সে বুঝতে পারছিল না। কিন্তু রঙ্গনা এবং সৌদামিনীর সামনে প্রশ্ন করাও সে সংগত মনে করল না।

রঙ্গনাও সকলের সঙ্গে পটলির ঘরে গিয়ে হাজির হল। অন্ধকার ঘর, একটিমাত্র জানলা। পটলির স্বামী জরাজীর্ণ, বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে যেন। নিষ্প্রভ কোটরগত চক্ষু। একটা ক্ষীণ 'উঃ' 'উঃ' শব্দ করে' চলেছে ক্রমাগত। সৌরেন ডাক্তার পরীক্ষা করে' বললে যক্ষ্মা হয়েছে।

"এঁর বিছানাটা জানলার কাছে নিয়ে গেলে ভাল হয়। আলো আর হাওয়া দরকার। আমার সঙ্গে কেউ একজন চলুক, আমি ঔষুধ যা লাগে দিয়ে দিচ্ছি।"

এই বলে সৌরেন ডাক্তার বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারপর দিবসের সঙ্গে কথা কইতে কইতে বড় রাস্তায় এসে পড়ল।

"তুমি এখানে কি করে' এলে বুঝতে পারছি না তো!"

"এক্স্পেরিমেণ্ট করছি একটা।"

"টী-বি নিয়ে?"

"বলব সে সব একদিন। আজ একটু ব্যস্ত আছি।"

"আচ্ছা।"

সৌরেন ডাক্তার পটলির ভাই বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। দিবস ফিরে আসতেই সৌদামিনী এবং গিরিবালা উৎসুক হয়ে উঠল ডাক্তার কি বলে' গেল শোনবার জন্য।

"যক্ষ্মা হয়েছে বললে।"

"তাহলে সঙীন ব্যাপার বল!"—সৌদামিনীর হাত গালে উঠল!

"তাতো বটেই। তবে ডাক্তারবাবু যথাসাধ্য করবেন বললেন।"

"ফি দিলে না?"

"ফি ওষুধের দাম কিছুই নেবে না। আমার বন্ধু একজন। বিছানাটা জানলার দিকে সরিয়ে দি চল।"

"বসন্ত আসুক। খাট সরাতে অন্তত চারজন লাগবে তো। আমি আর গিরিবালা না হয় একদিকে ধরব, তুমি আর বসন্ত আর এক দিকে ধোরো।"

দিবস রঙ্গনার দিকে ফিরে বললে, এই তো আর একজন রয়েছে।"

"নিশ্চয়, চলুন আমি ধরছি।"

চারজন ধরাধরি করে' খাটটা সরিয়ে দিলে জানলার কাছে। ব্যাপারটা কিছু নয়, কিন্তু এরই ফল হল সুদূর-প্রসারী। দিবস আর রঙ্গনাকে পাশাপাশি দেখে সৌদামিনীর অন্তরে যে কথাটি উদিত হল এবং যা সে একটু পরে নিম্নকণ্ঠে গিরিবালাকে বলল তা দৈবাৎ রঙ্গনারও কর্ণগোচর হওয়াতে সামান্য ঘটনাই অসামান্য হয়ে উঠল তার কাছে। যে মেঘটা বর্ণের অভাবে কালোই ছিল বরাবর হঠাৎ এক ঝলক রোদ লেগে তার গায়ে সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু ফুটে উঠল যেন। 'I will not rest' বইখানা নিয়ে রঙ্গনা দিবসকে বললে, "কই আপনি বাবার কাছে সরোদ শিখতে গেলেন না তো? আপনার বন্ধুটিও তো আসেন নি?"

"কাল যাব। কাল নয় পরশু।"

"কেন' কাল কি করবেন ?"

"কাল সেকেণ্ড শোয়ে 'রোমিও জুলিয়েট' দেখব মেট্রোতে।"

"ওমা, আমিও যে তাই ঠিক করেছি।"

"বেশ একসঙ্গে দেখা যাবে—থার্ডক্লাশে বসতে পারেন যদি।"

"তা পারব না। আপনার বক্তৃতাটা কিন্তু খুব ভাল লেগেছিল সেদিন। ও সম্বন্ধে দু'একটা কথা আলোচনা করবার আছে। এখন বোধ হয় আপনার সময় নেই ?"

"না। এখন চাকরি করতে যেতে হবে।"

রঙ্গনার মুখে মুচকি হাসি ফুটে উঠল। সৌদামিনীর কাছে দিবসের সমস্ত বিবরণ সে শুনেছিল।

"শখ করে' এ কৃচ্ছ্রসাধন কেন ?"

"শখ করে' কে বললে আপনাকে ?"

"সব শুনেছি আমি।"

বলেই সে হেসে বেরিয়ে গেল।

বেরিয়েই তার কানে গেল সৌদামিনী গিরিবালাকে নিম্নকণ্ঠে বলছে, "দুটিতে বেশ মানায় কিন্তু পাশাপাশি দাঁড়ালে।"

রঙ্গনা আর দাঁড়াল না, পিছু ফিরে চেয়েও দেখল না, সোজা বেরিয়ে চলে গেল। রজ্জুমুক্ত বেলুনের মতো তার মনটা অসীম আকাশে পাড়ি দিয়েছিল, তারই পিছু পিছু সে ছুটতে লাগল যেন। দিবসের সব কথা সে শুনেছিল সৌদামিনীর মুখে। বড়লোকের ছেলে হয়ে যে যে শখ করে' মেসে চাকরি করছে, পটলিকে রক্ষা করবার জন্যে সে যে পঁচাত্তর টাকা এনে দিয়েছে, সে যে অত্যন্ত অন্যমনস্ক, নিজের সম্বন্ধে তার যে কিছুমাত্র হুঁশ নেই এ সবই সে শুনেছিল এবং এই সবের সঙ্গে তার কাল্পনিক-আকাঙ্ক্ষা-বাস্তব-হতাশা-সমন্বিত জীবনের ছবিটাও মিলিয়ে সে দেখেছিল মনে মনে। কিন্তু এর বেশি আর কিছু করবার সাহস হয় নি

তার, এর পর তার মনে যে অস্পষ্ট কুজ্ঝটিকাটুকু ছিল সৌদামিনীর নিম্ন-কণ্ঠোচ্চারিত উক্ত কথাগুলির প্রভাবে সেটুকু সরে' গেল এবং সে যেন সেতু দেখতে পেল একটা। ক্ষণপরেই তার রাগ হল, ধিক্কার এল নিজের উপরই। মনে হল সে যেন উপযাচিকার মতো দিবসের দ্বারস্থ হয়েছে। মনে হওয়ামাত্র আত্মসম্মানের বর্মে নিজেকে আবৃত করে' 'I will not rest' বইখানাকে আরও জোরে চেপে ধরে' আরও দ্রুত-গতিতে হাঁটতে লাগল সে। বাবাকে কিংবা মামাকে না জানিয়ে এভাবে দিবসের বাসায় আসাটা যে অন্যায় হয়েছে একথাও মনে হল তার। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার মনে হল—দিবস চৌধুরি? কলেজের স্টুডেণ্টস্ গ্যাদারিংয়ে যখন বক্তৃতা করছিলেন তখন নিশ্চয়ই ভাল ছেলে। সৌদামিনী বলছিল আইন পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়েছেন না কি, খোঁজ করতে হবে তো। দিবসের কথাই ভাবতে ভাবতে (এবং মাঝে মাঝে সেজন্য লজ্জিত হয়ে) পথ চলতে লাগল সে। একটা রাস্তার মোড় ফিরতেই একজন সহপাঠিনীর সঙ্গে দেখা হল তার।

"কোথা চলেছিস রঙ্গনা?"

"বাড়ি। তুই কোথা গিয়েছিলি?"

"রোমিও জুলিয়েট দেখে ফিরছি। দেখেছিস? চমৎকার হয়েছে।"

"না, আমি পরে যাব।"

"কি বই ওটা?"

"রমাঁ রলাঁার 'I will not rest'"—বেশ একটু সগর্বেই উত্তর দিলে রঙ্গনা।

"দেখি।"

"আমার ভাই বাস এসে গেছে।"

রঙ্গনা বাসে উঠে পড়ল। আর হাঁটতে পারছিল না সে। মনে করেছিল হেঁটে যাবে হেঁটে আসবে, কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বাসটা

বেশ ফাঁকা ছিল। একটি খালি সীটের এক ধারে বসে' বইটা খুললে সে। খুলতেই কাগজ বেরিয়ে পড়ল একটা। তারই চিঠিখানা। প্রথম দিন দিবসের বাসায় গিয়ে যে চিঠিখানা সে লিখে রেখে এসেছিল সেইটেই পেজমার্ক করা ছিল। চিঠিখানার দিকে চেয়ে রঙ্গনার শরীরের রক্তস্রোত মুহূর্তের জন্যে থেমে দ্বিগুণবেগে বইতে লাগল পর-মুহূর্তে। করেছেন কি ভদ্রলোক! রঙ্গনা, রঙ্গনা, রঙ্গনা—চিঠিখানার আষ্টেপৃষ্ঠে ছোট বড় বাংলা ইংরেজি নানারকম অক্ষরে তার নামটা লিখেছেন। চিঠিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে। তারপর উঠে পড়ল হঠাৎ। অকস্মাৎ তার মনে হল বিলাসিতা করা উচিত নয়, হেঁটেই যাবে সে। পরের স্টপেজেই বাস থেকে নেবে পড়ল সে। নেবে আবার হাঁটতে সুরু করে' দিলে, কিন্তু আবার একটু পরেই থামতে হল তাকে। একটা ছবির দোকানের সামনে হংস ও দময়ন্তীর ছবিটা তাকে থামিয়ে দিলে যেন। কেমন যেন আবছা ভাবে তার মনে হল··· দিবসের হাঁসের ছবিটা মনে পড়ল।

"কত দাম ছবিটার ?"

"আড়াই টাকা।"

"দিন আমাকে।"

ছবিটা কিনে ফেলেই কিন্তু অনুতাপ হ'ল তার। এমনভাবে টাকা খরচ করাটা কি উচিত হচ্ছে? তারা যে গরীব এই কথা আবার প্রবলভাবে মনে পড়ল। মনে পড়ল তার বাবা তার বিয়ের পণ-সংগ্রহের জন্য কাশীর বাড়িটা বাঁধা দেবার আয়োজন করেছন। বিমর্ষ হয়ে গেল বেচারী। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার তার সমস্ত সত্তা বিদ্রোহ করে' উঠল। কেন এত দারিদ্র্য ? কেন সে যেমন ভাবে থাকতে চায় তেমন ভাবে থাকতে পারে না? দিবসবাবু সেদিন যে বক্তৃতায় বললেন—কিন্তু তার চিন্তাধারা ব্যাহত হ'ল ঊর্মির ডাকে।

"রঙ্গনাদি, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম কিরণদা'র এই গানটা নিয়ে। সুর দিয়ে দেবেন এটাতে ?"

"বেশ তো, চেষ্টা করব।"

গানটা নিয়ে দেখতে লাগল।

"আমি এখন তাহলে সিনেমা ডিরেকটারের কাছে যাই। আমার ময়ূর নাচটা দেখাই তাঁকে। এটা যদি তিনি ঢুকিয়ে দিতে পারেন—ওফ্, তাহলে হিট্ পিকচার হয়ে যাবে একখানা। ওই আমার বাস এল, আমি চলি তাহলে। কাল যাব আপনার কাছে।"

ঊর্মি চলে গেল। রঙ্গনা হাঁটতে লাগল আবার।

ব্রজ কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিল না।

সে রোজই একবার দিবসকে খুঁজতে বেরুত দুপুরের দিকে। দিবসের যতগুলি বন্ধুর ঠিকানা তার জানা ছিল প্রত্যেকের বাড়ি সে গিয়েছিল। ল'কলেজের গেটেও গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে দু' একদিন, যদি দৈবাৎ দেখা পেয়ে যায়। সূর্যকান্তর উপর আর তার আস্থা ছিল না, তা'ছাড়া সূর্যকান্তও যে কত গোঁয়ার তা তার চেয়ে বেশি কে জানে। ও ভাঙবে তবু মচকাবে না। গোবিন্দ সাণ্ডেলের উপরও হাড়ে চটা ছিল ব্রজ। তার ধারণা পিতাপুত্রের এই যে মনোমালিন্য ঘটেছে তার মূলে আছে ওই লোকটি। সকাল বিকেল এসে আজকালকার ছেলেদের নামে কুটুস্ কুটুস্ করে' চিমটি কেটে কেটে কথা বলাই ওর কাজ। ব্রজর ধারণা সেকালকার ছেলেদের তুলনায় আজকালকার ছেলেরা রত্ন। ব্রজরও বয়স কম হয় নি, সেকাল একাল দু'কালই দেখেছে সে। না, গোবিন্দ সাণ্ডেলের উপরও ভরসা ছিল না তার। সে নিজেই খুঁজে বার করবে। তাকে একবার নাগালের মধ্যে পেলে ঠিক ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবে এ ভরসা তার আছে।...এই জাতীয় চিন্তা দ্বারা চালিত

হয়ে সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল দিবসকে। একটি মাত্র সহকারী (সহকারিণী বললে আরও ব্যাকরণসম্মত হয়) সে পেয়েছিল। সে হচ্ছে বাড়ির ঝি নিস্তারিণী। নিস্তারিণীকে ব্রজ বলেছিল—"তুই তো রোজ রাস্তা দিয়ে আসিস যাস, চোখ কান খোলা রাখিস একটু। রাস্তায় দেখা যদি হয়ে যায় আধ ঘোমটা টেনে সমীহ ক'রে সরে' দাঁড়াস নি যেন। ভুলিয়ে ভালিয়ে ডেকে নিয়ে আসিস। বুঝলি ? বলিস ব্রজদা একবার শুধু তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়, যদি না আসতে চায় ঠিকানাটা জেনে নিবি, বুঝলি ?"

"বুঝেছি, বুঝেছি, আমাকে আর অত বোঝাতে হবে না"—নিস্তারিণী ঝংকার দিয়ে উঠেছিল যদিও কিন্তু সত্যিই সে তার সাধ্য-মতো খোঁজ-খবর করছিল এবং সে-ই একদিন দিবসের খবরটা এনেও দিলে ব্রজকে।

"গিরিবালার সঙ্গে আজকে দেখা হল পথে। কথায় কথায় সে বললে আমাদের অন্ন বোধ হয় উঠল এবার দিদি। লেখাপড়া জানা কলেজের ছেলেরা সব চাকর হয়ে বাসন মাজছে আজকাল। সে যে মেসে ঝি-গিরি করে' সেই মেসে দিবু বলে' একটি ল'কলেজের ছেলে নাকি চাকর হয়ে বাহাল হয়েছে।"

"তাই না কি ! ঠিকানা কি সে মেসের ?"

"ঐ যাঃ ঠিকানাটা তো জিগ্যেস করতে ভুলে গেছি।"

"গিরি কোথায় থাকে ?"

"তাও তো ঠিক জানি না। আগে থাকত কলুটোলায়, না, না কলাবাগানের কাছে, কি যে ছাই নামটা—"

"আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানিস ?"

"কি ?"

"তোর গালে ঠাস করে' একটি চড় মারি।"

"মুখ সামলে কথা কও বলছি"—তর্জন করে' উঠল নিস্তারিণী—"চড় মারবেন, ইশ ভারী মরদ হয়েছেন, যত বুড়ো হচ্ছেন তত ভীমরতি ধরছে—"

"ছি, ছি ছি ছি! দিবুর ঠিকানাটা তুই হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এলি!"

কলহ কিন্তু আর বেশি দূর অগ্রসর হবার সুযোগ পেল না, কারণ গোবিন্দ সাণ্ডেল এসে ঢুকলেন। নিস্তারিণী আধঘোমটা টেনে সরে' গেল, ব্রজও থেমে গেল। ব্রজ শুধু থেমে গেল না, এমন ভাবে চাইলে যেন কোনও শত্রু নিকটবর্তী হয়েছে।

"সূয্যি কোথা?"

"ওপরে আছে।"

গোবিন্দ সাণ্ডেল ওপরে চলে গেলেন। ব্রজর কথা তিনি খানিকটা শুনতে পেয়েছিলেন। দিবসের ঠিকানা নিয়েই যে ওরা আলোচনা করছে এটাও বুঝতে পেরেছিলেন। অন্য কেউ হলে থেমে ব্যাপারটা পুরোপুরি জেনে নিতেন, কিন্তু গোবিন্দ সাণ্ডেল সে জাতের লোক নন। চাকরদের সঙ্গে—তা সে যত পুরাতন ভৃত্যই হোক—একটা দূরত্ব রক্ষা করে' চলাটাই তিনি আভিজাত্য মনে করেন। সোজা উপরে চলে গেলেন তিনি।

দিবস যে বাড়ির সামনে এসে চলে গেল, তাঁর আহ্বান সত্ত্বেও বাড়ির ভিতরে এল না এর ধাক্কাটা সূর্য চৌধুরি সামলেছিলেন। গোবিন্দ সাণ্ডেলকে দেখে তিনি বুঝলেন যে আর একটা ধাক্কা আসন্ন। এটাকে সামলাবার জন্যেও মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিলেন তিনি।

গোবিন্দ সাণ্ডেলে এসেই পরিহাসের সুরে বললেন, "আমাকে কুড়িটি টাকা দাও দিকি।"

"কেন ?"

"দিবসকে খোঁজবার জন্যে চেৎলা দৌড়েছিলুম, মনিব্যাগটি হারিয়েছি, নতুন জুতো জোড়া কাদায় জলে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে, ট্যাক্সি খরচা লেগেছে তার উপর—"

"হঠাৎ চেৎলা দৌড়তে গেলে যে ?"

"বদ্যিনাথের কথায়। ও যে অত বড় একটা উজবুক তা ধারণাই ছিল না আমার। কোথা থেকে উড়ো খবরটি দিয়ে চলে গেল।"

সবিস্তারে ঘটনাটির বর্ণনা করলেন।

"মিছে ছুটোছুটি করছ তুমি। দিবস তো এসেছিল।"

"এসেছিল ? তার মানে? কোথা সে ?"

তখন সূর্য চৌধুরি সবিস্তারে সব বললেন।

"তুমি ডাকলে, তবু এল না ?"

"না। বললে সে যা করতে চায় তা এই প্রাসাদে বসে' করা সম্ভব নয়।"

"কি করতে চায় সে ?"

"আদর্শ শ্রমিক হতে চায়।"

"ও বাবা !"

গোবিন্দ সাণ্ডেলের চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবার মতো হ'ল। কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "কোথা আছে সে ?"

"তা তো জানি না। ঠিকানাটা জিগ্যেস করতে ভুলে গেছি।"

"ঠিকানা বোধ হয় ব্রজ জানে তোমার।"

"ব্রজ ?"

"হ্যাঁ, এখনি ওপরে আসতে আসতে শুনলাম ও আর তোমার ঝি মাগি দিবসের ঠিকানা নিয়ে কথা কাটাকাটি করছিল। আমাকে দেখেই থেমে গেল।"

"তাই না কি ! আমাকে তো কিছু বলে নি ?"

ভিজে গামছা উটি একটি, নেংড়াও জল বরিয়ে পড়বে।"

সূর্য চৌধুরি চুপ করে' রইলেন।

তারপর বললেন, "ঠিকানা জেনেই বা কি হবে বল ? সে যদি না আসতে চায়, সে যদি তার নিজের পথেই চলতে চায়, আমি তো তাকে জোর করতে পারি না। করা উচিতও নয়।"

"উচিত নয় মানে ? ছেলে যা খুশি করবে আর তুমি বসে বসে দেখবে ?"

"যা খুশি বলে' তুমি যা বোঝাতে চাইছ সে ঠিক তা'তো করছে না। ভুল হোক ঠিক হোক সে নিজের একটা আদর্শ খাড়া করছে এবং সেই অনুসারে চলতে চাইছে।—"

"আদর্শ না কচু !"

কথাগুলো অভ্যাস অনুযায়ী বেরিয়ে পড়ল গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখ থেকে যদিও, কিন্তু তিনিও মনে মনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন একটু। এরকম করবার মানেটা কি ! আদর্শ শ্রমিক ? তাঁর অবশ্য ছেলে হয়নি, সবগুলোই মেয়ে, ছেলের মর্ম তিনি ঠিক বোঝেন না হয়তো, কিন্তু তাঁর বদ্ধ ধারণা ছেলেটিকে নাই দিয়ে দিয়ে সূর্যকান্ত এই কাণ্ডটি করেছেন। শাসন না করলে স্ত্রী পুত্র পরিবার কেউ বশে থাকে না। এমন কি জামাইকে পর্যন্ত শাসন করতে হয়—তাঁর সেজ জামাইটি চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করবেন বলে' মেতেছিলেন—ব্যবসা করবার মতো সংগতি আছে তা ঠিক, বাপের অঢেল পয়সা, কিন্তু চাকরির কাছে ব্যবসা ! কড়া করে একখানা চিঠি লেখাতে তবে ঠাণ্ডা হয়েছেন বাবাজি ! বাপের পয়সা থাকলেই ছেলেগুলোর মাথা কেমন যেন বিগড়ে যায়। জামাইয়ের কথা ভাবতে গিয়েই এই শ্রমিক রহস্যটার সমাধান সহসা চোখে পড়ল তাঁর। সূর্য চৌধুরির দি'কে চেয়ে তিনি

বললেন, "ও সব হুজুক। আর হুজুকে মেতেছে কেন জান? ওর মনটি ঠাণ্ডা আছে।"

"বুঝলাম না।"

"এখন আদর্শ শ্রমিক সেজে বেড়াচ্ছে, বক্তৃতা করছে, কারণ ও জানে যে তুমি চক্ষু বুজলেই বিষয়টি ও পাবে।"

সূর্য চৌধুরি স্মিত মুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, "অতটা খেলো ওকে মনে করতে পারি না আমি। এ যুগের ভাল ছেলেদের তুমি চেন না তাই ও কথা ভাবতে পারছ।"

এ ধরণের কথা সূর্য চৌধুরির মুখে ইদানিং অনেকবার শুনেছেন গোবিন্দ সাণ্ডেল। প্রত্যুত্তর দেবার আর প্রবৃত্তি হল না। শুধু বললেন—"অত কথায় কাজ কি, ফলেন পরিচীয়তে। বিষয়টি থেকে ওকে বঞ্চিত করে' সেই খবরটি পাঠাও দিকি ওর কাছে, উঠি-পড়ি করতে করতে ছুটে আসবে।"

"কখনও আসবে না।"

"ঠিক আসবে। করেই দেখ।"

পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন।

রঙ্গনা চলে যাবার পর দিবসও বেরিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরল রাস্তায় রাস্তায়। তারপর কিরণের বাসায় হাজির হল এসে।

"একেই বলে টেলিপ্যাথি"—কিরণ হেসে বলল—"আমি এক্ষুনি তোর কথা ভাবছিলাম। তারপর খবর কি?"

কোনও উত্তর না দিয়ে দিবস চেয়ারটা টেনে বসল স্মিতমুখে।

"কিছু বলছিস না যে?"

"বলতে বাধছে।"

"কি রকম ?"

দিবস হাসিমুখে চেয়ে রইল তবু। তারপর বললে—"আচ্ছা, তুই তো কবি মানুষ, একটা কথার জবাব দে দিকি। একটা বিশেষ লোককে হঠাৎ ভাল লেগে যায় কেন ?"

"কেন, কাউকে হঠাৎ ভাল লেগেছে নাকি ?"

"লেগেছে।"

"কাকে ?"

"রঙ্গনাকে।"

কিরণের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল সহসা। তার যে ব্যথাটাকে সে গোপন করতে চাইছে প্রাণপণে এই সংবাদটা যেন লোষ্ট্রাঘাতের মতো লাগল এসে তাতে। ক্ষতবিক্ষত হয়েও যে অন্তর্দ্বন্দ্বকে ভুলে থাকবার চেষ্টা করছিল সে, দিবসের কথায় মনে পড়ে গেল সেটা। শুধু মনে পড়ে গেল নয় এর শোচনীয় পরিণামটাও যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চোখের সামনে। কিন্তু তার তৎক্ষণাৎ আবার মনে হল যে দুর্বিষহ দারিদ্র্যের চাপ, যে ব্যর্থতার গ্লানি তার স্বপ্নকে সফল হতে দিচ্ছে না, যা তাকে ভদ্রসমাজ থেকে দূরে টেনে এনেছে, খাঁকি কোট প্যাণ্ট পরিয়ে এক অদ্ভুত জীব বানিয়েছে, তা'তো দিবসের পক্ষে সত্য নয়। দিবসের স্বপ্ন হয়তো সফল হবে। দিবস তো দরিদ্র নয়।

"কিরে অমন করে চেয়ে রইলি কেন ? কিছু বল"—সামলে নিলে কিরণ পরমুহূর্তে। হেসে বললে—"কিন্তু রঙ্গনা কি মেসের চাকর দিবস চৌধুরিকে আমোল দেবে ?"

"দেবে না ? দিলে কিন্তু বেশ হয়, নয় ?"—দিবসের কণ্ঠস্বরে এমন একটা আগ্রহ ফুটে উঠল যা অভূতপূর্ব বলে' ঠেকল কিরণের কাছে। দিবস কিরণের মুখের দিকে চকিতে চেয়ে আবার স্থুরু করল— "দেবে না কেন ? সে কেবল মেসের চাকরিটাই দেখবে, আমাকে

দেখবে না? লেখাপড়া শিখছে, মানুষের বাইরেটা যে সব নয় একথা সে বুঝবে না?"

"বোঝা শক্ত।"

এইটুকু বলে' কিরণ চুপ করে গেল। তারপর হঠাৎ একটু অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলে' উঠল, "উচিতও নয়। সত্যিই যে মোহিনী সে কেন বরণ করতে যাবে অসমর্থ দরিদ্রকে?"

"অর্থটাই বড় তাহলে তোর মতে?"

"বড় কি ছোট সে প্রশ্ন অবান্তর। ওর আধ্যাত্মিক যত ব্যাখ্যাই আমরা করি না কেন, অর্থটা প্রয়োজন। দরিদ্রের কোনও অধিকারই নেই প্রেমে পড়বার। সে বিয়ে করুক, কিন্তু প্রেমে পড়লেই তার দুর্গতি অনিবার্য। যাকে ভালবাসি তাকে—"

হঠাৎ থেমে গেল কিরণ। তারপর কথাটা ঘুরিয়ে একটু হেসে বললে, "তার চেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও না। সোজা হবে জিনিসটা। মানাবেও। শখ 'করে' এ কৃচ্ছ্রসাধনের মানেটা কি তাও তো আমার মাথায় আসছে না।"

"তোর মাথায় এসেছে ঠিকই কিন্তু তুই সেটা মানতে চাইছিস না। তুইও মানতে চাইছিস না, আশ্চর্য লাগছে সত্যি। তুইও বুঝতে পারছিস না যে কর্মবিমুখতাই আমাদের আসল গলদ!"

রঙ্গনার কথা চাপা পড়ে গেল।

দিবস বলতে লাগল, "আজ আমাদের কি দুর্দশা হয়েছে দেখতে পাচ্ছিস না? কোথাও আমাদের স্থান নাই, সম্মান নেই। সবাই বলছে বাঙালীরা কেবল লম্বা লম্বা বুলিই আওড়াতে পারে, কাজ করতে পারে না কিছু। হতে পারে কেবল আপিসের কেরানী। আমাদের এ অপবাদ ঘোচাতে চাই আমি"—দিবসের গলাটা কেঁপে গেল একটু—"আমি হাতে কলমে দেখিয়ে দিতে চাই বাঙালীর

ছেলেরা ইচ্ছে করলে সব করতে পারে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উচ্চতম স্থানও দখল করতে পারে আবার দরকার হলে বাসনও মাজতে পারে, জুতোও বুরুষ করতে পারে।”

কিরণ বললে, “তোমার কিন্তু দরকার হয়নি।”

“হয়নি বলেই আমি সহজে পারব, এবং সেইজন্যেই এ আদর্শ সৃষ্টি করবার দায়িত্ব আমারই বেশি। দরকারের চাপে বাধ্য হয়ে মেসের চাকর হতে হবে যাদের তারা আমাকে দেখে প্রেরণা পাবে, তাদের আর লজ্জা করবে না। এই দেখ না পাঞ্জাবি বা কামিজের উপর ওয়েষ্টকোট এদেশে আগে খানসামারাই পরত, কিন্তু যেদিন থেকে পণ্ডিত জহরলাল একটু বদলে ওটাকে পরলেন সেদিন থেকে ওটা জাতে উঠে গেল। ও পোশাক আজ হেয় নয়, গৌরবের। বড় বড় নেতারা যখন জেলে গেল, তখন জেলই তীর্থস্থান হয়ে উঠেছিল, মনে নেই তোর?”

কিরণ চুপ করে’ রইল ক্ষণকাল।

তারপর বললে, ”বেশ ধরেই নিলাম না হয় যে আদর্শের প্রেরণায় কৃচ্ছ্রসাধন করাটা তোমার কর্তব্য কিন্তু রঙ্গনাকে তার মধ্যে টেনে আনতে চাইছ কেন? প্রেমকে যদি মহিমান্বিত না করতে পার তাহলে দরকার কি সে রকম প্রেমের!”

“তুই তাহলে বলছিস যে অর্থ ছাড়া আর কোনও মহিমা নেই?”

“অর্থাতীত যে মহিমা তা অসাধারণ লোকের থাকে। সাধারণ লোকের কাছে অর্থই মহিমালাভের উপায়। শুধু মহিমালাভের উপায় নয়, অতি সাধারণ দৈনন্দিন স্বাচ্ছন্দ্য লাভেরও উপায়।”

“স্বামী স্ত্রী দু’জনে মিলে যদি রোজকার করে তাহলে দৈনন্দিন স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হবে না?”

“কিন্তু সেই স্ত্রী যদি তোমার প্রিয়া হয় তাহলে তাকে দিয়ে

চাকরানির কাজ করানোটা কি তোমার ভাল লাগবে? সে যখন একটা কাপড় বা গয়না চাইবে, কিংবা তোমার নিজেরই যখন ইচ্ছে হবে তাকে একখানা ভাল শাড়ি বা গয়না দিতে তখন মুদির দোকানের বিল আর বাড়ি ভাড়ার অঙ্ক যোগ করে' যদি দেখ তোমার সামর্থ্যে কুলুচ্ছে না তখন কি রকম লাগবে সেটা?"

"তোর মতে তাহলে বিয়ে করাই উচিত নয়?"

"বিয়ে করাটা প্রয়োজন, শখ নয়। বিয়ে তুমি একটা চাকরানিকেও করতে পার, তার সঙ্গেই চাকরের গৃহস্থালী জমবে ভাল। কিন্তু রঙ্গনাকে যদি চাও, রঙ্গনার মতো মর্যাদা দিতে হবে তাকে, আই মীন, আর্থিক মর্যাদা। তোমার নোংরা উঠোনের কোনে পুঁই মাচা মানাবে, কিন্তু পারিজাত কুঞ্জ মানাবে না। তার জন্যে নন্দন-কানন চাই"

"বিশ্বাস করলাম না। বিশ্বাস করলাম না যে অপরের তৈরি নন্দন-কাননে আমার পারিজাত মর্যাদা পাবে। আমি নিজের শক্তিবলে আমার নিজের উঠোনকেই নন্দন-কাননে পরিণত করতে যদি পারি তবেই আমার পৌরুষ সার্থক হবে আর সেই পৌরুষই মর্যাদা দেবে আমার প্রিয়াকে।"

"মেসের চাকর হয়ে কতদিনে তুমি তোমার উঠোনকে নন্দন-কাননে পরিণত করতে পারবে মনে কর?"

"আমি যে বরাবর মেসের চাকর হয়ে থাকব এ প্রতিজ্ঞা তো করি নি। আমি বলছি, যে কোনও কাজ করবার সামর্থ্য আমাদের অর্জন করতে হবে। কেবল কেরানিগিরি বা শৌখিন পেশাগুলি ছাড়া আমরা আর কিছু করতে অপারগ আমাদের এই কলংক ঘোচাতে হবে। আমি তো ইতিমধ্যে একটা প্রাইভেট ট্যুশনি পেয়ে গেছি। আরও ভাল যদি কোনও রোজকারের পন্থা আবিস্কার করতে পারি, মেসের চাকর থাকব কেন? কিন্তু আমি বাসন মাজতে বা কাপড় কাচতে পারব না, রিকৃশা

টানতে পারব না, কুলী হতে পারব না—অক্ষমতার এই অপবাদ সহ্য করব কেন আমরা?"

"আমাদের শক্তিতেই কুলোবে না! আমার পক্ষে তো রিক্শা টানা অসম্ভব।"

"শক্তিটা মনে, পেশীতে নয়। তাছাড়া পেশীরও তো অভাব দেখি না। স্কুলে, কলেজে, ক্লাবে, জিম্ন্যাসিয়ামে বঙালী ছেলেদের স্বাস্থ্য-চর্চার তো খুব ধুম দেখি। মাসিকপত্র খুললেই বুক ফেলানো বাইসেপ্‌স্‌-ফোলানো ছবি তো প্রায়ই চোখে পড়ে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রিক্শা টানে যে লোকটা তার অমন সুদৃশ্য পেশী নেই। আমরা স্বাস্থ্য-চর্চাটাও একটা 'ফ্লারিশ' করবার বস্তু করে' তুলেছি। ভালো পেশী-ওলা ছেলে-মেয়েদের ছবি ছাপা হোক তাতে আমি আপত্তি করছি না কিন্তু সে পেশী যদি শেষ পর্যন্ত কলম-পেষাতেই পরিণতি লাভ করে তাহলে দুঃখ হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথাগুলো কি কেবল কেতাবেই নিবদ্ধ থাকবে?"

কিরণ একটু চুপ করে' থেকে উত্তর দিলে, "প্রত্যেক জাতেরই একটা বিশিষ্টতা থাকে, বাঙালীরও সেটা আছে। আমরা শিল্পীর জাত, শিল্পীর সমস্ত রকম দোষগুণ তাই আমাদের মধ্যে বর্তমান। রিক্শা টেনে বেড়ালে শিল্প সৃষ্টি করা যায় না। শিল্প সৃষ্টি করবার জন্যে ছুটি চাই, অবসর চাই। তাই আমরা চাকরি-প্রিয়। দশটা পাঁচটা আপিস করি বাকি সময়টা অবসর পাই, সে সময় যা খুশি করি। এই যা-খুশি করবার স্বাধীনতাই শিল্পের জন্মদাতা। যারা সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত গদিতে বসে' পয়সার চিন্তা করছে, কিংবা ভাত-কাপড়ের জন্য অহরহ খেটে মরছে, তারা বড় শিল্পী হয় নি। হতে পারবেও না।"

"কিন্তু সমস্ত জাতটা যদি অলস হয়ে কেবল শিল্পেরই ধ্যান করে তাহলে তার মৃত্যুও অনিবার্য।"

চুপ করে' রইল দু'জনে খানিকক্ষণ।

তারপর কিরণ হেসে বললে, "আমার কিন্তু মনে হচ্ছে রঙ্গনা তোমার ওই খোলার ঘরে এসে থাকতে চাইবে না।"

"চাইবে না ?"

"মনে তো হয় না !"

"কিন্তু ভাবতে ইচ্ছে করে যে চাইবে।"

"চাওয়াটা উচিত নয়।"

"তুই কিন্তু ওদের কাছে যেন আমার আসল পরিচয়টা বলিস না।"

"আমি যাই-ই নি সেখানে। সময় পাচ্ছি না।"

"আমারও যাওয়া হয় নি এখনও।"

"এইবার যাও।"

কিরণ মুচকি হাসলে। হাসিটা তার ম্লান দেখাল। উর্মির মুখটা তার মনে ভেসে বেড়াচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। উর্মির চোখের ভাষাহীন নিবেদনকে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত করে দিচ্ছিল কালো একখানা মেঘ। দারিদ্র্যের মেঘ। এই অস্বস্তিকর অসংগতির স্পর্শে ম্লান হয়ে যাচ্ছিল তার হাসি। নিজেকে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না সে।

দময়ন্তীর ছবি বগলে করে' রঙ্গনা যখন বাড়ি পৌঁছল তখনও গহনচাঁদ এবং চুনীলাল ফেরেন নি। মামীমা বাপের বাড়ি চলে গেছেন, বাড়িটা একেবারে ফাঁকা। বুড়ি ঝিটা বসে' আছে শুধু, তারই মুখে রঙ্গনা খবর পেলে যে মামা বাবাকে নিয়ে বিকাশবাবুর দাদার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গেছেন তারই বিয়ের সম্বন্ধে। মুচকি হেসে ঝি বার্তাটি নিবেদন করলে। তারপর বললে—"তোমার খাবার ঢেকে রেখে দিয়েছি টেবিলের ওপর। ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে থাকে তো ঠাকুরকে একটু গরম করে' দিতে বোলো। আমি চললুম এবার।"

"আচ্ছা।"

ঝি চলে গেল। রঙ্গনা কাপড় ছাড়তে লাগল। একটু পরেই ফিরে এল আবার ঝি।

"বাইরে ডাক বাক্সে চিঠি ছিল দু'খানা।"

চিঠি দিয়ে ঝি চলে গেল। দু'খানাই পোস্টকার্ডের চিঠি। একটা গহনচাঁদের। বিশ্বনাথ কথক কাশী থেকে লিখেছেন। বাড়ি বাঁধা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। দলিল-পত্র নিয়ে তিনি নিজেই আসছেন। লেখাপড়া হয়ে গেলেই টাকা পেতে দেরি হবে না। দ্বিতীয় চিঠিখানা চুনীলালের। সেটিও ভ্রূকুঞ্চিত করে' পড়লে রঙ্গনা। কোন এক হরলালবাবু লিখেছেন—"লোক পরম্পরায় শুনিলাম যে আপনি আমার টাকাটা পরিশোধ করিয়া দিবেন মনঃস্থ করিয়াছেন। সত্যই তাহা যদি করেন তাহা হইলে আমাকে আর অনর্থক মকোর্দমার হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না। উকিলের পরামর্শ লইয়া বুঝিয়াছি মকোর্দমায় আমি জিতিবই। কিন্তু অকারণ টাকা ব্যয় করিতে চাহি না, কারণ এই টাকাটাও তো শেষ পর্যন্ত আপনার ঘাড়েই চাপিবে। আমি আপনার জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করিব জানাইবেন।"

চিঠি দু'খানা টেবিলে রেখে দিয়ে রঙ্গনা ঢাকা দেওয়া খাবারটা খেয়ে নিলে। তার সমস্ত মনটা কেমন যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। চতুর্দিকেই কেবল অভাব আর অভাব। আনন্দের কোনও সুরই যেন জমছে না কোথাও। বারংবার তাল কেটে যাচ্ছে। মুখের হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে ফুটতে না ফুটতেই। আজকালকার ওই রঙীন রবারের বেলুনগুলোর মতো। স্ফীত হয়ে উঠেছে বটে আবেগভরে কিন্তু চুপসে যাচ্ছে পরমুহূর্তে। কেন এমন হয়······। মেঘের পর মেঘ এসে জমতে লাগল রঙ্গনার মনে।

অপ্রত্যাশিতভাবে মেঘ কেটেও গেল আবার। টুলের উপর চড়ে'

দময়ন্তীর ছবিটি টাঙিয়ে যেই নাবতে যাবে অমনি হাত লেগে পাশে টাঙানো আয়নাটা মেঝেতে পড়ে' টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ছবিটা কিনেই সে নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে পড়েছিল, সেই ছবি টাঙাতে গিয়ে আবার আয়নাটা ভেঙে গেল! অনুশোচনা করবার কিন্তু সে সময় পেল না। ঠিক সেই মুহূর্তে দিবস এসে হাজির হল। কিরণের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রঙ্গনার কথাই ভাবতে ভাবতে পথ হাঁটছিল দিবস। রঙ্গনা কেবল আমার মেসের চাকরিটাই দেখবে, আমাকে দেখবে না?—এই কথাটাই বারবার মনে হচ্ছিল তার। তারপর মনে হল তার স্বরূপ জানবার সুযোগ তো রঙ্গনাকে সে দেয় নি এখনও। রঙ্গনা নিজে দু'বার তার বাড়িতে এসে যতটুকু পরিচয় পেয়েছে তার মূল্য কতটুকু। পথ চলতে চলতে হঠাৎ তার মনে হল রঙ্গনার বাড়ি গেলে হয়, ভাল করে' আলাপই তো করা হয় নি তার সঙ্গে। তাছাড়া সরোদ যদি শিখতেই হয় নিজের এবং গহনচাঁদবাবুর সুবিধা অনুযায়ী একটা সময়ও ঠিক করতে হবে। এই ওজুহাতটাকে অবলম্বন করেই সে এসে হাজির হয়েছিল এত রাত্রে। কিন্তু এসে যে সে এই পরিস্থিতিতে পড়ে যাবে তা কল্পনাও করেনি। বাইরের ঘরে কাউকে দেখতে না পেয়ে সে চলে যাবে কি না ভাবছিল। পরমুহূর্তেই ঝন্‌ঝন্ শব্দটা কানে আসতেই পাশের দরজা দিয়ে উঁকি দিলে সে এবং উঁকি দিয়েই দেখতে পেলে রঙ্গনাকে।

"কি হল!"

"আপনি!"—পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে রঙ্গনা বললে— "আসুন, বাবা, মামা কেউ বাড়ি নেই। বাইরের ঘরে বসি চলুন।"

বাইরের ঘরে গিয়ে দিবস বললে, "অত বড় আয়নাখানা কি করে' ভাঙল?"

"ছবি টাঙাচ্ছিলাম একটা, হঠাৎ টুলটা কেমন যেন নড়ে' উঠল,

টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। পাশেই ছিল আয়নাটা, যেই ধরতে গেছি আর অমনি দড়ি ছিঁড়ে পড়ে গেল। অমন শখের আয়নাটা, ছি ছি, এমন কষ্ট হচ্ছে।"

দিবস চুপ করে' রইল খানিকক্ষণ। তারপর তার মনে হল তার এই অসময়ে আসার হেতুটা বলা উচিত।

"আমি জানতে এসেছিলাম, কখন এলে সরোদ শেখবার সুবিধে হ'তে পারে। আমার ছুটি দুপুরে ঘণ্টা দুই—বারোটা থেকে দুটো। আর রাত্রিতে আটটার পর। ও, টিউশনিটা যদি নি তাহলে আটটার পরও তো ছুটি থাকবে না—কখন আসব তাহলে—"

রঙ্গনা আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না।

"আচ্ছা আপনি মেসে চাকরের কাজ করেন শুনলাম? সত্যি?"

"কে বললে আপনাকে!"

"সৌদামিনী। আপনার সব খবর পেয়েছি"—মুচকি হেসে বললে রঙ্গনা।

"তাতো জানতাম না"—দিবস কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

"সত্যি আপনি মেসের চাকর হয়ে আছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আমার বক্তৃতা তো শুনেছেন।"

ওদের আলাপ কিন্তু আর বেশিদূর অগ্রসর হবার সুযোগ পেল না। গহনচাঁদ এবং চুনীলাল ঢুকলেন এসে। দিবসকে দেখে মহা খুশি হয়ে উঠলেন গহনচাঁদ।

"ও তুমি এসেছ, বস বস বস। ভাবছিলাম তোমার কথা।"

চুনীলাল তির্যক দৃষ্টিতে দিবসের দিকে চেয়ে ভিতরের দিকে

যাচ্ছিল, রঙ্গনা বললে, "তোমার চিঠি এসেছে একটা। বাবা তোমারও চিঠি আছে। কথক মশাই আসছেন।"

"তাই না কি, চমৎকার সুখবর তো! কই চিঠি?"

"এই যে আনি।"

রঙ্গনা চলে গেল পাশের ঘরে।

"আমি কখন সরোদ শিখতে আসব জানতে এসেছিলাম। আমার দুপুরে ঘণ্টা দুই ছুটি আছে। আপনি কি দুপুরে ঘুমোন?"

"না। তোমার যখন খুশি এস।"

রঙ্গনা চিঠিটা এনে আবদারের সুরে বললে, "একটা খুব অন্যায় কাজ করে' ফেলেছি বাবা। বল তুমি রাগ করবে না?"

"কি করলি আবার!"

"রাগ করবে না বল?"

গহনচাঁদ হেসে ফেললেন।

"আরে শুনিই আগে ব্যাপারটা কি।"

"আমার আয়নাটা পড়ে' ভেঙে গেছে। দময়ন্তীর একটা ছবি কিনে এনে টাঙাচ্ছিলাম, হঠাৎ টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, আয়নাটা পাশেই ছিল, হাত লেগে পড়ে গেল।"

"ভাগ্যে তুই পড়ে যাস নি! দময়ন্তীর ছবি কিনেছিস না কি, কই কোথায়?"

শিশুর মতো কৌতূহলী হয়ে উঠলেন গহনচাঁদ।

"ওঘরে টাঙিয়েছি, দেখবে চল না।"

"আমি এখন চলি, তাহলে। পরে আসব আবার"—দিবস উঠে পড়ল এবং গহনচাঁদকে নমস্কার করে' বেরিয়ে গেল।

গহনচাঁদ দময়ন্তীর ছবি দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন, "যে ঘরে তোর সম্বন্ধ করছি, বাবা বিশ্বেশ্বর যদি মুখ তুলে চান, দেখবি

সেখানে কি বড় বড় সব অয়েল-পেন্টিং। বৈঠকখানাতে রবি বর্মার 'গঙ্গাবতরণ' খানা টাঙানো রয়েছে দেখলাম, কি ছবি সে, সমস্ত ঘরখানাকে যেন আলো করে' রেখেছে।"

"যারা অত পণ দাবী করে সেখানে আমি বিয়ে করব না বাবা। কথক মশাইকে তুমি লিখে দাও বাড়ি বাঁধা দিতে হবে না।"

"আরে, ক্ষ্যাপা না পাগল, টাকা খরচ না করলে কি মেয়ের বিয়ে হয় না কি? সব জায়গাতেই টাকা লাগবে, ওই রেওয়াজ যে।"

"আমি তাহলে বিয়ে করব না"—গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল রঙ্গনা।

"ও চুনী শুনছ, তুমি তো এদিকে মেয়ে দেখবার ব্যবস্থা করে' এলে, রঙ্গনা কি বলছে শোন—"

মেয়ের পিছু পিছু তিনিও বেরিয়ে এলেন।

চুনীলাল ছাতে গিয়ে নির্জনে হরলালের চিঠিটা পড়ছিল মনোনিবেশ সহকারে। আজ বিকেলে অন্নদাও এসেছিল টাকার তাগাদা দিতে। সেই জন্যেই বিশেষ করে' জামাইবাবুকে (গহনচাঁদকে) নিয়ে চুনীলাল বিকাশের জ্যাঠার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল আজ। বিয়েটা হয়ে গেলে তবেই সে বিকাশের কাছে দোকান কেনার কথাটা উত্থাপন করবে। তার আগে ও কথা পাড়াটা ভালো দেখায় না। অন্নদাকে সে স্তোক দিয়ে বিদায় করেছে আপাতত কিন্তু হরলালকে কি বলবে? হরলাল লোকটা নালিশ ঠুকে দিয়েছে তা গোবিন্দবাবুর মারফত শুনেছে সে, এবং টাকা দিতে না পারলে যে বিপদে পড়তে হবে এ আভাসও গোবিন্দবাবু দিয়ে গেছেন। টাকা সে দিয়ে দেবেও, কিন্তু দোকানটা বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত তো দেবার উপায় নেই, আর বিয়ে হওয়ার আগে দোকানের কথা পাড়াও যায় না বিকাশবাবুর কাছে…।

অনেক ভেবে চিন্তে চুনীলাল শেষকালে চিঠির উত্তর না দেওয়াটাই স্থির করলে। বেশি ধরপাকড় করলে বলা যাবে চিঠি পাইনি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হরলাল রেজিষ্টার্ড চিঠি লিখবে উইথ্ একনলেজ্‌মেণ্ট ডিউ, কিন্তু ততদিন তো সময় পাওয়া যাবে !

দিবস চলে আসার পর কিরণ বসেই রইল চুপ করে' অনেকক্ষণ। মনস্তত্ত্বের যে বেড়াজালে নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দী করেছিল সে, তার থেকে সে কিছুতেই বেরোতে পারছিল না পৌরুষের অভিমান, দারিদ্র্যের বাধা, কল্পনার স্বপ্নলোক, উর্মির আকর্ষণ, কর্তব্যের তাগিদ এর কোনো-টাকেই সে উপেক্ষা করতে পারছিল না। অকস্মাৎ রামের বনবাসের সংবাদে লক্ষ্মণের মনে নানারকম বীরভাবের উদয় হয়েছিল—লক্ষ্মণ রামকে পিতৃ-আজ্ঞা অমান্য করতে প্ররোচিত করেছিল, প্রজাদের রাজ-দ্রোহী করে' তোলবার সংকল্প ব্যক্ত করেছিল, দশরথকে বধ করবার জন্যেও প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে রামের সঙ্গে বনেই গেল। কিরণের জীবনেও উর্মির আবির্ভাবে নানাবিধ ভাব উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তেমনি। কিন্তু সে ঠিক করে' উঠতে পারছিল না কি করবে। অনেকক্ষণ চুপ করে' বসে' থেকে সে শেষকালে আর একটা কবিতা লিখে ফেললে—

তুমি ধরার ধূলিতে এসে ফোট না
  ওগো, নন্দন কাননের ফুল,
ওগো নন্দন কাননের ফুল
ওগো অনিন্দ্য গন্ধ-আকুল
ছাড়িয়া মন্দাকিনী কূল
  তুমি ধরার ধূলিতে এসে ফোট না।

শোন মর্ত্যের বনে শাখে শাখে
ডাকিছে বকুল যূথী চম্পা
মুগ্ধ কবির হিয়া ডাকে
ওগো, কর কর কর অনুকম্পা
ওগো নন্দন কাননের ফুল
ওগো আকাশ-কুসুম-সমতুল
ডাকিছে তোমারে অলিকুল
তুমি ধরার ধূলিতে এসে ফোট না।

কবিতাটা লিখে সে খানিকটা তৃপ্তি পেলে যেন। একটু আগে সে নিজেই দিবসের সঙ্গে তর্ক করছিল যে নোংরা বাড়ির উঠোনে পারিজাত কুঞ্জ মানাবে না কিন্তু কবিতার মাধ্যমে সে নন্দন-কাননের ফুলকে ধরার ধূলিতে এসে ফোটবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে অবর্ণনীয় একটা আনন্দ লাভ করলে। পরমুহূর্তেই তার মনে হল কাল ঊর্মি এসে এটাও হয়তো ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, রঙ্গনাকে দেবে সুর বসাতে, তারপর চেষ্টা করবে যাতে এটাও গ্রমোফোন কোম্পানিরা নেয়। তার আয় বাড়াবার জন্যে ঊর্মির চেষ্টার অন্ত নেই। ঊর্মির মুখটা মনে পড়ল, জীবন্ত মুখে সজীব চোখ দুটো যেন নাচছে, আর তার সঙ্গে নাচছে তার কানের দুপাশের অলকগুচ্ছ।

নবম পরিচ্ছেদ

যদিও দু'জনে একই সময়ে একই হাউসে রোমিও জুলিয়েট দেখতে গিয়েছিল তবু দিবসের সঙ্গে রঙ্গনার দেখা হয় নি। দেখা হল সিনেমা ভাঙবার পর রাস্তায়। রঙ্গনাই প্রথমে কথা কইল।

"ও, আপনিও এসেছিলেন! ভারী চমৎকার, না?"

"সুন্দর! কি সুন্দর অভিনয় দেখেছেন ওদের, নিখুঁত একেবারে।"

মিনিট খানেক নীরবে হাঁটার পর রঙ্গনা প্রশ্ন করলে, "আচ্ছা, করুণ বিয়োগান্ত নাটক দেখে আমরা আনন্দ পাই কেন বলুন তো?"

"সত্য বলে'। শোক, দুঃখ, বিরহ, ব্যথা এ সবই সত্য। যা সত্য তাতেই আনন্দ পাই আমরা।"

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটল।

"আপনি হেঁটে যাবেন না কি? আপনার বাসা তো অনেক দূর এখান থেকে"—রঙ্গনাই প্রশ্ন করলে।

"কম রোজকার করি, হেঁটেই যেতে হবে। তুমি কি বাসে উঠবে? তুমি বলে ফেললুম মাপ করবেন।"

"তাতে কি হয়েছে, আপনি বয়সে, শুধু বয়সে কেন, সব বিষয়েই আমার চেয়ে বড়। এখন থেকে 'তুমি'ই বলবেন।"

"বেশ। বাসে যদি যেতে চাও, চল তোমাকে উঠিয়ে দিই। ওই দিকে চল তাহলে।"

"না, চলুন আমিও হেঁটে যাই।"

"সেই ভাল! গল্প করতে করেত চলে' যাওয়া যাবে।"

তারা যখন হাঁটছিল তখন একটা ধাবমান ট্যাক্সি থেকে গোবিন্দ সাণ্ডেলের বন্ধু জগমোহন সেন যে এদের দেখে চলে গেলেন তা এরা

টের পেল না। জগমোহন দিবসকে চিনতেন, কিন্তু দিবস যে বাড়ি থেকে অন্তর্ধান করেছে এ খবর জানতেন না। জানলে ট্যাক্সি থামাতেন হয়তো তিনি। কয়েকদিন পরে গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখে খবরটা শুনে অবাক হয়ে গেলেন এবং বললেন যে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন দিবস একটি মেয়ের সঙ্গে…।

কিছুক্ষণ হেঁটে একটু হেসে রঙ্গনা বলল, "আপনি একটা মেসের চাকর একথা কিন্তু ভাবতে ইচ্ছে করেনা।"

"কেন ?"

"কেমন যেন বাধে।"

"কেন বাধে বলতো"—পরমুহূর্তেই আবেগ সঞ্চারিত হল দিবসের কণ্ঠস্বরে—"এ যুগের ছেলে মেয়ে আমরা বাইরের তুচ্ছ ঐশ্বর্যকে আমরাও যদি বড় করে দেখি—"

"ঐশ্বর্যকে খুব বড় করে' দেখা অন্যায়, কিন্তু দারিদ্র্যও কি ভাল ?"

"অপরের উপার্জিত অর্থ আস্ফালন করা কি তার চেয়েও খারাপ নয় ?"

"অপরের মানে ?"

"নিজের বাবারও যদি হয় তা-ও আস্ফালন করার মধ্যে গ্লানি নেই কি ?"

"তা বলে' ভদ্রলোকের ছেলে মেসের চাকর হবে ?"

"আপিসের চাকর হওয়ার বেলায় তো এ আপত্তি ওঠে না ?"

"ওঠে না কারণ সমাজে ওটা চলে' গেছে।"

"এটাও চালিয়ে দিলে চলে' যাবে। মহাত্মাজি থার্ড ক্লাসে চড়ার পর থেকে থার্ড ক্লাসের অসম্মান ঘুচে গেছে যেমন।"

এর উত্তরে রঙ্গনা যা বললে তা যুক্তিযুক্ত নয় মোটেই, সে নিজেও যে সেটা না বুঝল তা নয়, কিন্তু তবু তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল,

"এ সব কথা কিন্তু মেসের চাকরের মুখে বড্ড বেমানান ঠেকছে যাই বলুন।"

"যদি মোটা মাইনের বড় দরের চাকর হতাম তাহলে ঠেকত না, নয় ?"—হেসে জবাব দিলে দিবস।

"আপনি একটা আদর্শ সৃষ্টি করবার জন্যে এ কাজ করছেন তা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু সবাই কি আপনার আদর্শ নেবে মনে করছেন? আমাদের দেশে তো আদর্শের অভাব নেই, মহাপুরুষেরও অভাব নেই, কিন্তু ক'টা লোক মানছে সে সব ? আপনার মাঝ থেকে শুধু কষ্ট করাই সার হবে।"

"তুমি 'গীতা' পড়েছ কখনও ?"

"না।"

"পড়লে বুঝতে পারতে কেন আমি এ কাজ করছি।"

"কেন বলুন তো ?"

"আমরা যদিও মনে করি যে 'আমি এটা করছি' 'আমি ওটা করছি' আসলে কিন্তু আমি কিছু করছি না, করবার ক্ষমতা নেই আমার, আমার ভিতর থেকে কে যেন আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। সেই 'কে'টা পরমাত্মা, না বিবেক, না ভগবান, না শিক্ষা তা জানি না। তার নির্দেশ অনুসরণ করা ছাড়া কিন্তু গতি নেই। সেই 'কে'টাই আসল মালিক। সুতরাং—"

মুচকি হেসে রঙ্গনা বললে, "আমি জানি সে 'কে'।"

"কে বল তো ?"

"বললে রাগ করবেন না তো ?"

"না রাগ করব কেন!"

"আপনার অহংকার।"

অপ্রত্যাশিত কথাটা শুনে দিবস মনে মনে একটু থমকে গেলেও

হেসেই জবাব দিলে, "তাই যদি হয়, তবু সেই অহংকারের নির্দেশই মানতে হবে আমাকে।"

"সেটা কি ভাল?"—রঙ্গনার চোখে হাসি চিকমিক করে' উঠল। ওই হাস্যদীপ্ত দৃষ্টির আলোকে আসল রঙ্গনার খানিকটা যেন চকিতে দেখা গেল। ক্ষণিকের জন্য দিবস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। রঙ্গনার বিচার যে ঠিক এ কথা তার নিজেরও মনে হল এবং মনে হওয়া মাত্র আদর্শের হিমালয়টা হঠাৎ বল্মীকস্তূপে পরিণত হয়ে গেল তার চোখের সামনে। তবু কিন্তু জবাব দিতে ছাড়ল না সে। অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবেই সে বললে, "ভাল মনে করি বলেই তো করছি।"

"মেসের চাকর থেকে আপনি সন্তুষ্ট থাকতে পারবেন?"

"না পারার কোনও হেতু দেখছি না।"

"একটা কথা জিগ্যেস করছি মাপ করবেন। বিয়ে হয়েছে কি আপনার?"

"না।"

"ও তাই"—হেসে ফেললে রঙ্গনা।

"আমি যদিও বিয়ে করি নি, কিন্তু মেসের চাকররা তো হরদম বিয়ে করছে এবং বেশ সুখেই আছে।"

"দরকার নেই আমার অমন সুখে"—বলে' ফেলেই রঙ্গনা বুঝতে পারলে যে বেঁফাস হয়েছে কথাটা। কানের পাশটা গরম হয়ে উঠল তার এবং যদিও সে ঠিক করেছিল যে দিবসের সঙ্গে হেঁটেই যাবে বরাবর কিন্তু মত বদলে ফেললে হঠাৎ।

"আর হাঁটতে পারছি না, একটা ট্যাক্সি ডাকুন।"

কথাটা বলেই কিন্তু অনুতপ্ত হল রঙ্গনা। ট্যাক্সি করে' গেলে এখনই অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে যাবে আবার। সংগীত ভবন খুলে যে ক'টা টাকা চুনীলাল পেয়েছে তা রঙ্গনার কাছেই আছে। তার

থেকেই সে ছবি কিনেছে। আয়নাও কিনতে হবে একটা, আবার ট্যাক্সি করে' গেলে…।

"ট্যাক্সি ?"

"থাক না হয় চলুন।"

"কাছে পিঠে ট্যাক্সি তো দেখতেও পাচ্ছি না।"

কিছুদূর গিয়েই কিন্তু ট্যাক্সি দেখা গেল একটা এবং দিবস হাত তুলতেই দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা।

"থামালেন কেন, হেঁটেই যাই চলুন।"

"না, তোমার কষ্ট হচ্ছে যখন, দরকার কি।"

ট্যাক্সিটা কাছে আসতে কিন্তু দেখা গেল যে ড্রাইভারের পাশে ওড়না-পরা একটি তরুণী বসে রয়েছে। শুধু তাই নয় তরুণীটি অপ্রত্যাশিতভাবে দিবসকে সেলামও করলে। দিবস প্রথমে বিস্মিত হয়েছিল কিন্তু আর একটু কাছে গিয়ে চিনতে পারলে। দিন কয়েক আগে যে বেদের মেয়েটি কিরণের বাড়ির কাছে নাচছিল, যাকে একটা টাকা দিয়েছিল সে, এ সেই। চোখে সুর্মা আর গায়ে ওড়না দিয়ে নূতন শ্রী খুলেছে। মেয়েটিকে সেলাম করতে দেখে রঙ্গনারও বিস্ময় কম হয় নি।

"মেয়েটি আপনাকে চেনে দেখছি।"

দিবস রঙ্গনার কথার জবাব না দিয়ে সেই মেয়েটিকেই বললে, "ও চিনতে পেরেছি তোমাকে, তুমিই সেদিন রাস্তায় নাচছিলে না ?"

"জী হাঁ। মগর অব ম্যয় নহী নাচতী হুঁ"—মেয়েটি হেসে জবাব দিলে এবং ড্রাইভারকে দেখিয়ে বললে—"ড্রাইভার সাব নে মুঝকো আপনী বিবি বানা লিয়া"—তারপর গ্রীবাভঙ্গি করে' ড্রাইভারের দিকে চেয়ে হাসলে।

"বাঃ"—বেশ খুশি হয়ে উঠল দিবস। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে

বলল, "আমি একটা ট্যাক্সি ভেবে তোমাদের দাঁড় করিয়েছিলাম। আচ্ছা, তোমরা যাও, খুব খুশি হলাম। এদিকে ট্যাক্সিও তো দেখছি না।"

"চলিয়ে ম্যয় আপকো পৌঁছা দুঁ। কিত্‌নী দূর যাইয়ে গা ?"

"শ্যামবাজার।"

"আ যাইয়ে।"

সারাটা রাস্তা রঙ্গনা আর একটি কথা বলল না। দিবসও না। পাশাপাশি নীরবেই বসে রইল দু'জনে। দু'জনের মনে কিন্তু একই কথা জাগছিল। দু'জনেই ভাবছিল—'হেরে গেলাম'।

দিবসের সম্বন্ধে ব্রজ যে খবরটা পেয়েছিল তা সূর্য চৌধুরিরও অজ্ঞাত রইল না। দিবস একটা মেসে সামান্য চাকর হয়ে আছে এ খবরে চৌধুরি মশায় বেশ বিচলিত হলেন একটু। বিচলিত হলেও বাইরে কিন্তু তা প্রকাশ করবার উপায় ছিল না। ব্রজ এবং গোবিন্দ সাণ্ডেল দু'জনের কাছেই তিনি 'ও-নিয়ে-আমি-মাথা-ঘামাতে-চাইনা-মোটেই' গোছের যে ভড়ংটা করেছিলেন তা ত্যাগ করে' ছেলের জন্য দাপাদাপি করে' বেড়াতে তাঁর লজ্জা করছিল। দ্বিতীয়ত দাপাদাপি করাটা নিরর্থকও মনে হচ্ছিল তাঁর। ঠিকানা না পেলে কোথায় তিনি ছুটোছুটি করবেন। তৃতীয়ত তাঁর বিশ্বাস ছিল দিবস কখনই এমন কিছু করবে না যা লজ্জাকর। সত্যিই মনে মনে তিনি প্রত্যাশা করছিলেন যে দিবসের ভবিষ্যৎ আচরণ তাঁর মুখ-রক্ষা করবে। গোবিন্দ সাণ্ডেলকে জোর গলায় তিনি বলতে পারবেন—"দেখলে ? আজকালকার ছেলেদের তুমি যা মনে কর তা নয় তারা।"

তবু তিনি বার কয়েক ট্র্যাম ডিপোয় গিয়ে কিরণকে ধরবার চেষ্টা করলেন কিন্তু ধরতে পারলেন না।

নিস্তারিণীও গিরিবালার দেখা পেলে না, তার ঠিকানাও মনে করতে পারলে না। তবে সে বলেছে গিরিবালার ঠিকানা সে থাকোর কাছ থেকে যোগাড় করতে পারবে। থাকোর সঙ্গে গিরিবালার খুব ভাব। থাকোর ঠিকানা নিস্তারিণী জানে, সেখানে গিয়েওছিল, কিন্তু থাকো তার মাসীর বাড়ি গেছে। বর্ধমান জেলার কোন এক গ্রামে তার মাসী থাকে। দিন পনর পরে সেখান থেকে ফিরবে থাকো। তখন গিরিবালার ঠিকানা পাওয়া যাবে।

সুতরাং নিষ্ফল আক্রোশে ছটফট করা ছাড়া ব্রজর আর গত্যন্তর রইল না।

গভীর রাত্রে নিজের নির্জন ঘরটিতে একা জেগেছিল রঙ্গনা। ঊর্মি যে গানটা তাকে দিয়ে গিয়েছিল তাতেই সুর দিচ্ছিল সে গুণ গুণ করে'। নিজের অন্তরের যে আকুলতাকে কিরণ দিয়েছিল ভাষা রঙ্গনার অন্তরের আকুলতা সুর দিচ্ছিল তাতে। গভীর নিশীথের অন্তরালে তার অন্তর যেন ধরতে চাইছিল সেই অধরাকে যে স্বপ্নে দেখা দেয় কিন্তু বাস্তবে ফোটে না। ফোটে না সে জানে, তবু গাইছিল—

শোন মর্ত্যের বনে শাখে শাখে
ডাকিছে বকুল যূথি চম্পা
মুগ্ধ কবির হিয়া ডাকে
ওগো, কর কর কর অনুকম্পা।

দশম পরিচ্ছেদ

সে যে অহংকার বশেই এত কাণ্ড করেছে রঙ্গনার কাছে একথাটা শুনে এবং স্বীকার করে' দিবস যে দমে যায় নি তা নয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার আত্ম-জিজ্ঞাসাও জেগেছিল একটা। সভায় দাঁড়িয়ে যে আদর্শ সেদিন সে প্রচার করেছিল সে আদর্শকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেও একথা তার মনে হচ্ছিল যে রিসার্চ করবার স্থযোগ পেলে এ নিয়ে সে এত হৈ চৈ করত না। শুধু তাই নয় তার বাবা যদি তাকে কলেজে যাবার জন্যে সেদিন অমন করে' না বকতেন তাহলেও হয়তো করত না। দু'দিন পরে হয়তো সে কলেজে যেতও। সত্যিই যেন এক টুকরো খড় কুটোর মতো ভেসে চলেছি আমরা অদৃশ্য এক স্রোতে, কোথা থেকে এক একটা ঢেউ আসছে আর ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের নব নব দেশে—এই ধরণের দার্শনিক কথাই মনে হচ্ছিল তার। রঙ্গনার সঙ্গে আকস্মিক দেখা এবং ক্রমশ মাখামাখি হওয়াটাকেও সে যদিও আর একটা অদৃশ্য তরঙ্গাঘাতের ফল স্বরূপই মনে করছিল তবু কিন্তু নিজের সঙ্গে বিচিত্র বোঝা-পড়াও চলছিল তার অহরহঃ। রঙ্গনাকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে কল্পনা করে' তার মানস-নয়ন যেমন স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছিল তেমনি জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তার অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী মনও। সে যেন স্বপ্নটাকেই যাচিয়ে দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিল। গোপনে গোপনে যে আদর্শের ধ্বজাবাহকরূপে সে রঙ্গনার সামনে নিজেকে প্রকট করে-ছিল রঙ্গনা যদি সেই ধ্বজাটাকে দেখে বিগলিত হয়ে পড়ত তাহলে হয়তো রঙ্গনার প্রতি তার আকর্ষণটা কমেই যেত। রঙ্গনা তার আদর্শটা মানুক এ অবশ্য সে চাইছিল, আদর্শটা সে সত্যি সত্যি মানবে কি না তা নির্ধারণ করবার জন্যে তার সঙ্গে আরও তর্ক করতেও প্রস্তুত

ছিল সে, কিন্তু প্রতিবাদ্ করাতে সে চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ মেয়ে হলে 'বাহবা' দিত তাকে। সে তার আদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল বলেই দিবসের অন্তরতম সত্তা যেন তাকে চুপি চুপি বলছিল—তোমার আদর্শের বিরুদ্ধবাদিনীও হয়েও ও তোমাকে যদি চায়···। এর পর আর ভাবতে পারছিল না সে, আশা করতে পারছিল না। আদর্শ-টাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকবে সে ঠিক করে' ফেললে, অন্য কোনও কারণে নয়, আদর্শের বিরোধ সত্ত্বেও রঙ্গনা তাকে চায় কি না এইটে দেখবার জন্যে। তার এক্স্পেরিমেণ্ট-লোলুপ মন উদ্গ্রীব হয়ে উঠল।

যে ছাত্রটি অঙ্ক পড়তে চেয়েছিল দিবস তার সঙ্গে দেখা করে' দুপুরে পড়াবার ব্যবস্থা করে ফেললে তার পর দিনই। ছেলেটির বা তার গার্জেনরা আপত্তি করলে না এতে। সুতরাং মেসের কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যা আটটার পর গহনচাঁদের বাড়িতে সরোদ শিখতে আসার আর কোন বাধা রইল না।

সন্ধ্যার পর গহনচাঁদের বাড়িতে গানের আসর খুব জমে উঠেছিল সে দিন। নবাগতা ছাত্র ছাত্রীরা প্রথমে যে ইমনের গৎটা গহনচাঁদের কাছে পেয়েছিল সেইটেই একযোগে বাজাচ্ছিল সেতার আর এস্রাজে। চমৎকার লাগছিল। গহনচাঁদ চোখ বুজে বসে' শুনছিলেন। রমজান আর সীতারাম আনন্দে বিভোর হয়ে বাজিয়ে চলেছিল। চুনীলাল বারান্দায় ওৎ পেতে বসেছিল পূর্ববৎ, যদি কোনও নূতন ছাত্র বা ছাত্রী আসে এই আশায়। তার মনেও ইমন সাড়া তুলেছিল, নিজের অজ্ঞাত-সারেই তার পায়ের আঙুলগুলো গতের সঙ্গে তাল রাখছিল। খানিকক্ষণ বেজে গৎ থেমে গেল। চুনীলালেরও দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল একটা। কই, আজ আর নূতন কেউ এল না তো!

"আমার নাচটা দেখবেন আজ আর একবার ?"

"বেশ তো।"

সবাই সরে বসল। মেজের উপর খড়ি দিয়ে আঁকা হল ময়ূর। উর্মি নাচতে লাগল। গহনচাঁদ মুখে নাচের বোলগুলো বলতে লাগলেন। রমজান সীতারাম বাজাতে সুরু করল আবার। দেখতে দেখতে জমে উঠল। সত্যিই চমৎকার নাচছিল উর্মি। বারান্দায় উপবিষ্ট চুনীলালও পায়ের পাতা নাচাতে নাচাতে সে কথা স্বীকার করলে মনে মনে।

উর্মির নাচ শেষ হতে গহনচাঁদ বললেন, "হয়েছে অনেকটা, এইবার আবীর নিয়ে এস একদিন। দেখা যাক আবীরের উপর ময়ূর ফোটাতে পার কি না।"

"রঙ্গনাদিকে আজ দেখছি না"—উর্মিই জিগ্যেস করলে প্রথমে।

"পড়াশোনা করছে বোধহয় ভিতরে। চুনী, রঙ্গনা কোথায় ?"

চুনীলাল জানে রঙ্গনা কেন ভিতরে বসে' আছে। সীতারাম রমজানও জানে। রঙ্গনা প্রসঙ্গ ওঠাতে তাদের চোখে চোখে একটা কথা হয়ে গেল। চুনীলাল রঙ্গনাকে যখন বকছিল তখন তারা বারান্দায় বসে তা শুনেছিল। গহনচাঁদ তখন বাড়ির ভিতরে আহ্নিক করতে ব্যাপৃত ছিলেন বলে' শুনতে পান নি। চুনীলালের ব্যবহারে সীতারাম রমজান দু'জনেই মনে মনে বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। না হয় একটা আয়না অসাবধানে ভেঙেই ফেলেছে তার জন্যে অত বকুনি কেন !

চুনীলাল ভিতরে আসতেই গহনচাঁদ আবার প্রশ্ন করলেন—"রঙ্গনাকে আজ দেখছি না ? পড়াশুনা করছে না কি ?"

"না, তার রাগ হয়েছে। আয়না ভাঙার কথা বলেছিলাম বলে'। এমন বিশেষ কিছুই বলি নি—এই এঁরা তো ছিলেন—"

সীতারাম এবং রমজান কিন্তু উভয়েই আড়চোখে চুনীলালের দিকে চেয়ে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তাতে চুনীলালকে থেমে যেতে হল।

"আরে, একটা আয়না ভেঙেছে তো কি হয়েছে, ডেকে নিয়ে এস ওকে, বুঝলে ?"—গহনচাঁদ বললেন হেসে—"ডাক—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ যাই।"

চুনীলাল চলে গেল। অকারণে কিংবা কেবল যে আয়না ভাঙার জন্যে, চুনীলাল রঙ্গনাকে বকেছিল তা নয়। সংগীত ভবনের টাকা খরচ করে' রঙ্গনা ছবি কিনেছে, সিনেমা দেখেছে, ট্যাক্সি চড়ে এসেছে, গিরিডি যাবে বলে' বায়না ধরেছে। যাবেও, ছাড়বে না। আয়নাটা দু'দিন পরে কিনলেও তো চলে। চুনীলাল নিজের হাড় বা মাংসের কথা আর চিন্তাই করছিল না, সে সব তো বহুদিন আগেই গেছে, অবশিষ্ট আছে শুধু চামড়াখানা, সেইটেকেই প্রাণপণে বাঁচাবার চেষ্টা করছে চুনীলাল। কিন্তু তা-ও বাঁচান যাবে না, ওই চামড়া দিয়ে ডুগ-ডুগি বাজিয়ে তবে এরা ছাড়বে। এই ধরণের চিন্তা করতে করতে চুনীলাল বাড়ির ভিতর গেল। গিয়ে দেখলে রঙ্গনা নিজের পড়ার ঘরে খিল দিয়ে বসে আছে। খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইল চুনীলাল। চোখ দুটো চক্ চক্ করতে লাগল।

"রঙ্গনা, জামাইবাবু ডাকছে তোকে।"

ভিতর থেকে কোনও সাড়া এলো না।

"বেশ তো, কাল আয়না কিনেই আনিস। আমি কি কিনতে মানা করেছি তোকে—এই রঙ্গনা শুনছিস ?"

"তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।"

চুনীলাল ভ্রূকুঞ্চিত করে' আরও ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন দরজাটার দিকে। তারপর ছাতে চলে গেলেন নির্জনে বিড়িটি ধরিয়ে চিন্তা করবার জন্যে।

একটু পরে রঙ্গনা যখন বাইরে এল তখন তার মুখ দেখে মনে

হল না যে একটু আগে তার মনে তুফান বইছিল। সপ্রতিভ মুখে মৃদু হেসে সে বললে, "আমাকে ডাকছিলে বাবা?"

"কি করছিলি ভিতরে?"

"পড়ছিলাম।"

"ঊর্মি খুঁজছে তোকে।"

"সেই গানটার কথা জিগ্যেস করছিলাম। কালকেরটা নয়, সেই সেদিন যেটা দিয়েছিলাম—"

"ও, সেটার সুর বসিয়েছি একটা। বাবাকে এখনও শোনানো হয় নি।"

"শোনা তাহলে।"

রমজান এবং সীতারাম রঙ্গনাকে দেখেই অকারণ পুলকে পুলকিত হয়েছিল মনে মনে। তাদের উদ্ভাসিত মুখে সে ভাবটা ফুটে উঠলেও কিন্তু নীরব ছিল তারা। গানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়াতে সীতারাম আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না।

"হাঁ হাঁ গাইয়ে গাইয়ে শুনা যায়।"

"জরুর"—রমজানও সায় দিলে সোৎসাহে।

রঙ্গনা বসল। গহনচাঁদ স্নেহভরে চেয়ে রইলেন তার দিকে। আশ্চর্য, এর মধ্যেই গানে সুর দিতে শিখেছে! সেদিনকার সে গানটাতে বেশ চমৎকার সুর দিয়েছিল। রঙ্গনা হার্মোনিয়মটা টেনে নিয়ে বাজাতে লাগল।

খানিকক্ষণ বাজিয়ে গহনচাঁদের দিকে চেয়ে বলল, "আমার লজ্জা করছে এত লোকের সামনে গাইতে।"

"লজ্জা কি! সবাই তো ঘরের লোক। সেদিন কনফারেন্সে অত লোকের সামনে গাইলি—"

"ভাল হয় নি সুরটা।"

"শুনিই না।"

রঙ্গনার সত্যিই গান গাইতে ইচ্ছে করছিল না। মনের ভিতর কি যেন একটা তোলপাড় করছে—যা অযৌক্তিক কিন্তু অনিবার্য, যা সে বলতে পারছে না কিন্তু অনুভব করছে। কয়েকদিন থেকেই মনে হচ্ছে একটা অদৃশ্য জাল যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তার দিকে, তাকে ধরা পড়তেই হবে, তার সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা চিন্তা কল্পনাকে বিসর্জন দিয়ে চিরাচরিত প্রথায় যূপকাষ্ঠে বাড়িয়ে দিতেই হবে গলাটা। নারীর স্বাধীনতা নেই—বাল্যে পিতামাতার, যৌবনে স্বামীর, বার্ধক্যে পুত্রের অধীন হয়ে থাকাটাই তার জীবনের চরম সার্থকতা। এদেশের সবাই একথা মেনেছে, তাকেও মানতে হবে। প্রতিটি পয়সার জন্য তাকে হাত পাততে হবে অপরের কাছে…।

ঘাড় হেঁট করে' অনেকক্ষণ ধরে' হার্মোনিয়ম বাজিয়ে তার পরে গানটা ধরলে সে। গানটা ধরবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তার মনের রং বদলে গেল। কিরণের কবি মন যে আশার রঙে আলোকিত হয়ে-উঠেছিল, যে রং সে তার গানের প্রতিটি কথায় মাখিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, সেই রং রঙ্গনার মনেও সঞ্চারিত হল। কিরণের গানের কথাগুলো তারই মনের কথা হয়ে উঠল যেন। আবেগভরে প্রাণ দিয়ে সে গাইতে লাগল—মিথ্যা জেনেও স্বপ্নটাকে আঁকড়ে ধরতে চাইল।

কার ডাকে ওগো কার
তিমির রজনী শেষে
খুলিছে ঊষার দ্বার।
সুর জাগে মনে মনে
রং লাগে বনে বনে
কার কর-পরশনে
কাঁপিছে বীণার তার।

কমল কলির দলে
জাগে সুরভির আশা
আঁধারের বুকে জ্বলে
কোন সে আলোর ভাষা
বিজন পথের বাঁকে
এলো কে চিনি না তাকে
সহসা কাহার ডাকে
ঘুম ভাঙে তমসার।

"চমৎকার হয়েছে! বাঃ—"

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন গহনচাঁদ। সীতারাম ও রমজানও প্রায় সমস্বরে বলে উঠল—"সাবাস!"

ঠিক এই সময় দিবসও এসে হাজির হল দ্বারপ্রান্তে। তার হাতে সরোদ। বাইরে কার দিকে চেয়ে যেন সে বললে—"ওটা বাইরেই থাক। দেওয়ালে ঠেসিয়ে রেখে দাও। এই নাও তোমার ভাড়া।"

একটি কুলি জাতীয় লোককে পয়সা দিয়ে দিবস ঘরে এসে ঢুকল।

"ও, তুমি, এস এস। আর একটু আগে এলে রঙ্গনার সুর দেওয়া চমৎকার গান একটা শুনতে পেতে। এস, বস।"

গহনচাঁদের আহবানে দিবস হাসিমুখে এসে বসল সপ্রতিভভাবে। কিন্তু মনে মনে তখনও সে উৎকণ্ঠিত হয়েছিল। কারণ যে এক্স্পেরিমেণ্টটা সে করতে যাচ্ছিল তার ফলাফলটা কি হবে তা তখনও অনিশ্চিত ছিল তার কাছে।

দিবস আসাতে অন্যান্য ছাত্রীরা ভাবল এইবার বোধহয় সরোদের ক্লাস আরম্ভ হবে। তাছাড়া তাদের সকলের যাওয়ার সময়ও হয়েছিল, একে একে চলে গেল সবাই। ঊর্মিও রঙ্গনাকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে

গিয়ে ফিস ফিস করে' কি বললে (খুব সম্ভবত এই গানটাও যাতে রেকর্ড হয় সেই সম্বন্ধে কিছু একটা) তারপর চলে গেল। উর্মি চলে যাবার পর বারান্দার দেওয়ালে টেসানো প্রকাণ্ড আয়নাটা রঙ্গনার চোখে পড়ল।

"আয়নাটা কার ? আপনি এনেছেন না কি ?"—ঘরে ঢুকে দিবসের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে রঙ্গনা।

"হ্যাঁ।"

তারপর গহনচাঁদের দিকে ফিরে বললে, "আপনাকে কিন্তু অনুমতি দিতে হবে।"

"কিসের ?"

গহনচাঁদের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

"সেদিন দেখে গেলাম রঙ্গনা তার আয়নাটা ভেঙ্গে ফেলেছে, আমি তাকে একটা আয়না কিনে দিচ্ছি, এতে আপনি আপত্তি করতে পারবেন না।"

"না, না আপনি কেন—এ অন্যায় কিন্তু—"

এই পর্যন্ত বলেই রঙ্গনা থেমে গেল।

গহনচাঁদ হাসিমুখে চুপ করে' রইলেন ক্ষণকাল, তারপর বললেন— "তুমি দিতে চাইছ দাও, আপত্তি করব না। কিন্তু তুমি যদি মনে কর যে এই ভাবে বাঁকা পথে আমাকে প্রণামী দেওয়া হল, তাহলে ভুল করবে। সত্যিই যদি আমার শিষ্য হতে চাও তাহলে একটা কথা জেনে রেখ, গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক প্রাণের। ওতে কোন রকম ভেজাল চলবে না।"

"সে তো ঠিকই। আমি সে ভাবে আনি নি। আমি—"

গহনচাঁদের পরবর্তী প্রশ্নে আয়না-প্রসঙ্গ চাপাই পড়ে গেল।

"তুমি সরোদ কি বাজিয়েছ আগে ?"

"মাস ছয়েক সেধেছি।"

"শোনাও দেখি একটু।"

দিবস সরোদটা বাঁধতে লাগল। এই আয়নার ব্যাপারে একটা ঘটনা কিন্তু ঘটে গেল যা সকলের চোখ এড়িয়ে গেলেও সামান্য নয় খুব। রমজান এবং সীতারাম উভয়েই দিবসের সম্বন্ধে হঠাৎ খুব সশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল। তারা মুখে যদিও কিছু বলল না, কিন্তু তাদের চেখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল সে ভাষা। তারা দিবসের সম্বন্ধে কিছু না জেনেও কৃত-নিশ্চয় হল যে ছেলেটি 'রইস্' অর্থাৎ অভিজাত-বংশীয়। তাদের শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় আরও বেড়ে গেল একটু পরে দিবস যখন সরোদে বসন্ত আলাপ স্থরু করলে। দিবস যে এমন চমৎকার সরোদ বাজাতে পারবে তা গহনচাঁদও প্রত্যাশা করেন নি। খুব খুশি হয়ে উঠলেন তিনি। রঙ্গনারও নিশ্চয় ভাল লাগত, কিন্তু সে উঠে গিয়েছিল। দিবসের সামনে বসে থাকতে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল সে। উঠে গিয়ে সে ঘরে খিল দিয়েছিল আবার। আর একটি ঘটনাও ঘটল নেপথ্যে। বিড়িটি শেষ করে' ছাত থেকে নেমে এসে চুনীলালও আয়নাটি দেখতে পেলে বারান্দায়। 'ও, এর মধ্যেই কেনা হয়ে গেছে' এই ভাষা ফুটে উঠল তার চোখের দৃষ্টিতে। বাইরের ঘরে বসন্তের গৎ খুব জমে উঠেছে তখন। চুনীলাল একবার উঁকি মেরে দেখলে কে বাজাচ্ছে। দিবসকে দেখে মনটা আরও অপ্রসন্ন হয়ে উঠল তার। ও সেই ধূর্ত ছোকরা এসেছে দেখছি, ওকে দিয়েই রঙ্গনা আয়নাটা আনিয়েছে ঠিক। একটি পয়সা খরচ না করে ওস্তাদ হতে চায় ছোকরা—এই ভাবটা মনের ভিতর খেলে যেতেই বসন্তের সমস্ত মাধুর্য ব্যর্থ হয়ে গেল তার কাছে। সক্রোধে আর একটা বিড়ি বার করে দেশলায়ের উপর সেটা ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে গেল সে রাস্তায়।

বসন্তের গৎ শেষ হতেই গহনচাঁদ সীতারাম এবং রমজান তিনজনেই

সমস্বরে বাহবা দিয়ে উঠলেন। গহনচাঁদ সোৎসাহে বললেন, "ছ'মাসের মধ্যে বেশ তো দখল হয়েছে তোমার। হবে, চেষ্টা করলে ভাল হাত হবে তোমার। দরবারি কানাড়া জান?"

"না।"

"ওই গৎটা তাহলে শেখ। রঙ্গনার খাতায় টোকা আছে। রঙ্গনা কোথা গেলি। রঙ্গনা, ও রঙ্গনা—"

"যাই—"

নেপথ্যে রঙ্গনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

রঙ্গনার খাতা থেকে গৎটা টুকে নাও, তারপর আমি বাজিয়ে দেখিয়েও দেব"।

রঙ্গনা এসে হাজির হল।

"তোর খাতায় দরবারি কানাড়ার যে গৎটা টোকা আছে সেটা এঁকে দে তো।"

দিবস বললে, "আমি সঙ্গে কোনও খাতা তো আনি নি, কাল এসে টুকে নিয়ে যাব।"

"কাল যে আমি গিরিডি যাচ্ছি।"

"ও কালই গিরিডি যাবি না কি তোরা?"—গহনচাঁদ প্রশ্ন করলেন।

"হ্যাঁ"—তারপর দিবসের দিকে চেয়ে রঙ্গনা বললে, "খাতাটা আপনি না হয় নিয়ে যান।"

"সেই ভাল। টুকে দিয়ে যাব।"

রঙ্গনা খাতা আনতে ভিতরে চলে গেল আবার।

"তুমি কি কর?"—হেসে প্রশ্ন করলেন গহনচাঁদ।

"চাকরি।"

"ও।"

এর বেশি আর কিছু জানবার কৌতূহল হল না তাঁর। দিবস সুরজ্ঞ

এবং ভদ্রলোক এর বেশি আর কোনও পরিচয়ের প্রয়োজনই ছিল না তাঁর। রঙ্গনা ফিরে এল একটু পরে।

"এই নিন"—খাতাটা দিয়েই চলে গেল সে।

খাতাটা নিয়ে দিবস গহনচাঁদকে বললে, "আজ তবে উঠি?"

"এস।"

দিবস বেরিয়ে যেতে রঙ্গনাও ভিতর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল আর একটা দ্বার দিয়ে।

"আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।"

তড়িতস্পৃষ্টবৎ ফিরে দাঁড়াল দিবস।

"কি কথা?"

"আপনি বড় লোকের ছেলে, ইচ্ছে করলেই একটা আয়না কিনতে পারেন তা মানছি। কিন্তু সে ইচ্ছেটা আপনি এমনভাবে আস্ফালন করবেন তা প্রত্যাশা করি নি। আয়নাটা ফিরিয়ে দিয়ে আমি আপনাকে অপমান করতে চাই না। শুধু একটা অনুরোধ করছি উপহার দেবার ছুতোয় আমাদের দারিদ্র্যকে এমনভাবে আর উপহাস করবেন না।"

কথাগুলো বলেই চলে গেল রঙ্গনা।

স্মিতমুখে দিবস খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। একটা অবর্ণনীয় আনন্দে তার সমস্ত মন যেন পাখা মেলে উড়ছিল। তার এক্সপেরিমেণ্ট সফল হয়েছে! না, রঙ্গনা আজকালকার মেয়েদের মতো হ্যাংলা নয়, তার আত্মসম্মানবোধ আছে। আয়নাটা পেয়ে সে খুশি হয় নি ক্ষুব্ধ হয়েছে এই আনন্দে মশগুল হয়েই সে সমস্ত রাস্তাটা হয়তো চলে যেত। কিন্তু পরের মোড়েই দেখা হয়ে গেল চুনীলালের সঙ্গে। দিবসের সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই চুনীলাল দাঁড়িয়ে ছিল ওৎ পেতে।

"শিখলেন সরোদ ?" হাসি মুখেই এগিয়ে এল চুনীলাল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

নিমেষের মধ্যে দিবসের মনে পড়ে গেল আগের দিনের ঘটনাটা এবং সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত পুরে সে মনিব্যাগটা বার করে' ফেললে।

"আপনার আপিসে এসে মাইনে জমা করা হয়ে উঠবে না। এখনই টাকাটা নিয়ে নিন। রসিদটা পরে না হয় নিয়ে নেব আপনার কাছ থেকে। দশ টাকা করে' মাইনে তো ? অ্যাডমিশন ফীও লাগে না কি কিছু ?"

চুনীলাল এটা প্রত্যাশা করে নি। একটু থতমত খেয়ে গেল। এত দ্রুতবেগে একটা লোকের সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তন করতে সে চায়ও না, অভ্যস্তও নয়।

"দাঁড়ান"—ভ্রূকুঞ্চিত করে' চকিতে সে একবার দিবসের মুখের দিকে চাইলে, তারপর একটু হেসে বললে—"দাঁড়ান, দাঁড়ান। হয়তো আপনিই আমার কাছে পাবেন কিছু। আয়নাটা তো আপনি এনেছেন, কত দাম নিলে ?"

"ওর দাম দিতে হবে না। ওটা আমি রঙ্গনাকে দিলুম।"

"দিলেন ? মানে ?"

চুনীলালের দুই ভ্রূর মাঝখানে চার পাঁচটা গভীর রেখা-পাত হ'য়ে গেল। ছোকরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাইনে দিতে চাইছে, আয়নার দাম নিতে চাইছে না, সেদিন রঙ্গনার সেতারের দামটাও দিয়েছিল না কি। ...যে সন্দেহটা এক্ষেত্রে অভিভাবক শ্রেণীর লোকেদের স্বভাবতঃই হওয়া উচিত তা যে চুনীলালের হল না তা নয়, কিন্তু বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে সেটাকে খুব বেশি আমোল দেওয়াও সংগত মনে হল না তার। চুপ করে' চেয়ে রইল সে।

দিবস হেসে বললে, "মানে টানে কিছু নেই। আমার সামনেই আয়নাটা ভেঙে গেল সেদিন, এমনি দিলাম তাই—"

"ভালই হল"—চুনীলালও হেসে জবাব দিলে—"সামনেই ওর বিয়ে তো, কাজে লেগে যাবে!"

"বিয়ে না কি?'

"হ্যাঁ।"

চুনীলাল আর একবার চাইলে দিবসের মুখের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে'। কিন্তু এমন কিছুই দেখতে পেলে না যা সন্দেহজনক।

"দশ টাকা দেব? না আরও কিছু লাগবে?"

"না, দশ টাকাই।"

টাকাটা দিয়ে নমস্কার করে' দিবস চলে গেল। নোটটা হাতে করে' তার প্রস্থান পথের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুনীলাল। তার হঠাৎ কেমন যেন আশা হল, মনে হল মেঘ কেটে যাচ্ছে বোধহয়, এইবার সুরাহা মিলবে একটা।

দিবসের ঠিকানাটা পাওয়া গেলে কি ভাবে অগ্রসর হবেন তা মনে মনে এঁচে রেখেছিলেন সূর্য চৌধুরি। ব্রজ বা নিস্তারিণীর উপর তিনি নির্ভর করছিলেন না ঠিক—যদিও সেদিক থেকেও ঠিকানাটা পাবার সম্ভাবনা ছিল—তিনি আশা করছিলেন কিরণ এসে তাঁকে ঠিকানাটা দিয়ে যাবে। কিরণের সঙ্গে তাঁর হঠাৎ একদিন রাস্তায় অপ্রত্যাশিত ভাবেই দেখা হয়েছিল। কিরণের কাছ থেকে যে উত্তরটা তিনি পেয়েছিলেন তা-ও অপ্রত্যাশিত। তবু তিনি প্রত্যাশা করছিলেন। কিরণকে যখন তিনি জিগ্যেস করলেন—"দিবস কোথায় থাকে জানো?"

কিরণ উত্তর দিলে—"হ্যাঁ জানি।'

"ঠিকানাটা দাও তো।"

ক্ষণকাল চুপ করে' থেকে কিরণ একটু হেসে বললে, "মাপ করবেন আমাকে। তার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে তার ঠিকানা আপনাকে জানাব না। তার সঙ্গে দেখা হলে ফের তাকে জিগ্যেস করব, সে যদি আপত্তি না করে তাহলে ঠিকানাটা জানিয়ে আসব আপনাকে।"

"বেশ!"

আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে এর বেশি আর কিছু বলা চলে না। একটু হেসে উকিল সূর্য চৌধুরি একটি টোপ শুধু ফেলে এসেছিলেন।

"তাকে বোলো যে তার যাতে মন্দ হয় এমন কিছু কখনও করি নি, এখনও করবার ইচ্ছে নেই। তবে তোমাদের চেয়ে আমাদের বয়স বেশি, অভিজ্ঞতাও বেশি। আমাদের অভিজ্ঞতা যদি তোমরা মূল্যহীন বলে' মনে কর, নিও না। কিন্তু তার জন্যে ঘর-ছাড়া হবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। নূতন যুগের নূতন আদর্শ সত্যিই যদি যুগান্তকারী হয় তা মেনে নিতে আমার অন্তত কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু তার জন্যে এমন একটা বেয়াড়া কাণ্ড করবার দরকার কি? আমি তার বাবা এটা সে ভুলে যাচ্ছে কেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ সে তো ঠিকই। আমি বুঝিয়ে বলব তাকে।"

কিরণ যখন চলে গেল তখন তার উপর গভীর একটা শ্রদ্ধা হল সূর্য চৌধুরির। তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে কিরণ নিশ্চয়ই দিবসকে বুঝিয়ে বলবে এবং ঠিকানাটা দিয়ে যাবে। অবশ্য একটা ভয় তাঁর ছিল। কিরণের কাছে যে যুক্তিটা তিনি দিয়েছিলেন সেটা এত দুর্বল যে তা বলতে নিজেরই বাধছিল তাঁর, দিবসের কাছে ও যুক্তি কি টিকবে? অত বড় ঐতিহাসিক সব উদাহরণ রয়েছে—বুদ্ধ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ, তাঁরা আদর্শের জন্যেই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন, একথা দিবসের মনে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তাছাড়া দিবস যে কেন ঘর

ছেড়ে বেরিয়েছে তা' কি তিনি জানেন না? ঝরণা যে কারণে পাহাড় ফেটে বেরোয় দিবসও সেই কারণে বেরিয়ে গেছে—প্রিয়বন্ধু গোবিন্দ সাণ্ডেলকে আসল কারণটা প্রথম দিনই তিনি বলেছিলেন। ও যে এখন কি করবে কোথায় যাবে কোন্ রাস্তা নেবে তা নিজেই বোধহয় ও জানে না। বেগটাই ওর প্রধান সম্বল এবং সেটা দুর্বার। এ সবই তিনি জানেন। তবু সেদিন ওই দুর্বল যুক্তিটা তিনি কিরণের কাছে পেশ করেছিলেন, ইচ্ছে করেই পেশ করেছিলেন, তার কারণ ওকালতি করতে করতে এ অভিজ্ঞতাটা তাঁর হয়েছে যে অতিশয় দুর্বল যুক্তিও অনেক সময় বড় বড় জাঁদরেল হাকিমের মন টলিয়ে দেয় যদি তা আঁতে ঘা দিতে পারে। এই কথাগুলো হয়তো দিবসের আঁতে ঘা দিতে পারবে। এ শুনে দিবস হয়তো ফিরেও আসতে পারে। ফিরে যদি না আসে ঠিকানাটা জানাতে অন্তত তার আপত্তি হবে না। আর একটা বিচিত্র ব্যাপারও ঘটছিল তাঁর মনে। সূর্য চৌধুরির মনের একটা অংশ যদিও সাগ্রহে কামনা করছিল যে দিবস ফিরে আসুক, আর একটা অংশ কিন্তু সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল যে বিদ্রোহী দিবস এমন একটা কিছু করে' ফেলুক যাতে গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখটি চুণ হয়ে যায়। সেই 'এমন একটা কিছু' যে ঠিক কি জাতীয় জিনিস হবে তা সূর্য চৌধুরির কল্পনাতীত ছিল, কিন্তু তা যাই হোক মহিমাময় যেন হয় এই তিনি আকাঙ্ক্ষা করছিলেন সর্বান্তঃকরণে। তাকে বিষয় সম্পত্তি থেকে চ্যুত করবার ভয় দেখালেই সে সুট সুট করে' ফিরে আসবে গোবিন্দ সাণ্ডেলের এই ধারণাকে ভূশায়ী করে' দেবার মতো একটা জোরালো প্রমাণ তিনি আশা করছিলেন দিবসের আচরণ থেকেই। দিবস তাঁর এ আশা কি পূর্ণ করবে? যদি না-ও করে —(তাঁর উকিল মন অন্যান্য সম্ভাবনাগুলোর সম্বন্ধে উদাসীন ছিল না)— তাহলে ঠিকানা পাওয়ার পর কি করবেন তা তিনি মোটামুটি ভেবে

রেখেছিলেন। ব্রজ তাঁকে যতটা নিশ্চিন্ত ভাবছিল ততটা নিশ্চিন্ত তিনি ছিলেন না। দিবস মেসে যে একটা সামান্য চাকর হয়ে আছে এ খবর বিশ্বাসই করছিলেন না তিনি, খবরটা নিতান্তই বাজে উড়ো-খবর মনে হচ্ছিল তাঁর। দিবস অনায়াসেই একটা টিউশনি জুটিয়ে নিতে পারবে, আর কিছু না পারুক, সে মেসের চাকর হতে যাবে কেন? কিন্তু দিবসের বক্তৃতার কথাগুলো মনে পড়ে' মাঝে মাঝে আবার সন্দেহও হচ্ছিল। কি জানি কিছুই বলা যায় না—! ঠিক খবর না পাওয়া পর্যন্ত এ সংশয়ের মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। ঠিকানা না পেলে ঠিক খবরও পাওয়া যাবে না। তিনি ভেবে রেখেছিলেন ঠিকানা পেলে তিনটি উপায়ের একটি অবলম্বন করবেন। প্রথম চিঠি লেখা যেতে পারে। কিন্তু এই চিঠি লেখা ব্যাপারটায় খুব বেশি উৎসাহ পাচ্ছিলেন না তিনি। তাঁর উকিল-বিবেকের সঙ্গে আত্মসম্মানবোধ মিলে গোপনে গোপনে নিরুৎসাহিত করছিল তাঁকে। লিখিত কিছু করাটা উচিত হবে কি না দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভাবছিলেন তিনি। আবেগের মুখে বা অনবধানতাবশত এমন কিছু হয়তো লিখে ফেলতে পারেন যার জন্যে পরে অনুতাপ করতে হ'তে পারে। দ্বিতীয়ত, সেখানে যাওয়া যেতে পারে। নিজেই যেতে পারেন তিনি। কিন্তু এইখানেও একটা ভয় ছিল তাঁর, যদিও এই ভয়টার বিরুদ্ধে নিজের সঙ্গেই তর্ক করছিলেন তিনি—(দিবসের মত ছেলে তাঁকে কি অপমান করতে পারে, এ কি সম্ভব!)—তবু ভয়টা ছিল এবং তার মূলে ছিল ওই আত্মসম্মানবোধ। তৃতীয়ত, নিজে না গিয়ে অপর কাউকে পাঠানো যেতে পারে। কাকে পাঠাবেন তা-ও নির্বাচন করে' রেখেছিলেন মনে মনে। ব্রজ কিংবা গোবিন্দ সাণ্ডেলকে নয়। কারণ প্রথমত এ দু'টি লোকের কাছে দিবসের সম্বন্ধে যে আপাত-ঔদাসীন্য তিনি বহাল রেখেছেন তা ক্ষুণ্ণ হবে, দ্বিতীয়ত এদের মধ্যে যে কোনও একজন গেলে উদ্দেশ্যটিও ব্যর্থ হয়ে

যাবে। দিবস যদিও বা আসত এদের জন্যেই আসবে না। প্যাচপেচে ভাবোচ্ছ্বাস দিবস সহ্য করতে পারে না একেবারে। ব্রজ হয়তো গিয়ে বুক চাপড়ে হাউ হাউ করে এমন কাঁদতে সুরু করে' দেবে যে দিবসকে সরে' পড়তে হবে বাধ্য হয়ে। ঠিকানাই বদলে ফেলবে হয়তো আবার। আর গোবিন্দ সাণ্ডেলকে দেখলে তো বদলে ফেলবেই। সুতরাং এই দু'টি লোক যদিও হিতৈষী এবং সহজলভ্য তবু এদের দিবসের কাছে পাঠাবার কথা চিন্তাও করলেন না তিনি। তিনি তাঁর ভাগ্নে ঘণ্টুর কথা ভেবে রেখেছিলেন। ঘণ্টু আজকালকার ছেলে, দিবসের প্রায় সমবয়সীও। তাকে পাঠালে বরং কাজ হতে পারে। ঘণ্টুকে চিঠি লিখলেই সে আসবে। কিন্তু তাঁর নিজেরও যেতে ইচ্ছে করছিল মাঝে মাঝে। এ বিষয়ে এখনও মতিস্থির করতে পারেন নি বলেই ঘণ্টুকে চিঠি লেখেন নি।

সূর্য চৌধুরির মানসিক পরিস্থিত যখন এই ধরণের অনিশ্চয়তার দোলায় দোদুল্যমান তখন গোবিন্দ সাণ্ডেল যে খবরটি আনলেন তাতে দোলাটা থেমে গেল হঠাৎ।

"শুনেছ হে, যা ভেবেছিলাম আমি ঠিক তাই!"—এই গৌরচন্দ্রিকা করে' গোবিন্দ সাণ্ডেল ঢুকলেন এসে।

"কি?"

"যা বলেছিলাম তাই। একটি আধুনিক মেয়েকে নিয়ে তোমার আধুনিক ছেলে রাতদুপুরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়।"

"কে বললে তোমাকে?"

"জগু সেন। স্বচক্ষে দেখেছে।"

"ভুল দেখেছে।"

"জগু সেন ভুল দেখবার লোক নয়। সে স্পষ্ট দেখেছে দিবস একটি মেয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করতে করতে চলেছে ফুটপাথের উপর দিয়ে।"

গোবিন্দ সাণ্ডেল সবিস্তারে এবং সালংকারে বর্ণনা করলেন ঘটনাটির। শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে' রইলেন সূর্য চৌধুরি। তারপর মৃদু হেসে পা দুলিয়ে বললেন, "বিশ্বাস করলুম না।"

"দেখ, জেগে যে ঘুমোয় তার ঘুম ভাঙানো শক্ত। জগু সেনের কথা অবিশ্বাস করবার মানে? তাকে তুমি মিথ্যেবাদী বলতে চাও?"

"না, জগু সেন হয়তো ঠিকই দেখেছে। ঘটনাটা হয়তো ওই, কিন্তু তুমি ওতে রং চড়িয়ে যেটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ সেটা আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই।"

"তা না করবারই বা হেতু কি?"

"যথেষ্ট প্রমাণ নেই। তা ছাড়া দিবসকে আমি চিনি।"

"তাহলে আমার আর বলবার কিছু নেই। আমি উঠলুম।"

গোবিন্দ সাণ্ডেল বাড়ি গেলেন না। তিনি গেলেন বেলেঘাটার একটা মেসে। তাঁর এক দূর সম্পর্কের শালা তাঁকে বলেছিল যে বেলেঘাটার ঐ মেসটা না কি যত ক্ষেপারি লোকের আড্ডা। যদি দিবসকে সেখানে পাওয়া যায় এই আশায় গেলেন তিনি সেখানে। কিন্তু সেখানে যে যাচ্ছেন তা সূর্য চৌধুরিকে বলে' গেলেন না। গোবিন্দ সাণ্ডেলও বন্ধুর প্রতি কর্তব্যবোধে দিবসকে খুঁজছেন রোজই। কিন্তু গোপনে গোপনে। তাঁরও কেমন একটা রোক চড়ে গিয়েছিল ভিতরে ভিতরে। ছেলেটাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

গোবিন্দ সাণ্ডেল চলে' গেলে সূর্য চৌধুরি ঘণ্টুকে আসবার জন্যে চিঠি লিখলেন।

গভীর রাত্রি। দ্বিতলের একটা ঘরে গহনচাঁদ একা অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। আলো জ্বেলে রঙ্গনা সন্তর্পণে এসে ঢুকল। খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ঘুমন্ত পিতার মুখে দিকে। শান্ত প্রসন্ন মূর্তি।

"বাবা!"

"কে, ও রঙ্গনা, কি?"

"তোমার কাছে কিছু টাকা আছে কি?"

"কেন, ক'টাকা চাই, টাকার কি দরকার এত রাত্রে?"

"এখন দরকার নেই। কাল সকালে তো আমি গিরিডি যাব—তাই—"

"ও। চুনী বলেছিল টাকা দিয়ে দেবে সে।"

"মামার কাছ থেকে টাকা নেব না আমি।"

"কেন, কি হল, ঝগড়া হয়েছে বুঝি?"

রঙ্গনা হাঁটু গেড়ে বিছানার পাশে বসে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল।

"এই দেখ এই দেখ, কি হয়েছে বল্ না?"

রঙ্গনা কিন্তু কিছুই বলল না নিজের কাছে সে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। গিরিডি যাওয়াটা এমন বিশেষ কোনও প্রয়োজনীয় ব্যাপার নয় যার জন্যে এত হাঙ্গামা করতে হবে। কলেজের মেয়েরা আমোদ ক'রে যাচ্ছে সে-ও যাবে বলেছে। মামা আরবার বোলপুর যেতে আপত্তি করেন নি তো। এখন দোকানটা ফেল পড়ার পর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছেন। মামীমা রাগ করে' চলে গেছেন বাপের বাড়ি। মামা এবারও টাকা দিতে চাইছেন কিন্তু সে নেবে না। আয়নার কথা অমনভাবে বলছেন কেন তিনি? সে কি দিবসবাবুকে আয়না আনতে বলেছিল? খানিকক্ষণ বালিসে মুখ গুঁজে থেকে রঙ্গনা অবশেষে উঠে দাঁড়াল।

"কি হয়েছে ব্যাপারটা?"

"থাক আর টাকা চাই না। গিরিডি যাব না।"

"ক'টা টাকা চাই তোর?"

গহনচাঁদ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন।

"আর টাকার দরকার নেই। গিরিডি নাই গেলাম। কথা রাখতে পারলাম না বলে, মেয়েরা একটু ঠাট্টা করবে, তা করুক।"

"টাকা দিচ্ছি তোকে। ক'টা টাকা চাই বল্ না। আবার চুপ করে' আছে! কত চাই?"

"গোটা পনের হলেই হবে।"

"আমার কাছে দু'খানা দশটাকার নোট আছে, তাই নিয়ে যা।"

"নাই গেলাম।"

"না, না যা। সবাই মিলে আমোদ করে' ঠিক করেছিস যখন, যা। কাল সকালেই গাড়ি নাকি?"

"হ্যাঁ।"

সহসা রঙ্গনা গহনচাঁদের গলা জড়িয়ে ধরে' তার কোলে বসে' কাঁধে মাথা রাখলে। গহনচাঁদ দু'হাত দিয়ে তাকে বেষ্টন করে' বলে উঠলেন, "দেখ, দেখ পাগলীর কাণ্ড দেখ। তুই কি আর ছোট আছিস যে কোলে নেব?"

একটু পরে রঙ্গনা নেবে গেল। নিচের ঘরে, দিবসের দেওয়া আয়নাটায় নিজের প্রতিফলিত মূর্তির দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। নিজের চেহারা দেখছিল না, দিবস তাকে কি চক্ষে দেখছে তাই কল্পনা করছিল সে। দিবসের চক্ষে সে কি কেবল এই দেহটা? না, আর কিছু? তার অসংখ্য সংগত অসংগত দাবীর ফর্দ কি দিবস কল্পনা করেছে কোনও দিন? দুঃসময়ে তাকে রক্ষা করবার সামর্থ্য আছে কি তার? পরমুহূর্তেই তার মনে হল এ ধরণের চিন্তা কেন আসছে মনে! দিবস তো এমন কিছুই প্রকাশ করে নি যা…ছি, ছি, ভারী অন্যায়। লজ্জিত হয়ে ছুটে চলে গেল সে পাশের ঘরে।

দিবস এবং রঙ্গনার আলাপ যে ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে ঊর্মির মুখে এই সংবাদ পেয়ে কিরণ খুব গম্ভীর হয়ে গেল। রঙ্গনাকে আয়না কিনে দিয়েছে একটা? যে আদর্শের ধ্বজা বহন করে' সে গৃহত্যাগ করে' এসেছে, (একমাত্র পুত্র হয়েও পিতার মনে অত বড় আঘাত হানতে ইতস্তত করে নি) সে আদর্শের সঙ্গে এ ঘটনাটা ঠিক খাপ খাচ্ছে না তো। কৃচ্ছ্রসাধনের আগুনে কর্মযজ্ঞ করবার এই কি নমুনা? কিরণের গম্ভীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মুচকি হেসে ঊর্মি বললে—"কেমন লোক দেখুন তো দিবসবাবু, যে-ই রঙ্গনাদিকে ভাল লেগেছে অমনি একটি আয়না কিনে দিলেন। আর আপনার জন্যে আমি এত করে' মরছি আপনি তো সামান্য মাথার কাঁটাও কিনে দেন নি আমাকে একটা।"

ঊর্মির এই উক্তির অন্তরালে যে মিনতি প্রচ্ছন্ন ছিল তা কিরণের কাছে প্রছন্ন রইল না। একটু হেসে সে চেষ্টা করলে সেটাকে আরও প্রচ্ছন্ন করে' দিতে।

"অতএব বোঝা যাচ্ছে তোমাকে আমার ভালো লাগে নি।"

"মিথ্যুক কোথাকার।"

হাসি উপচে পড়ল ঊর্মির চোখ থেকে। সে হাসির প্রত্যুত্তরে কিরণকেও একটু হাসতে হল। পরমুহূর্তেই কিন্তু সে গম্ভীর হয়ে গেল আবার। দীনতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এই গাম্ভীর্যটাই তার স্বাভাবিক মুখভাব হয়ে গেছে। শত্রুর চোখে ধূলো দেবার জন্য ক্ষেত্রে যেমন নানারকম কৌশল অবলম্বন করা হয় কিরণ তেমনি খাড়া করেছিল এই বিষণ্ণ গাম্ভীর্যটা। পরাজয়ের গ্লানিটা সে বুঝতে দেবে না কাউকে। অন্তরের সমস্ত আশা আকাঙ্খাকে নিরুদ্ধ করে' ক্ষুরধার সংকীর্ণ পথে আত্মোপলব্ধির দিকেই হয়তো অগ্রসর হচ্ছে সে, কিন্তু তার আধ্যাত্মিক

আনন্দ সে পাচ্ছে না কিছুতেই। আধিভৌতিক অভাবের তাড়নায়, অপরিতৃপ্ত আকাঙ্খার অনলে সব পুড়ে যাচ্ছে। সে জীবনকে স্থূল ভাবেই উপভোগ করতে চায় (বৈদান্তিক বুলি সে মাঝে মাঝে আওড়ায় বটে, কিন্তু তা তার অন্তরের নিগূঢ় সত্তার আকুতি হয় নি এখনও), ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করবার জন্যেই প্রাণপণ করছে সে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে পশুর মতো তা সংগ্রহ করতে তার বাধছে। স্বল্প শিক্ষার আলো-আঁধারিতে আত্মসম্মানটাকেই সে লাঠির মতো আঁকড়ে ধরে' আছে। যখন তখন আস্ফালনও করছে সেটা। আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে এ বাজারে ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করা যে অসম্ভব এ-ও সে বুঝছে এবং যতই বুঝছে ততই অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চারিদিকে, ততই সে আস্ফালন করছে ওই আত্মসম্মানের যষ্টিটা। মানসলোকের এই অন্ধকারেই বাস তার। এই অন্ধকারেই সে কল্পনায় স্বপ্নময় কাব্যলোকও সৃষ্টি করেছে। উর্মিকে সে পেতে চায় এই কাব্যলোকের মানস-বিহারেই। উর্মি নিজে যদিও বাস্তব জগতে তার পাশে এসে দাঁড়াতে রাজি আছে কিন্তু তার এ অধঃপতন কিরণ কল্পনা করতে চায় না। সে জানে বাস্তবের উর্মিকে পরিপূর্ণ ভাবে পাবার ক্ষমতা তার নেই। উর্মি কাছে এলে সে তাই বিব্রত হয়ে পড়ে। তার মুখের দিকে ভাল করে' চাইতেও ভয় হয় তার। উর্মি যে নিজেকে অবনত করে' ধূলিতে নেমে আসতে চাইছে এর ইঙ্গিতও সে উর্মির আচরণে দেখতে চায় না ; অথচ দেখতে লোভও হয়। আর একবার আড়চোখে চাইলে সে উর্মির দিকে, দেখলে উর্মির হাসিমাখা চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে তখনও। কিরণ কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল একটু। তার মনে হল কিছু একটা বলা উচিত।

"আমি গরীব মানুষ, তোমাকে দেবার মতো জিনিস কোথায় পাব বল ?"

"বাজে কথা বলবেন না। দেবার মতো জিনিস কেবল বাজারেই পাওয়া যায় বুঝি?"

কিরণ উর্মির মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে, চোখের হাসিতে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে যেন।

"আমি চললুম।"

পরমুহূর্তেই চলে গেল উর্মি। কিরণ বসে রইল চুপ করে'। আত্মসম্মানের লাঠিটা সবলে চেপে ধরে' অনেকক্ষণ বসে রইল সে। তারপর দিবসের কথা মনে পড়ল। প্রাণের প্রাচুর্যে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে কি কাণ্ডটাই ও করছে! রঙ্গনার সঙ্গে আলাপ হতে না হতেই তার প্রেমে পড়ে' গেল, আবার প্রেমে পড়তে না পড়তেই উপহার নিয়ে ছুটোছুটি করছে। না,—মনে মনে মাথা নাড়লে কিরণ—এ ধরণের আচরণ তার কাছে প্রত্যাশা করে নি সে, এ আচরণ প্রশংসনীয়ও নয়। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল সূর্য চৌধুরির সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনাটা। শুধু তাই নয় দিবসের ঠিকানাটা এবং দিবসের এই সব আচরণ তাঁকে জানানো বন্ধু হিসেবে তার কর্তব্য কি না এ-ও সে চিন্তা করতে লাগল। তার এ চিন্তার উৎস নিছক বন্ধু-প্রীতি বা অবচেতন মনের ঈর্ষা যাই হোক, চিন্তাকে বেশিক্ষণ কিন্তু আমোল দিলে না সে। ঠিক করে ফেললে দিবসের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত সে কিছু করবে না। তাকে না জানিয়ে প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ করাটা অনুচিত হবে। তাছাড়া এ বিষয়ে তার বক্তব্যটা শোনা উচিত বই কি। চেয়ার থেকে উঠে সে ক্যাম্প চেয়ারটায় শুয়ে পড়ল। চোখ বুজে শুয়ে রইল চুপ করে'। তার মানস নয়নের সম্মুখে রঙ্গনা আর দিবসের ছবিটা ফুটে উঠল পাশাপাশি। দিবস যেন আবেগভরে কি বলে চলেছে, অবনতমুখী রঙ্গনা শুনছে যেন বসে, তার মুখে সরমস্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠেছে। হঠাৎ সে দেখতে পেল উর্মি যেন আড়ি পেতে শুনছে সব, তার চোখে মুখেও একটা দুষ্টু হাসি

ঝলমল করছে। ঊর্মির সঙ্গে হঠাৎ যেন তার চোখাচোখি হয়ে গেল। চোখোচোখি হতেই ঊর্মির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে, চোখের কোণে টলমল করতে লাগল অশ্রু।

তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে শুয়েই রইল সে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

উপর্য্যুপরি কয়েকদিন সৌদামিনীর সঙ্গে দিবসের দেখাই হয় নি। দিবস ভোরে উঠে বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত্রি দশটা এগারোটার পর, অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারে না সৌদামিনী। পটলির স্বামীর অসুখ কিন্তু বেড়ে চলেছে ক্রমশ, সৌরেন ডাক্তার আরও দু'একবার এসে দেখে গেছেন, ইন্‌জেক্‌শন্ দিয়েছেন, কিন্তু কিছু হচ্ছে না। সৌদামিনী দিবসকে ধরবে বলে জেগে বসেছিল সেদিন। মোহন ঠাকুরের হোটেলে খবর নিয়ে জেনেছিল যে দিবস সন্ধ্যার সময়ই খেয়ে গেছে কখন ফিরবে কে জানে। দিবসের ঘরের সামনেই আঁচল পেতে শুয়ে পড়েছিল সৌদামিনী তাই।

দিবস ফিরল যখন তখন প্রায় এগারোটা হবে। গহনচাঁদের বাড়িতে গানের আসরটা খুব জমেছিল সেদিন। দরবারি কানাড়ার গৎটা ওই-খানে বসেই সাধছিল সে।

"কত রাত করলে বলতো!" সৌদামিনী উঠে বসল।

"এ কি, এখানে শুয়ে কেন?"

"তোমার অপেক্ষায়। আজকাল অত ভোরে উঠে কোথায় বেরিয়ে যাও, দু'দিন এসে তোমাকে পাইনি।"

"আর একটা টিউশনি নিয়েছি। গিরিবালা ক'দিন থেকে কাজে যাচ্ছে না কেন বলতো? রোজই ভাবি খোঁজ করব কিন্তু ভুলে যাই।"

"তারও জ্বর হয়েছে। আর হরুর অসুখও তো কমবার কোনও লক্ষণ নেই। সেই সম্বন্ধেই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করব বলে' বসে আছি।"

"হরু কে?"

"পটলির স্বামী। কাশির সঙ্গে থোকো থোকে রক্ত উঠছে তার।"

"তাই নাকি! সৌরেন এসেছিল?"

"তিনি বলছেন হাসপাতালে নিয়ে যেতে।"

"ও, তাই নাকি! সে নিজেই না কি হাঁসপাতাল করেছে একটা শুনছি।"

"হ্যাঁ, সেই হাসপাতালেই নিয়ে যেতে চাইছেন। কি যে করা যায়, মহা মুশকিলে পড়া গেছে। পটলি তো কেঁদে কেটে অনথ করছে।"

দিবস ঘরে ঢুকল। সৌদামিনীও ঢুকল পিছু পিছু।

সরোদটা রেখে দিবস সৌদামিনীর দিকে চেয়ে বললে, "আমি এখনই তাহলে সৌরেনের কাছে যাই একবার। দিনের বেলা তো আমার সময় নেই মোটে, আর দিনে তার দেখা পাওয়াও মুশকিল। তুমি ঘরের ভেতরই শোও ততক্ষণ তাহলে।"

"এখনই যাবে, এত রাত্রে?"

"তাতে কি হয়েছে?"

"এত রাত্রে নাই বা গেলে?"

দিবস হাসিমুখে চাইলে একবার সৌদামিনীর দিকে। কোনও কথা বললে না। কথা বলে অনর্থক সময় নষ্ট করে' কি হবে এই ভাবটা বরং যেন ফুটে উঠল তাব হাসি-মাখা দৃষ্টিতে। 'অপর কেউ হলে' সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর অত রাত্রে নিতান্ত অনাত্মীয়ের জন্যে ডাক্তারের বাড়ি ছুটত না'—এই ধারণাটাই যেন দিবসকে যেতে উৎসাহিত করলে আরও। এর মধ্যে বাহাদুরি দেখানোর ভাব একটু ছিল, তাছাড়া ছিল অপ্রত্যাশিত দুরূহ সমস্যার দুর্জয়তাকে অতিক্রম করবার জেদ। কাজটা শক্ত মনে হওয়ামাত্রই সেটা করবার জন্যে লোলুপ হয়ে ওঠাটাই তার স্বভাব। এই স্বভাবই তাকে ঘর-ছাড়া করেছে।

"অনেক রাত হয়ে গেছে আজ আর থাক।"

একথা সৌদামিনী আর একবার বললে যদিও কিন্তু মনে মনে সে জানত (প্রত্যাশাই করছিল) যে দিবস যাবেই, কোনও কথা শুনবে না। আর একটু হেসে দিবস পরমুহূর্তেই বেরিয়েও গেল। সৌদামিনী গালে হাত দিয়ে বললে, "কি দস্যি ছেলে বাবা"। তারপরে তার নিজের উপরই রাগ হল—এত রাত্রে অসুখের কথা না বললেই হত। কিন্তু পর-মুহূর্তেই আবার মনে হল, না বললেই বা উপায় কি? শেষটা রাগ হল গিরিবালার উপর, পটলির উপর এবং সর্বশেষে নিজেদের দুরদৃষ্টর উপর। মিটমিটে লণ্ঠনের আলোয় দিবসের ঘরে একা দাঁড়িয়ে হঠাৎ সৌদামিনীর মনে হল দিবস ছাড়া তাদের নির্ভরযোগ্য আপনার লোক কেউ নেই। তারপর মনে হল দিবস পরের ছেলে, ভদ্রলোকের ছেলে, খেয়ালের মাথায় শখ করে' খোলার ঘরে দু'দিনের জন্য এসেছে, দু'দিন পরে চলে যাবে। মনে হওয়ামাত্র সে কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগল। বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল যেন।

সৌরেন ডাক্তারও আদর্শবাদী লোক। কোন্ শিক্ষিত বাঙালী নয়? ভাবের জগতে বাঙালীর যে প্রতিভা কর্মের জগতে তার শতাংশের একাংশও সম্বল যদি তার থাকত তাহলে সে বিশ্বজয় করতে পারত। যে সংহতি যে একতা থাকলে কর্মজগতে উন্নতি হয় তা বাঙালীর নেই। সে যা করছে তা একাই করছে। অখ্যাত সৌরেন ডাক্তারও তাই করছিল। গরীব বলে' সে মেডিকেল কলেজে পড়বার সুযোগ পায় নি। স্কুল থেকে তাকে পাশ করতে হয়েছিল। পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ে হল তার। বিয়ে করেছিল সে একটি বিধবার মেয়েকে। অতসী রূপসী ছিল যদিও কিন্তু ঠিক রূপের জন্যে তাকে বিয়ে করে নি সৌরেন। সে তাকে বিয়ে করেছিল টাকার জন্যেই।

তার শাশুড়িই তাকে ছোটখাটো ডিসপেন্সারিটি করে' দেন, শাশুড়ির টাকাতেই মোটরটিও কিনেছিল সৌরেন। গঙ্গার ধারে দোতলা বাড়িটিও সৌরেনেরই হবে শাশুড়ির মৃত্যুর পর, কারণ অতসী তাঁর একমাত্র মেয়ে,—এইসব ভেবেই পিতৃমাতৃহীন স্বল্পবিত্ত সৌরেন বিশেষ খোঁজ-খবর না করেই (খোঁজ-খবর নেবার মতো অভিভাবকও তার ছিল না বিশেষ) অতসীকে বিয়ে করেই ফেলেছিল। বিয়ে করবার আগে একটু বিস্মিত সে যে হয় নি তা নয়—এমন সুন্দর মেয়ে, টাকা-কড়ি আছে অথচ পাত্র জুটছে না কেন—কিন্তু বিস্ময়টাকে আমোল দেবার মতো সচ্ছলতা তার নিজের ছিল না। বিবাহের প্রস্তাবটাকে সৌভাগ্য ভেবে বিবেচনা না করেই সে বিয়ে করে' ফেলেছিল। বিয়ে হয়ে যাবার অল্পদিন পরেই সে লক্ষ্য করলে যে অতসীর রোজ সন্ধ্যার সময় জর হয়, শুধু অতসীর নয় অতসীর মায়েরও। তারপর সে খবরটা পেলে শ্বশুরবাড়িরই দূর সম্পর্কীয় একজন আত্মীয়ের মুখে। অতসীর ঠাকুরদা, বাবা দু'জনেই যক্ষ্মায় মারা গেছেন। অতসী এবং অতসীর মা-ও মারা গেল তার বিয়ের কিছুদিন পরে।

ডাক্তার হিসেবে এই যক্ষ্মারোগের সমস্যাটাকে এতদিন নৈর্ব্যক্তিক ঔদাসীন্য সহকারে আলোচনা করছিল সে। অতসী এবং অতসীর মায়ের মৃত্যুর পর ডাক্তার সৌরেনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল হঠাৎ। আমাদের দেশের প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে যে করাল ব্যাধি ছায়া-পাত করছে, নিদারুণ দারিদ্র্য যে ব্যাধির মূল কারণ, শুধু আর্থিক দারিদ্র্য নয়, নৈতিক দারিদ্র্য, মানসিক দারিদ্র্যও, যে ব্যাধির আধুনিক চিকিৎসা বিপুল ব্যয়সাধ্য, সেই ব্যাধির বিরুদ্ধে সহায়সম্বলহীন আদর্শবাদী এই ছোকরা ডাক্তার যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল একদিন। ঠিক করে' ফেললে গরীব যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা বিনা পয়সায় করবে সে। গঙ্গার-ধারের সে বাড়িটাকে রূপান্তরিত করে' ফেললে অতসী ক্লিনিকে। একজন সহৃদয়

রেডিওলজিস্ট এবং একজন সহৃদয় যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করে', তাদের খোশামোদ করে', (প্রায় হাতে-পায়ে ধরে') ঠিক করে' ফেললে যে কেবল খরচটুকু মাত্র নিয়ে তাঁরা অতসী ক্লিনিকের রোগী রোগীনীদের সাহায্য করবেন। অতসী ক্লিনিকে দশটি রোগীর থাকবার ব্যবস্থা করেছে সে। রোগীদের বাড়িভাড়া লাগে না, ডাক্তারের ফী লাগে না। ওষুধ রোগীরা নিজেদের পয়সায় কিনে আনে, খাবার খরচও তাদের নিজেদের। দুটি নিতান্ত গরীব রোগীর খাবার এবং ওষুদের খরচ সৌরেন নিজে দেয়। এ সব ছাড়া প্রত্যেক রোগীকে প্রতিদিন একটাকা করে' দিতে হয় চাকর মেথর আলো প্রভৃতির জন্য। যারা দিতে পারে না তাদের ব্যয়ভার সৌরেন নিজেই বহন করে। এই ব্যাপারেই জীবন উৎসর্গ করবে ঠিক করেছে সে। সকালে বিকালে সে ডিসপেন্সারিতে বসে এই ক্লিনিকের জন্যই অর্থোপার্জন করবে বলে'। বাকি সময়টা এই ক্লিনিকেই থাকে সে। একাধারে সে-ই ডাক্তার এবং নার্স। একটি মেথরকে তালিম দিয়ে সে নিজের সহকারী করে' নিয়েছে। তার অবর্তমানে সেই মেথরই রোগীদের দেখা শোনা করে। অতি দীনভাবে ক্লিনিকটা আরম্ভ করেছে সে। এটাকে সত্যিকার সেবা-সদন করে' তুলতে হবে এই তার জীবনের আকাঙ্খা।

দিবস ডিসপেন্সারিতে গিয়ে সৌরেনের দেখা পেল না। কম্পাউণ্ডারটি বললে, "তিনি তো তাঁর ক্লিনিকে আছেন। রাত্রে তো ফিরবেন না!"

"সেখানে ফোন নেই?"

"নেবার চেষ্টা করছেন, এখনও পান নি। আপনার খুব বেশি যদি দরকার থাকে চলে যান সেখানেই।"

ঠিকানাটা নিয়ে দিবস বেরিয়ে পড়ল।

...সমস্ত শুনে সৌরেন ডাক্তার বললে, "আমার বিছানা খালি

আছে একটা। হরুকে এইখানেই পাঠিয়ে দাও। এক্‌স্‌রে করে' তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। ওখানে থেকে চিকিৎসা হবে না ভাল।"

"তুমি এইখানেই থাক না কি?"

"না থেকে উপায় কি, এতগুলি রোগী রয়েছে। একটা ভালো নার্স পাচ্ছি না ভাই কিছুতে। পঁচাত্তর টাকা মাইনে দিতে রাজি আছি। কিন্তু টি. বি. শুনে কেউ আসছে না। আমাদের দেশে দলে দলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে শুনছি কিন্তু কই এদিকে তো এগোচ্ছে না একজনও। চল তোমার হরুকে দেখেই আসি।"

"এত রাত্রে যাবে আবার?"

"চল, আমার তো এই কাজ, তোমাকে পৌঁছেও দিয়ে আসি, তেল পেয়েছি আজ।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল সৌরেন ডাক্তার।

হরিদাসবাবু আর আত্মসম্বরণ করে' থাকতে পারলেন না। মোহরের ঘড়াটা খুলে দেখবার খুবই লোভ হল তাঁর। সুযোগও ঘটল।

সেদিন টুরে বেরুবেন তিনি।

দিবসকে বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত চল না, আমাকে তুলে দিয়ে আসবে। জিনিসপত্র সামলে টিকিট করে' ভিড় ঠেলে একা ট্রেনে চড়াই দায় আজকাল।"

"বেশ তো যাক না তোমাকে তুলে দিয়ে আসুক"—গোবর্ধনবাবুও সমর্থন করলেন কথাটা।

হরিদাসবাবুর স্যুটকেস আর কুঁজোটা নিয়ে দিবস বেরিয়ে পড়ল তাঁর সঙ্গে। ফুটপাথে হরিদাসবাবু আগে আগে চলছিলেন দিবস পিছু পিছু যাচ্ছিল। হরিদাসবাবু মুশকিলে পড়েছিলেন। কথাটা কি করে' পাড়া যায়। একটা ধাবমান খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে

সেটাকে থামালেন তিনি. তাঁর মনে হল সমস্যাটার সমাধান হল এতে। দিবসকে দিয়ে মালপত্র বইয়ে নিয়ে যেতে বাধছিল তাঁর, কিছু বলতেও পারছিলেন না, ট্যাক্সিটা পাওয়াতে সুবিধা হ'ল। আর একটা সুবিধাও হল ট্যাক্সিতে দিবসকে ঘনিষ্ঠতর ভাবে পাওয়া যাবে। ট্যাক্সিটা থামতে মালপত্র তুলে দিয়ে দিবস যথারীতি ড্রাইভারের পাশে বসতে যাচ্ছিল হরিদাসবাবু বলে' উঠলেন, "আপনি আমার পাশে এসেই বসুন।"

দিবস সবিস্ময়ে হরিদাসবাবুর দিকে চাইতেই হরিদাসবাবুর দৃষ্টি হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"আসুন। এইখানেই বসুন।"

ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়তে পড়তে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ঘটনার আবির্ভাবে মনে যে ভাব হয় সেই রকম ভাব নিয়ে দিবস গিয়ে বসল হরিদাসবাবুর পাশে। বিশেষ কোনও ভূমিকা না করে' হরিদাসবাবু হেসে দিবসের দিকে চেয়ে বললেন, "সেদিন ছাত্র-সভায় আপনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে আমি উপস্থিত ছিলাম"—তারপর ড্রাইভারকে বললেন—"হাওড়া চল।"

দিবস যে কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

হরিদাসবাবুই আবার কথা বললেন, "তারপর থেকে আমি বরাবর আপনাকে লক্ষ্য করে' যাচ্ছি এবং এখন আর বলতে বাধা নেই সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেছি আমি। এখন আপনার আসল পরিচয়টা জানবার ভারী আগ্রহ হচ্ছে আমার। আপনার বাড়ি কি এখানেই? হঠাৎ এ খেয়ালই বা হল কেন আপনার?"

দিবস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "আপনাকে সব খুলে বলছি, কিন্তু একটি প্রতিশ্রুতি চাই, একথা মেসের আর কাউকে বলবেন না, কিংবা আমার বাড়িতেও খবর দেবেন না।"

"বেশ দিলাম।"

দিবস তখন সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে' বললে—"আপনাদের মেসে চাকরি করে, এবং দুটো টিউশনি করে' মাসে আমি আজকাল আশি টাকা রোজগার করছি। এতে আমার খরচটা চলে যাচ্ছে। আরও কিছু বেশি রোজগারের উপায় যদি হয় তাহলে সে টাকাটা আমি জমাব, জমিয়ে আসছে বছর আবার ওই রিসার্চ লাইনেই ঢুকব ইচ্ছে আছে, যদি অবশ্য সুযোগ পাই।"

সমস্ত শুনে হরিদাসবাবু চুপ করে' রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর একটু কেসে গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "দেখুন যে কথাটা আমি বলতে যাচ্ছি তা শুনেই যেন চটে যাবেন না। আপনি নিজের পৌরুষের জোরে নিজের পায়ে দাঁড়াতে যাচ্ছেন তাতে বাধা সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়, নিজের মহত্ত্ব আস্ফালনও আমি করতে যাচ্ছি না। আমি শুধু এইটুকু বলে রাখছি যে দরকার হলে কিছু টাকা আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি আপনার রিসার্চের জন্যে।"

"এখন তো টাকার দরকার নেই। এ বছর তো ঢোকা যাবে না। আসছে বছর টাকার দরকার হবে, ততদিনে আমি জমিয়ে ফেলতে পারব কিছু।"

"তা যদি পারেন ভালই। আর না যদি পারেন আমার কথাটা মনে রাখবেন। আমি হাজার পাঁচেক পর্যন্ত আপনাকে দিতে পারব। শোধ যদি না-ও করেন—"

হরিদাসবাবুর কথা শেষ করতে দিলে না দিবস।

"বাঃ শোধ করব বই কি যদি নি।"

হরিদাসবাবু মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন দিবসের দিকে। তাঁর লাইফ ইনসিওরেন্সের টাকাটার হয়তো একটা সদ্গতি হবে ভেবে পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি।

ট্যাক্সি হাওড়া স্টেশনে এসে থামল।

"কুলি ডাকুন, আপনি আর ঘাড়ে করবেন না স্যুটকেসটা"—হেসে বললেন হরিদাসবাবু।

"আপনি যদি এরকম করেন তাহলে তো মেসের চাকরিটি ছাড়তে হবে আমাকে। আপনার মতো লোকের অন্তত সংকোচ হওয়া উচিত নয় এসবে—"

"আচ্ছা, বেশ যা খুশি করুন তবে। আমি টিকিটটা করি গিয়ে।"

হরিদাসবাবু গেট দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়েছিলেন। দিবস কাঁধে স্যুটকেস এবং একহাতে কুঁজো নিয়ে ভিড়ে পিছিয়ে পড়েছিল। সে তার প্ল্যাটফর্ম টিকিটটা আর কুঁজোটা এক হাতে সামলাতে ব্যস্ত ছিল বলেই যে স্যুটকেসটার দিকে তেমন মন দিতে পারছিল না তা নয় হরিদাসবাবুর নূতন পরিচয় পেয়ে তার মন আকাশে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল। হরিদাসবাবু তাকে টাকা দেবেন বলে' নয়, হরিদাসবাবুকে সে মুগ্ধ করতে পেরেছে বলে'। তার অসমসাহসিক প্রকৃতি দমকা হওয়ার মতো তার জীবনতরণীর পালে লেগে তাকে যে পথে নিয়ে গেছে সে পথের মোহ তার নিজেরই কেটে আসছিল ক্রমশ—ওই মেসের চাকরি আর টিউশনি তার ভাল লাগছিল না মোটেই। কিন্তু জেদের বশে তবু সে ফেরেনি, ফিরবেও না। নিজের পায়ে ভাল ভাবে দাঁড়িয়ে তবে সে ফিরবে। কিন্তু মনে মনে তার দুঃখ ছিল যে তার এই কৃচ্ছ্রসাধনের প্রশংসা কেউ করল না। হরিদাসবাবুর প্রশংসাটা তাই উপভোগ করছিল সে। না, কেউ তার প্রশংসা করেনি। বাবা, কিরণ, সৌদামিনী, কেউ নয়। এমন কি রঞ্জনা পর্যন্ত—স্যুটকেসটা কার মাথায় যেন লেগে গেল।

"এই কুলি দেখতে পাও না চোখে, ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছ"!

চমকে ফিরে দাঁড়াল দিবস। রঙ্গনাও অবাক হয়ে গেল।

"একি, তুমি এখানে কোথা থেকে?"

"আমি গিরিডি থেকে ফিরছি। আপনি স্যুটকেস ঘাড়ে করে' কোথায় চলেছেন?"

"আমার মনিবকে উঠিয়ে দিতে যাচ্ছি ট্রেনে। আসছি এখনই।"

দিবস চলে গেল। রঙ্গনার সঙ্গিনীরা এগিয়ে বাসে ট্যাক্সিতে উঠল। রঙ্গনা দিবসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। মিনিট পাঁচেক পরেই ফিরে এল দিবস।

"সত্যি আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন যাই বলুন, কুলিগিরি করবেন তা' বলে'?"

"স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাই কুলিগিরি করেছিলেন তা জান? আমরা তো নগণ্য লোক!"

কথাটা দিবসের নিজেরই কানে লাগল। মনে হল 'চাল' দেওয়ার মতো শোনাল। এ রকম কথা সে যদি আর কারও মুখে শুনত তাহলে নির্জলা চালিয়াৎ ভাবত তাকে। মনে হওয়ামাত্রই লজ্জা হল তার। অপরের কাছে বাহাদুরি দেখানোর লোভটা সে কিছুতেই সামলাতে পাচ্ছে না কেন? হরিদাসবাবুর সঙ্গে এখনই যে সব কথা হল, তার মধ্যেও এই ধরণের একটা সুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেমন যেন উপচে পড়ছিল হাবভাবে।

রঙ্গনা হেসে বললে, "আসল বিদ্যাসাগর বড় হতে পারেন কিন্তু নকল বিদ্যাসাগর হাস্যকর! আপনাকে মানাবে আপনার অরিজি—মানে স্বকীয়তায়"—তারপর হেসে বললে—"কেমন চমৎকার শুদ্ধ বাংলা বলছি দেখছেন? জানেন, আমরা ক'জন বন্ধু মিলে আবার আজ প্রতিজ্ঞা করেছি যে পারতপক্ষে ইংরেজি কথা বলব না"—কথাটাকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে রঙ্গনা। কিন্তু কৃতকার্য হল না।

"আমার স্বকীয়তাটাও তো বরদাস্ত করতে পারলে না সেদিন"— দিবস বললে।

"কোন্‌টা ?"

"আয়না কিনে দেওয়াটা।- ও অবস্থায় অন্য কেউ হলে দিত না, মানে দিতে সাহস করত না, আমি বলেই' দিয়েছিলাম, ওইটেই আমার স্বকীয়তা। কিন্তু তুমি সেদিন যা বললে তাতে মনে হয় তোমার কাছে স্বকীয়তারও কোন দাম নেই।"

চলতে চলতে রঙ্গনা ঘাড় ফিরিয়ে বললে, 'বুঝতে পারলাম না ঠিক। একটা আয়না কিনে দেওয়ার মধ্যে বিশেষত্বটা কি থাকতে পারে তাতো বুঝতে পারছি না !"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে অবশ্য মনে মনে বলছিল—"বুঝেছি, কিন্তু বলব না সেটা !"

দিবস বললে, "একটা উদাহরণ দিচ্ছি"—বলেই আবার চুপ ক'রে গেল। উপমার সাহায্যে নিজের চরিত্রের যে বিশ্লেষণটা সে করেছিল তা অকপটে বলা উচিত কি না খটকা লাগল তার। উপমাটাও হাস্যকর।

"কি উদাহরণ ?"

দিবস তবু চুপ করে রইল।

"চুপ করে' আছেন কেন, বলুন না কি উদাহরণ ?"

দিবস অবশেষে বলাই ঠিক করে' ফেললে। অর্থাৎ না বলে' পারলে না। 'এর কাছে যদি অকপটে না বলতে পারি তাহলে কার কাছে আর বলব' এ কথাগুলো যদিও স্পষ্টভাবে তার মনে জাগল না কিন্তু তার মনে হল এর কাছে বললে আর ক্ষতি কি !

"উদাহরণটা হচ্ছে, সব প্রাণীই দরকার হলে লাফায়, কিন্তু লাফানোটা ফড়িংয়েরই একটা বিশেষত্ব বলতে পার। অতি সামান্য কারণে

তড়াক করে' সে লাফিয়ে ওঠে। আমার সেই দশা। সেদিন তুমি যখন আয়নাটা ভেঙে ফেললে তখন তোমার মুখটা দেখে ভারী কষ্ট হয়েছিল আমার। আয়না কিনে দেওয়ার লোভটা সামলাতে পারলাম না কিছুতে তাই। কিন্তু তুমি সেদিন ওটার যে ব্যাখ্যা করলে তাতে অপমানিত বোধ করেছিলাম, সত্যি বলছি। একটা কথা বিশ্বাস কর তুমি, আস্ফালন করবার মতো বিশেষ কিছু নেই আমার, সামান্য, যেটুকু আছে সেটাকে সাজিয়ে গুজিয়ে ফলাও করে' দেখবার মতো সময়ও নেই। কিন্তু তবু আমি বেখাপ্পা রকম কাণ্ড করে' ফেলি মাঝে মাঝে তার কারণ মনের ভিতর ফড়িং আছে একটা। কারণে অকারণে লাফিয়ে ওঠে সেটা—।"

রঙ্গনা চুপ করে রইল, কিন্তু মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল তার। সে হাসি অর্থহীন নয়, কিন্তু কি যে তার অর্থ তা-ও বলা শক্ত।

দিবস বললে, "আর একটা কথা—না থাক সেটা আর বলব না তোমার কাছে—।"

রঙ্গনার হাসিটা আর একটু ফুটে উঠল।

"কেন, কি এমন কথা সেটা ?"

"বললে আত্মপ্রশংসার মতো শোনাবে। এমনিই তো তুমি আমার চরিত্রে অনেকগুলো খুঁত বের করে' ফেলেছ, সে তালিকা দীর্ঘ করে লাভ কি ;"

"আমার কাছে নিজেকে নিখুঁত প্রমাণ করেই বা লাভ কি ?"—রঙ্গনার চোখের হাস্যদীপ্ত দৃষ্টিতে যে আলোটা চকমক করে' উঠল তা ঠিক শানিত ছুরির মতোই। দিবসের মনের ভিতরটা চিরে দেখতে চাইছে যেন। ছুরিটা ভোঁতা হয়ে গেল কিন্তু দিবসের সপ্রতিভ হাসিতে।

"কিসে আমার লাভ লোকসান তা আমি নিজেই জানিনা, তোমাকে

কি করে' বলব বল? এইটুকু শুধু বলতে পারি এখন তোমার চোখে নিজেকে খেলো করাটা লোকসান বলেই মনে হচ্ছে, কেন জানি না। দু'দিন পরে হয়তো হবে না।"

"কি যে যা তা বলছেন, আমি আপনাকে খেলো মনে করেছি কি করে' জানলেন?"

"ও, মনে কর নি তাহলে, যাক বাঁচা গেল!'

"বাজে কথা ছেড়ে কি বলছিলেন বলুন।"

"কি বলছিলাম বল তো?" দিবস সত্যিই ভুলেগিয়েছিল প্রসঙ্গটা।

"ওই যে কি বলতে বলতে থেমে গেলেন।"

"ও হ্যাঁ। না-ই শুনলে সেটা?"

"শুনিই না। সত্যি, ভারী দুষ্টু আপনি।"

"শোন তবে। মেয়েদের সম্বন্ধে আমার একটা ভারী দুর্বলতা আছে। কোনও বিপন্ন মেয়েকে সাহায্য করবার জন্যে আমি সব করতে পারি। না করতে পারলে আমার পৌরুষ যেন তৃপ্তি পায় না।"

হঠাৎ পটলি আর তার স্বামীর ছবিটা ভেসে উঠল রঙ্গনার চোখের উপর। সৌদামিনীর মুখে যা সে শুনেছিল তা-ও মনে পড়ল।

"সেদিন তোমাকে যে আয়নাটা কিনে দিলুম তার কারণও ওই। যা ভেবেছ তা মোটেই নয়। ওকি, তোমার এক কানে দুল কেন?"

রঙ্গনা তাড়াতাড়ি কানে হাত দিয়ে দেখলে সত্যিই তো একটা দুল নেই।

"ওই গেটের কাছেই পড়ে গেছে তাহলে। যা ধাক্কা আপনি দিয়েছিলেন স্যুটকেস দিয়ে!"

আবার গেটের কাছে ফিরে গেল তারা। সৌভাগ্যক্রমে একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল দুলটা।

"চলুন এবার যাওয়া যাক"—দুলটা পরতে পরতে বললে রঙ্গনা।

"চল। তুমি কিসে যাবে?"

"ট্যাক্সিতে যাই চলুন, আমার কাছে টাকা আছে।"

"আমি বাসে যাব। ভবানীপুরে যেতে হবে একবার।"

"কিছুদূর যাই চলুন একসঙ্গে। পথে নাবিয়ে দেব আপনাকে।"

"এখানে খালি বাস পাব, এখান থেকে ওঠাই তো ভালো?"

"যান তাহলে।"

নীরবে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল দু'জনে। দিবসের মনে হতে লাগল রঙ্গনা আবার যদি অনুরোধ করে তাহলে তাকে ট্যাক্সিতেই যেতে হবে। রঙ্গনা কিন্তু ভাবছিল অন্য কথা। সে ভাবছিল দিবস নিশ্চয়ই তাকে বিলাসী ভাবছে। তার নিজের বিবেকও দংশন করেছিল, মনে হচ্ছিল তার বাসে যাওয়াই উচিত, ট্যাক্সি চড়ে' এমনভাবে টাকাগুলো খরচ করা উচিত নয়···। কিন্তু···।

স্টেশনের বাইরে এসে পড়েছিল তারা।

"আচ্ছা আমি চলি তাহলে এখন। সন্ধ্যার পর দেখা হবে আবার।"

দিবস বাসের আড্ডার দিকে চলে গেল। রঙ্গনা দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। দূরে তিন চারখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

···দিবস একটি খালি বাসের এক কোণে বসেছিল চুপ করে'। রঙ্গনার কথাই ভাবছিল। একটা নৌকা তীর ছেড়ে ক্রমে ক্রমে দূরে চলে যাচ্ছে—এই ধরণের একটা ভাব তার মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কিরণের কথাই ঠিক। যে আদর্শকে সে বরণ করেছে সে আদর্শ রঙ্গনাকে মুগ্ধ করবে না। রঙীন শাড়ি গয়না পরে' ট্যাক্সি চড়তেই চায় ওরা। রঙীন শাড়ি গয়না পরে' ট্যাক্সি চড়াটা যে পাপ দিবসও তা মনে করে না। ওর লোভে মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দেওয়াটাই অন্যায় তার মতে। রঙ্গনা হয়তো মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দিচ্ছে না, সংগতি আছে হয়তো গহনচাঁদবাবুর···। তাছাড়া চুনীলালের কথাটাও মনে পড়ল।

"চলুন আপনার সঙ্গেই যাই।"

রঙ্গনা হাসিমুখে এসে উঠল বাসে।

"কেন ট্যাক্সির কি হল?"

"পেলাম না তেমন সুবিধা মতো।"

দিবসের পাশে বসে' সে তুলটা আবার পরবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তার মনের ভিতর যে দ্বন্দ্বটা চলছিল তার আভাস তার চোখমুখে প্রতিভাত হচ্ছিল না একটুও। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তুলটাকে নিয়েই যেন সে ব্যস্ত আছে, তুলটাকে ঠিকমতো পরতে পারছে না বলেই যেন তার ভুরুতে জেগেছে বিরক্তির কুঞ্চন, অধরে ফুটেছে অপ্রস্তুত হাসি। কিন্তু মনে মনে সে লজ্জায় মরে যেতে চাইছিল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে দিবসের বাসে এসে উঠল কেন? তার মনের একটা অংশ তর্জনী আস্ফালন করে' তারস্বরে প্রশ্ন করছিল কেন, কেন, কেন—আর একটা অংশ অসহায়ভাবে অপ্রস্তুত মুখে বসেছিল নতমস্তকে। আত্মসম্মানের সঙ্গে আত্মসমর্পণের দ্বন্দ্বে সে ব্যস্ত ছিল বলেই তুলটা পরতে দেরি হচ্ছিল তার আরও। অস্বাভাবিক রকম দেরি হচ্ছে এ সম্বন্ধে নিজেই সে সচেতন হল পরমুহূর্তে।

"তুলটা মাড়িয়ে দিয়েছে বোধহয় কেউ, আঁকড়াটা বেঁকে গেছে।"

"কই দেখি?"

দিবস তুলটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে' দেখলে তারপর ফিরিয়ে দিলে। এবার বেশ সহজে পরা গেল।

"আপনি ভবানীপুরে কোথায় যাবেন?"

"হরিশ মুখার্জি রোড।"

"সেখানে এখন যাচ্ছেন যে? মেসে আপনার চাকরি নেই এখন?"

"এখন তো প্রায় এগারোটা বাজে। মেসে বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত আমার ছুটি, আমি যাচ্ছি এখন একটি ছেলেকে পড়াতে।"

"কি পড়ান আপনি?"—নিজের এই অকারণ কৌতূহলে লজ্জিত হল সে একটু মনে মনে।

"অঙ্ক।"

"ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলে?"—আবার জিগ্যেস করে' ফেললে সে।

"না, বি-এস-সি পড়ে। অঙ্কে অনার্স আছে ছেলেটির।"

কথাটা শুনে ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হয়ে পড়ল রঞ্জনা। যে দিবসকে মেসের চাকর মনে করে সে ব্যঙ্গ করেছিল সেই দিবসই যে বি-এস-সি অনার্সের অঙ্ক পড়াতে পারে এই সংবাদে দিবসের সম্বন্ধে তার ধারণাটা বদলে গেল যেন হঠাৎ। দিবস যে ভাল ছেলে তা সে তার বক্তৃতা শুনেই বুঝেছিল, সে যে ধনীর সন্তান এ-ও সে শুনেছিল সৌদামিনীর কাছে, সে ভালো সরোদ বাজাতে পারে তা-ও সে জানে, কিন্তু সে যে অঙ্কেও এত বড় পণ্ডিত একথা শুনে তাক লেগে গেল তার, কারণ নিজে সে অঙ্কে ভয়ানক কাঁচা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আড়-চোখে চাইল সে একবার দিবসের দিকে। দিবস পথের দিকে চেয়ে বসেছিল চুপ করে'।

"আপনার সঙ্গে আরও কিছুদিন আগে আলাপ হলে আমি আই-এ না পড়ে আই-এস-সি পড়তাম। অঙ্কের ভয়ে আই-এস-সি নিতে পারি নি।"

"যা ভাল লাগে, যেটা তোমার পক্ষে সহজ, তাই পড়াই তো ভাল। আই-এস-সি পড়ে লাভটাই বা কি হ'ত?"

"ডাক্তারি বা ওই ধরণের কোনও একটা রোজগারের রাস্তায় ঢুকতে পারতাম। আই-এ, বি-এ, এম-এ পাশ করে' এক মাস্টারি ছাড়া আর কোন গতি নেই।"

"আমাদের দেশে ডাক্তার মাস্টার দুই-ই দরকার এখন প্রচুর। দেশের দেহ মন কোনটাই সুস্থ নয়।"

"আমি দেশের কথা ভাবছি না, নিজের কথা ভাবছি। ডাক্তারিতে বেশি পয়সা রোজগার করা যায়। আমাদের যা অবস্থা তাতে আমার ডাক্তার হওয়াই উচিত, কিন্তু কি করব বলুন, অঙ্কটা কিছুতেই মাথায় ঢোকে না।"

তার হাসির অন্তরালে একটা অপ্রস্তুতভাব থাকাতে হাসিটা মলিন দেখাতে লাগল। তাদের অবস্থা যে খারাপ এই খবরটা দিবসকে দিয়ে ফেলে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল সে।

দিবস বললে, "নাই বা ঢুকল। দিনকতক পরেই তো বিয়ে হয়ে যাবে। তখন—"

দিবসের মুখের হাসিটাও নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল। চুনীলালের মুখে যে কথাটা সেদিন সে শুনেছিল তার তাৎপর্যটা যেন এখন এতক্ষণ পরে অতিশয় রূঢ়ভাবে এসে আঘাত করল তাকে। রঙ্গনাকে আয়না কিনে দিয়ে তার মন পরীক্ষা করবার যে এক্‌স্‌পেরিমেন্টটা করেছিল সে (এখনই একটু আগেই রঙ্গনাকে আয়না কেনার যে ব্যাখ্যাটা সে দিয়েছিল সেটাও মিথ্যা নয়), রঙ্গনা তার আদর্শকে স্বীকার করেও তাকে চাইবে কি চাইবে না এই অনিশ্চয়তাকে ঘিরে স্বপ্ন-সৃজন—সমস্তই যেন ব্যর্থ হয়ে গেল—রঙীন মেঘের মত মিলিয়ে গেল সব।

"দিনকতক পরে বিয়ে হয়ে যাবে কে বললে আপনাকে?"

"চুনীলালবাবু।"

"মামার সঙ্গে কবে কথা হয় আপনার?"

"যেদিন তোমাকে আয়না কিনে দিয়ে গেলাম সেই দিনই।"

রঙ্গনা চুপ করে রইল। 'বাস'টা এতক্ষণ খালি ছিল, কয়েকজন যাত্রী এসে উঠল। একটু পরেই আবার নেবে গেল তারা।

রঙ্গনা দিবসের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলল, "আমি এখন বিয়ে করব না। ওখানে তো নয়ই।"

"কেন ?"

"ওরা পাঁচ হাজার টাকা পণ চায়। বাবাকে বাড়ি বাঁধা দিতে হচ্ছে।"

"তাই নাকি !"

"হ্যাঁ।"

পাশাপাশি বসে রইল দু'জনে। কারও মুখে কথা নেই।

হঠাৎ রঙ্গনা বলে উঠল—"আচ্ছা, হঠাৎ যদি আমি কোনও দিন বিপদে পড়ে' আপনার সাহায্য চাই দেবেন তো ?"

একটু আগেই দিবস যে কথাগুলো বলেছিল—'কোনও বিপন্ন মেয়েকে সাহায্য করবার জন্যে আমি সব করতে পারি। না করতে পারলে আমার পৌরুষ যেন তৃপ্তি পায় না'—সেই কথাগুলোকে রঙ্গনার মন যে আঁকড়ে বসেছিল তা নিজেও সে টের পায় নি এতক্ষণ। এই খাপছাড়া প্রশ্নটা তার নিজের কানেই বেসুরো ঠেকল তাই। চকিতে দিবসের দিকে চেয়ে দিবসের চোখে কিন্তু যা দেখলে সে, তাতে তার মনের কুণ্ঠিতে ভাবটা কেটে গেল।

উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে দিবস বললে, "নিশ্চয়।"

এর পর আর একদল যাত্রী উঠল বাসে। বেশ ভিড় হল। কথাবার্তার সুযোগ আর পেলে না তারা। পাশাপাশি বসে রইল কেবল।

ভালো মন্দ যা-ই হোক নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কেউ যখন সুনিশ্চিত হয়ে পড়ে, নিজের পৌরুষ দিয়ে সে ভবিষ্যতকে বদলাবার আশাও যখন আর থাকে না, তখনই লোকে সাধারণত পর-চর্চায় মন দেয়। ভবিষ্যৎ যদি অন্ধকার হয় তাহলে পরের সম্বন্ধে চিন্তাটা আরও বেশি পেয়ে বসে। কিরণের তাই হয়েছিল। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর

কোনও আলো সে দেখতে পাচ্ছিল না। যেটুকু আলো ছিল নিজের আকাঙ্খার কাল্পনিক আলোর কাছে তা এতই ম্লান যে সেটাকে আলো বলেই মনে হচ্ছিল না তার। উর্মিকে ঘিরে কল্পনায় যে অলকাপুরী সে সৃষ্টি করে' রেখেছিল তা বাস্তবে কোনওদিন রূপ পরিগ্রহ করবে না তা সে জানত। যে ট্রাম ড্রাইভারি সে নিয়েছে (যেটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তরও নেই) তাতে কোনক্রমে একটা খোলার ঘরে মাথা গুঁজে পশু-জীবন যাপন করা চলে আর কিছু হয় না। বাস্তব উর্মির চিন্তাটাকেও দু'হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে রেখেছে সে কর্দমাক্ত বাস্তবলোক থেকে। অন্ধকারলোকে বসে দিবসের চিন্তাই করছে সে আজকাল। তার ক্রমাগতই মনে হচ্ছে দিবস ভুল করছে। এ-ও অবশ্য তার মনে হচ্ছে অনুরূপ অবস্থায় পড়লে সে-ও কি ভুল করত না ? নিজের মধ্যে নিতান্ত জৈবিক যে ক্ষুধাটা সে অনুভব করে মাঝে-মাঝে তা দিবসও নিশ্চয় করে এ-ও তার মনে হচ্ছিল। এই সব অনুভব করার ফলে দিবসের ভ্রান্তিটাকে যদিও সে ক্ষমার চক্ষেই দেখছিল কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছিল না। বার বার তার মনে হচ্ছিল দিবসের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে বলেই তার প্রতি কর্তব্যও আছে একটা। ভ্রান্তির কবল থেকে তাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা যদি সে না করে তাহলে সে কর্তব্যে ত্রুটি হবে। এ বিষয়ে দিবসের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। আলোচনা করে' দিবসকে যদি সে ফেরাতে পারে ভালই, যদি না পারে তাহলে তার বাবাকেই খবর দিতে হবে। দিবসকে জানিয়েই খবর দেবে। এটা কর্তব্য তার। পরক্ষণেই তার কল্পনানেত্রে ফুটে উঠছিল অপরূপ একটা ছবি। দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। সমুদ্রের স্বচ্ছ নীল জলে অসংখ্য তরঙ্গের শিহরণ। তাতে একটি মাত্র নৌকো ভেসে চলেছে। সোনার তরী। জ্যোৎস্না-শুভ্র পালে লেগেছে হাওয়া। আকাশের মেঘমালায় বিচিত্র বর্ণসম্ভার। নৌকোর একধারে বসে

আছে দিবস আর একধারে রঙ্গনা। রঙ্গনা যেন মৃদুকণ্ঠে গান গাইছে;
—গানের কথাগুলোও মূর্ত হয়ে উঠল তার মনে।

স্বপন মাখা চোখে চলেছি মেঘ লোকে
মাটির মায়া ছেড়ে চলেছি আকাশেতে
সূর্য শশী তারা যে দেশে দিশাহারা
রূপের শতধারা উঠেছে যেথা মেতে।

এমন সুন্দর ছবিকে নষ্ট করে' দেওয়া উচিত কি? কিন্তু বন্ধু হিসাবে……ভ্রূকুঞ্চিত করে' বসে রইল কিরণ। তারপর মনে হল দিবসের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। কিন্তু দিবসের সঙ্গে দেখাই হচ্ছে না যে। তিনবার তার বাড়ি গিয়ে ফিরে এসেছে সে। খবরের কাগজটা তুলে পড়বার চেষ্টা করলে। আরও মন খারাপ হয়ে গেল। আগাগোড়া কেবল দুঃসংবাদ। শুধু দুঃসংবাদ নয়, মিথ্যা সংবাদ। বানিয়ে বানিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে এমনভাবে লিখেছে যে সংবাদের স্বরূপটাই গেছে বদলে। চামড়া বাঁচাচ্ছে নিজেদের!

"মা পাঠিয়ে দিলেন।"

পাশের বাড়ির ছেলেটি একটা বাটি হাতে করে' দাঁড়িয়েছে দ্বার প্রান্তে। 'আঃ' কিরণ বলে' উঠল মনে মনে। পাশের বাড়ির লোকটি ধনী হয়েছেন সম্প্রতি কালো বাজারের কৃপায়। তা হোন, কিরণের আপত্তি থাকলেও কিছু করবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু তার প্রৌঢ়া গৃহিণীর বদান্যতার জ্বালায় অস্থির হয়েছে সে। তিনি অনুকম্পাভরে প্রায়ই এটা সেটা পাঠিয়ে দেন তাকে। এই অনুকম্পা পাগল করে' তুলেছে যেন, এটাও যেন ওদের ঐশ্বর্য-অস্ফালনের আর একটা উপায়। মোটরের হর্ণ, রেডিওর গাঁক গাঁক চিৎকারই তো যথেষ্ট, বাড়িতে

খাবার পাঠিয়েও কি জানান দরকার যে আমাদের যথেষ্ট খাবার আছে, আহা তুমি খেতে পাওনা, নাও খাও তোমাকেও একটু দিচ্ছি!

"কি ওটা—"

"মাংস।"

"আজ রবিবার আমি মাংস খাই না"—মিছে কথাই বললে সে।

"ফিরে নিয়ে যাই তাহলে?"

"যাও।"

মাংস নিয়ে চলে গেল ছেলেটি। কিরণের খিদে পেয়েছিল খুব! কিরণ উঠে দাঁড়াল, ঘরের ভিতর অন্যমনস্কভাবে ঘুরে বেড়াল খানিকক্ষণ। তারপর জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। রাস্তাতেই মুক্তি। জনতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে যতক্ষণ অন্যমনস্ক থাকা যায়…।

সৌদামিনী আর গিরিবালা ফিরছিল সৌরেন ডাক্তারের অতসী ক্লিনিক থেকে। পটলি আর তার স্বামীকে সেইখানেই রেখে এল তারা। সৌরেন ডাক্তারের ভদ্রতা দেখে মুগ্ধ হয়েছে দু'জনেই। আর সব চেয়ে বিস্মিত হয়েছে সৌরেনের উপর দিবসের প্রভাব দেখে। দিবস ওদের সঙ্গে যেতে পারে নি। চিঠি দিয়েছিল একটা। সেই চিঠি দেখে কি খাতিরটা করলেন ডাক্তারবাবু। দিবসের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সৌদামিনী। দিবসের সম্বন্ধে এমনভাবে কথা কইতে কইতে আসছিল সে যেন দিবস তার নিজের সম্পত্তি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দিবসের ঠিকানা পাওয়ার আগেই ঘণ্টু এসে হাজির হল। এমনি চিঠি লিখলেই সে হয়তো এসে পড়ত, কারণ বাংলাদেশের অসংখ্য যুবক যে সম্প্রদায়ভুক্ত ঘণ্টুও তাদের একজন। সে বেকার। বি-এ পাশ করে' বাড়িতে বসে' রাজনীতি, সাহিত্য, নূতন নূতন ব্যবসার প্ল্যান প্রভৃতি নিয়েই দিন কাটাচ্ছিল সে। সূর্য চৌধুরি তাকে আসতে লিখলেই সে চলে আসত। কিন্তু সূর্য চৌধুরি পত্রে যে কারণটা দেখিয়েছিলেন তাতে আরও তাড়াতাড়ি চলে' আসতে হল তাকে। সূর্য চৌধুরি লিখেছিলেন যে তাঁর শরীরটা ভাল নয় সে যেন অবিলম্বে চলে' আসে। উকিল মানুষ তিনি, ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক চেহারা দেবার জন্যে চিঠি লেখার পর থেকেই অসুখের ভান করতে লাগলেন। একটু আধটু ব্লাড প্রেসার তাঁর ছিলই, ব্লাড প্রেসারের লক্ষণও জানা ছিল কিছু কিছু, সুতরাং রোগী সাজতে বেশি বেগ পেতে হল না তাঁকে। চিঠি লেখার পরই তিনি ব্রজকে বললেন—"ব্লাড প্রেসারটা বেড়েছে বোধহয়, মাথাটা টলছে।" পরের দিন থেকে কাছারি যাওয়া বন্ধ করে' দিলেন। ব্রজ ব্যস্ত হয়ে উঠল ডাক্তার ডাকবার জন্য। একজন ডাক্তর এসে দেখেও গেল। তাঁর ব্যবস্থা অনুযায়ী সূর্যকান্ত চলতেও লাগলেন। পটভূমি-কাটি চমৎকার তৈরি হয়ে রইল। দিবসের জন্য ব্রজর আকুলতাটা একটু বাড়ল বটে কিন্তু তাতে সূর্য চৌধুরির খুব বেশি অসুবিধা হল না। ব্রজর অর্ধ-স্বগত আক্ষেপোক্তি, প্রকাশ্য তর্জন, অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস এ সবে অভ্যস্ত তিনি। এত আগে থাকতে সূর্য চৌধুরি এত আয়োজন করেছিলেন শুধু ঘণ্টুর বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্যেই নয়। তিনি ঘণ্টুর মারফত দিবসের কাছে নিজের অসুখের সংবাদটাই পাঠাবেন এঁচে

রেখেছিলেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস তাঁর অসুখের খবর পেলে দিবস নিশ্চয়ই আসবে। তাছাড়া আর একদিক থেকেও বাঁচবেন তিনি। ব্রজ এবং গোবিন্দ সাণ্ডেলের কাছে দিবসের সম্বন্ধে যে ঔদাসীন্যটা তিনি জাহির করে' রেখেছিলেন (যা করার কোনও প্রয়োজনই ছিল না) এতে সেটা জাহিরই থেকে যাবে। যেন অসুখের জন্যেই বাধ্য হয়ে তাঁকে খবর পাঠাতে হচ্ছে ছেলেকে, এইটেই বড় হয়ে উঠবে, তিনি যে ছেলের জন্য আকুল হয়ে' উঠেছেন এই সত্যটা চপা পড়ে' যাবে। ঠিকানা পাওয়ার পর ঘণ্টু এলেই ভাল হ'ত, কারণ তাহলে, ঘণ্টু পরে যা করল সময়াভাবে তা করবার সুযোগই পেত না হয়তো। প্রথমত গোবিন্দ সাণ্ডেলের সঙ্গে সূর্যকান্তের কথোপকথনের খানিকটা আড়াল থেকে শুনে আকাশ-কুসুম রচনা করবার সময় পেত না এবং দ্বিতীয়ত জটিল গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর যা সে ভেবেছিল—তাও ভাবত না। কিন্তু ঠিকানা পাওয়ার আগেই সে এসে পড়ল এবং ব্রজর মুখে সমস্ত শুনে 'থ' হয়ে গেল। যা তার সুদূরতম কল্পনারও বাইরে ছিল তা প্রথমে তার কল্পনাধীন হল ব্রজরই শ্লেষোক্তিতে। সে যেদিন এল তার পরদিন তাকে জলখাবার দিতে দিতে ব্রজ বললে, "তোরই তো পোয়া বারো হ'ল এবার। রামের তো বনবাস হয়ে গেছে এইবার তুই রাজত্ব কর।"

"আমি রাজত্ব করব মানে ?"

"সেই ব্যবস্থাই তো হচ্ছে শুনছি। তোমার মামা আর গোবিন্দবাবু মিলে দিবুকে বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে পরামর্শ আঁটছে। ওরা মনে করছে আমি কিছু জানি না, কিন্তু আমি সব জানি, সব দিকে কান থাকে আমার।"

সিঙারায় কামড় দিয়ে উৎক্ষিপ্ত-ভ্রূ ঘণ্টু বললে, "তার মানে ?"

"মানে তোমারই পোয়া বারো। দিবু যদি বিষয় না পায় তুমি পাবে। দিবুর পর তোমারই তো ক্লেম।"

ব্রজ মাঝে মাঝে দু'একটা ইংরেজি কথাও বলে। ব্রজ বেশিক্ষণ আর দাঁড়াল না (বেশিক্ষণ সে কোথাও দাঁড়ায় না, কাজে, অকাজে, বিনাকাজে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বদা) কিন্তু যে বীজটি সে ঘণ্টুর মনে বপন করে' গেল তা ঘণ্টুর মনোজগতে বিপর্যয় ঘটাতে লাগল ক্রমশঃ। যে ঘণ্টু হালে পানি পাওয়া দূরে থাক নৌকোই জোটাতে পারে নি একটা, তার হাতে যেন আলাদিনের প্রদীপ দিয়ে গেল ব্রজ একটা। দিবু দা যদি না আসে তাহলে মামার এত সম্পত্তির সে-ই উত্তরাধিকারি হবে। ভাবা যায় না। কিন্তু আইনত হওয়া তো উচিত! দিবু দা আসছে না কেন? না আসবার কারণটা কি? সামান্য একটু বকেছে বলে' এতদিন নিখোঁজ হয়ে থাকবে? নিশ্চয়ই গুরুতর ব্যাপার আছে কিছু একটা ভিতরে। ব্রজর কথাটা শোনার পর থেকে ঘণ্টুর মনে এই ধরণের নানা ঢেউ উঠতে লাগল। মাঝে মাঝে এ-ও তার মনে হতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত দিবু দা ঠিক এসে পড়বে, এত বড় সম্পত্তি ছেড়ে বিবাগী হয়ে যাবে এ কথা ভাবা যায় না এ যুগে (কথায় কথায় 'একথা ভাবা যায় না' বলাটা ঘণ্টুর একটা মুদ্রা দোষ), তাছাড়া দিবু দা যদি না-ও আসে, মামা যে সম্পত্তি তাকেই দেবেন তারই বা নিশ্চয়তা কি?...... ঘণ্টুর চিত্তের যখন এই রকম দোলায়মান অবস্থা তখন একদিন দোতলার জানালা দিয়ে যেতে যেতে সে মামার এবং গোবিন্দ সাণ্ডেলের কথোপকথনের খানিকটা শুনতে পেয়ে গেল হঠাৎ। শোনামাত্র শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল তার ক্ষণিকের জন্য, শিহরণ বয়ে গেল সর্বাঙ্গে।

গোবিন্দ সাণ্ডেল বলছিলেন—"আমি বলছি সে আসবে। ঘণ্টর

নামে বিষয়টি উইল করে' দিয়ে সেই খবরটি তাকে পাঠাও। ছুটতে ছুটতে আসবে।"

সূর্যকান্ত বললেন—"সে যদি নিতান্তই না আসে ঘণ্টুই তো বিষয় পাবে, আমার আর কে আছে বল?"

ঘণ্টু আর শুনতে পারল না, তাড়াতাড়ি দালানটা পেরিয়ে ছাতে উঠে গেল সে। বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করছিল। এবার তার বিশ্বাস হ'ল সত্যিই মামার বিষয়টা পেয়ে যাবে সে দিবু দা না এলে। শৈশবেই সে পিতৃমাতৃহীন হয়েছে। মামাই তার পড়ার খরচ জুগিয়েছেন। সে-ও তো মামার ছেলেরই মতো। 'সে যদি না আসে তাহলে ঘণ্টুই তো বিষয় পাবে, আমার আর কে আছে বল'—সূর্যকান্তের এই কথাগুলো আবার বেজে উঠল কানে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। প্রকাণ্ড বাড়িটার ছবি মানসপটে ফুটে উঠল, ওই প্রকাণ্ড বুইক গাড়িখানা……এ সবই তার হবে? ভাবা যায় না!

তারপর দিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল জটিল গাঙ্গুলীর সঙ্গে। জটিল গাঙ্গুলী তার আধুনিকতম বন্ধু। ঘণ্টুর ব্যবসার প্ল্যান যেমন বদলায় বন্ধুও তেমনি বদলায়। বইয়ের দোকান করবার মতলব মাথায় খেলছিল যখন তখন বন্ধু ছিল উদীয়মান কবি গোপেন সাহা। গোপেন সাহাই বুদ্ধিটি দিয়েছিল তাকে। বইয়ের দোকান কিন্তু খোলা হল না সুশীল গুহর চক্রান্তে। সুশীল গুহ তাকে বলেছিল, "আরে বই ক'টা লোক পড়ে? ওতে ক'পয়সা পাবে তুমি? তার চেয়ে চাল ডাল তেল নুনের দোকান কর, হু হু করে চলবে।" সুশীল গুহর সঙ্গে দিনকতক খুব মাখামাখি হল ওই সূত্রে। জটিল গাঙ্গুলী আসতে কিন্তু সুশীল গুহকে রণে ভঙ্গ দিতে হল। জটিল গাঙ্গুলীর মস্ত বড় 'কোয়ালিফিকেশন' সে বম্বেতে অনেকদিন কাটিয়েছে। সে এসে বললে—"আরে ছোঃ, চাল

ডালের ব্যবসা কি একটা ব্যবসা নাকি? ওর স্কোপ কত লিমিটেড! ওর ফিউচার কি! এখন ফিউচার আছে প্ল্যাস্‌টিকের। কিছু ক্যাপিটাল যদি ছাড়তে পার দু'দিনেই লাল হয়ে যাবে!"

লাল-স্বপ্ন-জনক এই জটিল গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াতে মনের নিরুদ্ধ ভাব চেপে রাখা অসম্ভব হল ঘণ্টুর পক্ষে। একটি পার্কে বসে' সমস্ত কথা সে বললে তাকে। জটিল স্বল্পভাষী লোক। ঘাড়টি ঈষৎ বাকিয়ে সিগারেট টানতে টানতে ঘণ্টুর সমস্ত কথা শুনেও চুপ করে' রইল সে। কারণ ঘণ্টু যা বললে তাতে সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে 'ওঠার মতো কোনও মাল মশলা আছে বলে' তার মনে হল না।

"মামার বিষয়টা যদি পেয়ে যাই তাহলে ক্যাপিটালের ভাবনা কি? মামার হার্ড ক্যাশই না কি এক লাখ টাকা আছে শুনেছি। তবে দিবু দা যদি এসে পড়ে তাহলে অবশ্য—"

এইবার জটিল গাঙ্গুলী বোম্বাই ফোড়নটি ছাড়লেন।

"তোমার মামার টাকার উপর সত্যিই যদি নির্ভর করতে চাও তাহলে তোমার দিবু দা যাতে না ফেরেন সেই চেষ্টাই করা উচিত তোমার।"

"তা কি করে' সম্ভব! দিবু দা কোথায় আছে তাই জানা নেই প্রথমত। দ্বিতীয়ত—"

"যদি সম্ভব হয় তাহলেই বলছি। না যদি সম্ভব হয় তাহলে আর কি করে' করবে? আচ্ছা উঠি এবার।"

হ্যাঁ চল, মামার জন্যে ওষুধ আনতে যেতে হবে আমাকে।"

জটিল গাঙ্গুলীর সঙ্গে আলাপের পর ঘণ্টুর চিন্তাধারা জটিলতর হয়ে গেল। তার এবং তার ভবিষ্যতের মাঝখানে নিরুদ্দিষ্ট দিবসের ছায়ামূর্তিটা প্রেতের মতো সঞ্চরণ করে' বেড়াতে লাগল।

গহনচাঁদ নিজের ঘরে বসে' তানপুরো বাজিয়ে নূতন যে শিব-স্তোত্রটিতে সুর দিয়েছিলেন সেইটে গাইছিলেন তন্ময় হয়ে।

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে
স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীত-ভয়-সূদন মামনাথং
সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ।

মহাদেবের মহিমায় ততটা নয়, তিনি যে স্তোত্রটাতে সুর বসাতে পেরেছেন এরই আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছিল তাঁর মন। তাঁর বন্ধু বিশ্বনাথ কথক একটু পরেই আসবেন, চুনীলাল তাঁকে আনতে গেছে স্টেশনে। একাই গেছে। চুনীলাল আর একটা মতলব করেছিল ইতিমধ্যে। সে ভেবেছিল বাড়িটা বাঁধা দিয়ে যদি বেশি কিছু টাকা পাওয়া সম্ভব হয় তাহলে সেই বাড়তি টাকাটা নিয়ে হরলাল সিংহির ধারটা সে শোধ ক'রে ফেলতে পারবে। কিন্তু বেশি টাকা পাওয়া সম্ভব কি না, বিশ্বনাথ কথক টাকা পাবার কোথায় কি বন্দোবস্ত করেছেন এই সবেরই একটা হদিস পাওয়ার জন্যে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্টেশনে গিয়েছিল বিশ্বনাথ কথককে আনতে। গহনচাঁদও সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গহনচাঁদকে কৌশল করে' নিবৃত্ত করেছিল সে। কারণ গহনচাঁদের সামনে ওসব টাকাকড়ির আলোচনা উত্থাপনই করা যাবে না। স্টেশনে যেতে না পেয়ে গহনচাঁদ শঙ্করাচার্যের স্তোত্রটাকে নিয়ে পড়েছিলেন। বিশ্বনাথকে তাক লাগিয়ে দেবেন তিনি। সীতারাম এখনও এসে পৌছায়নি এই চিন্তাটা মাঝে মাঝে অধীর করছিল তাঁকে, এই জন্যে মাঝে মাঝে একটু অন্যমনস্কও হয়ে পড়ছিলেন, তথাপি তিনি মশগুল হয়েই ছিলেন। সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে সুর মিলে অদ্ভুত পরিবেশ হয়েছিল একটা।

পাশের ঘরে ছিল ঊর্মি আর রঙ্গনা। ঊর্মির সঙ্গে রঙ্গনার বন্ধুত্ব বেশ জমে' উঠেছিল এই ক'দিনের মধ্যেই। বয়স যখন কম থাকে তখন বন্ধুত্বটা খুব তাড়াতাড়ি জমে যায়। তাছাড়া ঊর্মির অদ্ভুত একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। আলাপ না করে' সে ছাড়ে না। ইনসিওরেন্স কোম্পানীর লোকেরা খবর পেলে নিশ্চয় তাকে দালাল নিযুক্ত করতে চাইত এবং করে' লাভবানও হ'ত। রঙ্গনার গানের প্রশংসা করে' মলঙ্গা লেনের সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে কিরণের গান রেকর্ড করবার ব্যবস্থা প্রায় সে করে' ফেলেছে। জীবনের আরম্ভে ভাগ্য-দেবতা যদিও প্রতিকূল স্রোতের মুখে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, সে কিন্তু সাঁতরে ঠিক পার হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই দমবে না। ঊর্মি না হয়ে আর কেউ হলে রঙ্গনার সঙ্গে এত সহজে আলাপ জমাতে পারত না। রঙ্গনা লোক খারাপ নয়, কিন্তু মনে সুখ নেই তার, কিরণের মতোই তার মনের অবস্থা, স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের মিল হচ্ছে না কিছুতেই এবং তার ফলে মনের ভিতর এতরকম প্যাঁচের সৃষ্টি হয়েছে যে ইচ্ছে থাকলেও কারও কাছে সে মন খুলতে পারে না সহজে। অনেকগুলো প্যাঁচ কিন্তু সহসা শিথিল হয়ে গেছে দিবসের সংস্পর্শে এসে। তার স্বপ্নটা যেন বাস্তবে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। যাবজ্জীবন-কারাবাস-দণ্ডিত বন্দী হঠাৎ যেন আভাস পেয়েছে সে মুক্তি পাবে, কোথায় কি ভাবে তা যদিও সে জানে না, কিন্তু মুক্তির আভাস যেন হাওয়ায় ভাসছে। দিবসের সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল তাদের। রঙ্গনার মন দিবসের সম্বন্ধেই আলোচনা করতে চাইছিল কারও সঙ্গে, ঊর্মির মতো সহৃদয় সহানুভূতিশীল সঙ্গী পেয়ে বেঁচে গেছে যেন সে।

…বিশ্বনাথ কথক, চুনীলাল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রমজান সীতারাম এসে পড়াতে গহনচাঁদের সংগীত-চর্চা এবং রঙ্গনার

কল্পনাবিলাস ব্যাহত হল। সবাই বাইরের ঘরে এসে হাজির হলেন।

"আরে, এর মধ্যেই ট্রেন এসে গেল নাকি। বস বস বস। ট্রেনে কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই, যা ভিড় আজকাল। বস বস।"

গহনচাঁদ এমন নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছিলেন বিশ্বনাথকে যে বসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

"ছাড় ছাড়, এমন জড়িয়ে ধরলে বসব কি করে?"

সীতারাম রমজানের অভিবাদনের উত্তরে কথক মশাই হেসে বললেন, "তোমরাও বেশ জমে' গেছ দেখছি যে এখানে—অ্যাঁ!"

রঙ্গনাও এগিয়ে এসে প্রণাম করল।

"আরে এটা যে লাউডগার মতো তরতরিয়ে বেড়ে উঠেছে দেখছি!"

সবাই উপবেশন করলে পর কথক মশাই গহনচাঁদের দিকে সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' বললেন, "টাকার জোগাড় করে' এনেছি, এবার মা-জননীর বিয়েটা লাগিয়ে দাও। পাত্রটি তো বেশ ভাল পেয়েছ চুনীর মুখে শুনলাম।"

রঙ্গনা অপ্রত্যাশিত ভাবে বলে উঠল, "আমি বিয়ে করব না ওখানে। আমার বিয়ের জন্যে বাড়ি বাঁধা দিয়ে পণ সংগ্রহ করতে হবে না।"

বলেই সে উঠে চলে গেল। উর্মিও অনুসরণ করল তাকে।

কথক মশাই হতভম্ব হয়ে গেলেন। অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন গহনচাঁদ। কথক মশাই বললেন, "বিয়ের কথা উঠলে আগে তো ছেলেরাই বলত বিয়ে করব না। আজকাল মেয়েরাও বলছে না কি?"

গহনচাঁদ অপ্রস্তুতমুখে বললেন, "বাড়ি বাঁধা দিয়ে পণের টাকা সংগ্রহ করা হচ্ছে কি না সেইজন্যেই ওর রাগ। লেখাপড়া শিখেছে তো!"

"বাড়ি বাঁধা না দিলে পণের টাকা পাবে কোথায় তুমি? আর পণ না হলে বিয়েই বা হবে কি করে?"

"সে তো আমি বুঝছি। বুঝিয়ে বলেওছি ওকে।"

মুচকি হেসে কথক বললেন, "ঘাবড়ো না, সব ঠিক হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত। এক কাজ করা যাক, সাবিত্রী সত্যবানের কথকতাটা ওকে শুনিয়ে দেওয়া যাক। শুনলে বুঝবে যে আমাদের কিছুই হাত নেই, সবই বিধির নির্বন্ধ। ধর্মগ্রন্থ তো পড়েনা আজকালকার ছেলেমেয়েরা।"

এ শুনে গহনচাঁদ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

"বেশ তো কালই লাগাও। তৈরি আছে তোমার তো?"

"হ্যাঁ, আমি সব সময়ই তৈরি। তুমি এখানে একটা গানের ইস্কুল খুলেছ না কি শুনলাম।"

"হ্যাঁ জুটে গেছে কিছু ছাত্রছাত্রী এখানেও। আমি আর একটা কাজ নিয়ে মেতে আছি। শিব-স্তোত্রগুলোতে নতুন নতুন সুর বসাবার চেষ্টা করছি। শোনাব তোমাকে।"

"বেশ তো, চুনী কোথায় গেল, আমার তোরঙ্গটা নাবিয়েছে কি না।"

"সব নাবিয়েছে"—নেপথ্যে থেকে উত্তর দিলে চুনীলাল। বেচারা দমে' গিয়েছিল। বাড়ি বাঁধা দিয়ে সাত হাজার টাকার বেশি পাওয়া যায় নি। ও টাকাটা তো বিয়েতেই খরচ হয়ে যাবে, কিছুই বাঁচবে না!

"চল চল ভেতরে চল। সীতারাম, রমজান, বস তোমরা।"

বিশ্বনাথ কথককে নিয়ে গহনচাঁদ শশব্যস্ত হ'য়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন।

সীতারাম এবং রমজান দু'জনেই কিন্তু বজ্রাহতবৎ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। গুরুজির কাশীর বাড়ি বাঁধা দিয়ে পণের টাকা সংগ্রহ করা হচ্ছে! সে কি! এর একটা বিহিত করতে হবে তো। রঙ্গনার মতো মেয়েকে বিয়ে করতে পাওয়াটাই তো ভাগ্যের কথা, তার জন্যে আবার পণ লাগবে অত টাকা, বাড়ি বাঁধা দিতে হবে? নিম্নকণ্ঠে

পরামর্শ করে' ঠিক করে ফেললে তারা যে দিবসবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে 'সল্লা' করতে হবে। গুরুজির বাড়িটা মহাজনের হাতে যেতে দেওয়া হবে না। দিবসবাবু লোকটিকে যতই দেখছে তারা, ততই তার উপর শ্রদ্ধা বাড়ছে। তিনি হয়তো ব্যবস্থা করতে পারবেন কিছু। ব্যবস্থা করতেই হবে! জরুর!

দিবসের মনের নেপথ্যলোকে পরিবর্তনের যে আভাসটা জাগছিল ধীরে ধীরে তা আর আভাসমাত্র রইল না। ক্রমশ সে উপলব্ধি করল যে এই সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ কল্পনা-উল্লাস-বর্জিত কর্মজীবনে আনন্দ সে আর পাচ্ছে না। এই 'রুটিন'-চিহ্নিত জীবন তার কাছে কারাগারের মতো ঠেকছিল, তার কারণ এতে কল্পনার খোরাক নেই, আত্মানুসন্ধান নেই, অজানার উদ্দেশ্যে অভিযানের আয়োজন নেই, আছে কেবল শুষ্ক কাজ, যা প্রেরণাহীন, উদ্দীপনাহীন। একই জিনিসের বিরামহীন পুনরাবৃত্তি।

যে বি-এস-সি ছেলেটিকে সে দুপুরে পড়ায় তার সান্নিধ্যে এলেই সে চাঙ্গা হয়ে ওঠে খানিকক্ষণের জন্য। একদিন ছেলেটির অসুখ করেছিল, সেদিন সে সোজা চলে' গেল কলেজে। প্রফেসারদের সঙ্গে কথা বললে, দু'একজন সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হল, ল্যাবরেটরিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াল খানিকক্ষণ, এটা সেটা নাড়লে, তারপর চলে' এল। একজন প্রফেসার প্রশ্ন করেছিলেন, "কি করছ তুমি আজকাল? শুনে-ছিলাম ল' কলেজে ঢুকেছ?"

"তেমন বিশেষ কিছুই করছি না। ল' কলেজ ছেড়ে দিয়েছি।"

"আমরা আশা করেছিলাম তুমি রিসার্চ লাইনেই থাকবে।"

"দেখি আর বছর চেষ্টা করব।"

নিজের বর্তমান জীবনের কথা কাউকেই কিছু বললে না সে। কলেজের চারিদিকে ঘুরে সে যেন ম্রিয়মান হয়ে পড়ল। নিজের প্রিয়া

অপরের গলায় মাল্যদান করেছে দেখলে প্রথম উত্তেজনার পর যে অবসাদ আসে সেই ধরণের একটা বিষাদ তার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে ফেললে। কলেজ থেকে বেরিয়ে একটা গলিতে ঢুকে সোজা হাঁটতে লাগল। সদর রাস্তা দিয়ে পারতপক্ষে সে হাঁটতে চায় না, কারণ হাঁটতে হাঁটতে সে চিন্তা করে, অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

রঙ্গনাকে ঘিরে তার চিত্ত যে বর্ণলোক সৃজন করেছিল তার দ্যুতিও ম্লান হয়ে এসেছে। গিরি-নির্ঝরিণী যে গহ্বরে পড়ে' কিছুক্ষণের জন্য প্রপাতের আনন্দে পথ-হারা হয়েছিল সে গহ্বর পূর্ণ হয়ে গেছে, জল উপচে পড়ছে, নির্ঝরিণী নূতন পথ খুঁজছে আবার। রঙ্গনাকে তার যে আর ভাল লাগছিল না তা নয়, ভাল খুবই লাগছিল, কিন্তু উন্মাদনাটা আর ছিল না। নেশাটা হঠাৎ কেটে গেছে যেন। সেদিন স্টেশনে 'বাস'-ট্যাক্সির আলোচনার জন্যই হোক বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক তার অন্তর্যামী মন যেন জানতে পেরেছে যে তার দারিদ্র্যের আদর্শকে মেনে নিয়ে শুধু তার গৌরবের গৌরবান্বিত হবার প্রবণতা বা চারিত্রিক বল রঙ্গনার নেই। আর পাঁচটা মেয়ের মধ্যে রঙ্গনা সুখে স্বচ্ছন্দে স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করতে চায়। আদর্শের দুরূহ পথে অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে' মরু-পর্বত উত্তীর্ণ হবার বাসনা তার নেই। সামর্থ্যও নেই বোধহয়। তার নিজেরই কি আছে? একটা আদর্শকে রূপ দেবার জন্যেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, এরই মধ্যে অবসন্ন হয়ে পড়ছে কেন? কি তার কাম্য? গবেষণার কল্পলোকে একদিন তাকে পৌঁছতেই হবে, কিন্তু তার আগেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে কেন? সহসা তার মনে হল গীতা উপনিষদ সে কিছু কিছু পড়েছে বটে, নিষ্কাম কর্মের তত্ত্বতা আওড়াতেও পারে, কিন্তু তা তার অন্তরে সঞ্চারিত হয় নি, চরিত্র গঠন করে নি, তাই তার এই বিষাদ। পরমুহূর্তেই তার আবার মনে হল যা তার নেই

তা নিয়ে আক্ষেপ করে' লাভ নেই, যা তার আছে সেইটে সম্বল করেই তাকে অগ্রসর হ'তে হবে। কি সেটা?

কিছুক্ষণ পরে তার মনে হল অজানাকে জানবার আকাঙ্খাই তার একমাত্র সম্পদ। অসংখ্য মুনি ঋষি বিজ্ঞানী আবিষ্কারক যে প্রেরণায় বহুবিধ কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন, সেই প্রেরণাই তারও সম্বল। সেই অজানাই হয়তো ভগবান। এই কথাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তো বলেছেন –

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু।

আমিই পৃথিবীতে পুণ্য গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্বভূতে জীবন এবং তপস্বিগণের তপোবল। তার নিউক্লিয়ার এনার্জির গবেষণাও তাহলে ভগবদারাধনাই। সে জিজ্ঞাসু। তাহলে সে এত অবসন্ন হয়ে পড়ছে কেন? এই একটা বছর কষ্ট করে' সে যদি কিছু টাকা জমাতে পারে তাহলে আবার সে নিজের অভীষ্টপথে চলতে পারবে। তার মনের ভিতর কে যেন বলে উঠল—'তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়'। হঠাৎ সে যেন আত্মস্থ হল এবং আত্মস্থ হয়েই আনন্দিত হল। তার মনে হল, গীতার নিষ্কাম বৈরাগ্য হয়ত সে লাভ করতে পারেনি (পারেনি বলে' খুব যে একটা দুঃখ আছে তাও নয়) কিন্তু গীতার কর্ম-প্রেরণা সে লাভ করেছে, এই কর্ম-প্রেরণাই হয়তো একদিন তাকে নিষ্কাম লোকে উত্তীর্ণ করে দেবে। যদিও সে বিজ্ঞানের ছাত্র কিন্তু গীতা উপনিষদের প্রতি তার একটা শ্রদ্ধা আছে, হয়তো বিজ্ঞানের ছাত্র বলেই শ্রদ্ধাটা আরও গভীর। যে সত্য সন্ধানে বিজ্ঞান ব্যাপৃত, তার মনে হয়েছে সেই সত্যের আভাস, সন্ধান এবং উপলব্ধির সংবাদ ওই গ্রন্থগুলি-তেই আছে সুতরাং গীতার বাণীর সঙ্গে তার আচরণের খানিকটা মিলও যে আছে এটা আবিষ্কার করে সে খুশি হল। আপন মনেই

শিস দিলে খানিকক্ষণ। শিস দিতে দিতেই চলেছিল। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কিরণের সঙ্গে।

"তিনবার তোর বাসায় গিয়ে ফিরে এসেছি। তুই বাড়িতে থাকিস কখন আজকাল?"

"রাত এগারোটার পর।"

"দুপুরে কি করিস?"

"দুপুরে একটা টিউশনি নিয়েছি।"

"সন্ধের পর?"

"সরোদ শিখতে যাই। তুই যাস না কেন?"

"সময় হয় না ভাই।"

নীরবে কিছুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটবার পর কিরণ বললে, "তোর বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল একদিন রাস্তায়।"

"তাই না কি?"

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল দিবস।

"তারপর?"

"তোর ঠিকানাটা জানতে চাইলেন।"

"দিয়েছিস না কি?"

তার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে' উঠল, আশঙ্কায় নয়, আশায়। কাল রাত্রেই সে ভাবছিল বাবা যদি হঠাৎ এসে পড়েন—তারপর যে কি হবে তা সে কল্পনা করতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেছিল, ফিরে যে যাবে না তা ঠিক, কিন্তু বাবা যদি আসেন, তাহলে—

"না। তুই মানা করেছিলি, তোকে না জিগ্যেস করে' ঠিকানা দিতে পারি কখনও?"

দিবস বললে বটে—"ঠিক করেছিস" কিন্তু ভিতরে একটু হতাশ হল সে। আরও কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটার পর কিরণ মুচকি হেসে বললে—

"আমি আশা করেছিলাম যে এর মধ্যে একদিনও অন্তত তুই আমার বাসায় যাবি, অন্তত রবিবারটায়।"

"সময়ই পাচ্ছি না।"

"সময় না পাবার যে কারণগুলো তুই বললি তাছাড়া আর একটা কারণেরও খবর পেয়েছি উর্মির কাছে।"

"কি?"

"রঙ্গনা।"

"আরে দুৎ, পাগল না কি! কি বলেছে তোকে উর্মি?"

কিরণের ভয় হল দিবস হয় তো উর্মির সম্বন্ধে এখনই একটা খারাপ ধারণা করে' বসবে—ভাববে সাধারণ মেয়েদের মতো উর্মিও হয়তো পরনিন্দা-পরচর্চা-পরায়না।

"না, না, এমন বিশেষ কিছু বলেনি সে। তুই যেদিন রঙ্গনার জন্যে আয়নাটা কিনে নিয়ে গিয়েছিলি সেদিন উর্মি সেখানে ছিল কি না, সেই আয়নার খবরটাই আমাকে বলছিল। আর কিছুই বলে নি। মানে তুই যা—"

কথার পারম্পর্য্য আর ঠিক রাখতে পারলে না সে, কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল সব। রঙ্গনার সম্বন্ধে দিবসকে যতটা কড়া ভাষায় সে সাবধান করে' দেবে ভেবেছিল উর্মির প্রসঙ্গ উঠে পড়াতে ততটা কড়া হবার সামর্থ্যই আর তার রইল না।

"একট আয়না কিনে দিয়েছি বটে, তার কারণ আমার চোখের সামনেই ওর আয়নাটা ভেঙে গেল কি না, হঠাৎ কেমন একটা শিভলরি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল মনের ভিতর, বুঝলি?"—মুচকি হেসে চাইলে সে কিরণের দিকে—"তাছাড়া আর একটা কথাও মনে হয়েছিল, সত্যি এত বিচিত্র আমাদের মন—"

"কি কথা?"

"মনে হল আয়নাটা কিনে দিয়ে দেখিই না ওকি করে। রিঅ্যাক-শন্‌টা কি রকম হয়।"

"কি রকম হল?"

"ভালই হল। অর্থাৎ চটে উঠল সে। সাধারণ মেয়ে হলে খুশি হত"

"তাহলে রঙ্গনা যে অসাধারণ মেয়ে এ ধারনাটা তোর হয়েছে অন্তত?"

"হয়েছিল কিন্তু টিকল না। তোর কথাই ঠিক খোলার ঘরে ও আসবে না, এলেও স্বস্তি পাবে না। থাক, ও কথা নিয়ে আমি আর মাথাই ঘামাচ্ছি না। সেই যে তুই একটা কবিতা লিখেছিলি মনে আছে? 'হয় তো স্বপন হয় তো ভুল, ফুটিল এবং ঝরিল ফুল, এখন আমার মনের অনেকটা সেইরকম অবস্থা"—অকৃত্রিম হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল দিবসের মুখ।

"মানে রঙ্গনার সম্বন্ধে মোহটা তোর কেটে গেছে বলছিস?"

"একেবারে।"

"সত্যি?"

"সত্যি বলছি?"

দিবসের কণ্ঠস্বরে এমন একটা সুনিশ্চিত দৃঢ়তার সুর বাজল যে কিরণ নিঃসংশয় হল। নিসংশয় হয়ে সে শুধু অবাকই হল না, একটু ক্ষুব্ধও হল, কেমন যেন একটু হিংসাও হল তার। মনে হল আহা সেও যদি ঊর্মির মোহটা এমনি ভাবে কাটিয়ে উঠতে পারত। কথাটা বলে' দিবসও কেমন যেন একটু বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। রঙ্গনাকে সে ভালবাসতে পারল না এই সত্যটা যেন তাকে পীড়িত করতে লাগল। তার মনে হতে লাগল একটা গোটা মানুষকে একটা বিশেষ আদর্শের মাপে মাপতে গিয়ে যদি কিছু ঘাটতিই পড়ে থাকে তাই ব'লে তাকে ভালবাসা যাবে না কেন? সহসা একটা সত্যের সম্মুখীন হল সে।

তার মনে হ'ল ওটা ছুতো। যে নিগূঢ় কারণে প্রথম দর্শনেই প্রেম হয় সেই নিগূঢ় কারণটারই অভাব আছে এক্ষেত্রে। দোকানে টাঙানো নূতন ধরণের ছিট যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে রঙ্গনাও তেমনি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তার প্রেমে সে পড়ে নি। পড়লে অদের্শের কথা ভাববারই অবসর হ'ত না তার। আবার মনে হল সত্যিই কি হ'ত না? এতই দুর্বল সে? তার চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল কিরণের প্রশ্নে।

"সত্যিই তুই বাড়ি ফিরবি না নাকি?"

"নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তার পর ফিরব। তার আগে নয়।"

"তোর বাবা বলেছিলেন বাড়ি ফিরে গিয়েও তুই তোর নিজের আদর্শ অনুসারে যদি চলতে চাস তাহলে বাধা দেবেন না তিনি।"

"তিনি হয়তো বাধা দেবেন না, কিন্তু ওই বাড়িতে থাকাটাই একটা বাধা যে, এটা তুই বুঝতে পারছিস না। আমি নিজেকে যাচিয়ে দেখতে চাই যে নিজের শক্তিতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি কি না, তার জন্যে সব রকম কষ্ট সহ্য করতে পারি কি না। বাড়িতে থেকে তা হবে কি করে?"

"তোর ঠিকানাটা তাহলে তোর বাবাকে জানাব না?"

"সেটা তোমার ইচ্ছে। তুমি তো আমার চাকর নও যে তোমাকে আমি হুকুম করতে পারি।"

কথাটা এর বেশি অগ্রসর হবার আর সময় পেল না। একটা দোতলার জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে সীতারাম সহসা কলরব ক'রে উঠল —"ওয়া ওয়া ওয়া—দিবসবাবু যা রহে হেঁ। দিবসবাবু এক মিনিট ঠহর যাইয়ে।"

দিবস ঊর্ধ্বমুখ হয়ে থেমে গেল।

কিরণব ললে, "আমি চললুম। সময় করে আসিস মাঝে মাঝে

আমার বাসায়। এ সপ্তাহটা সন্ধের পর আমি রোজই বাসায় থাকব। ন'টা নাগাদ যদি আসিস দেখা হবে।"

"আচ্ছা চেষ্টা করব।"

কিরণ চলে গেল। তার বিশ্বাস হল যে রঙ্গনার মোহ দিবস সত্যিই কাটিয়েছে, ও নিয়ে উদ্‌বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই আর। সূর্য চৌধুরিকে দিবসের ঠিকানাটা না জানানোই ঠিক ক'রে ফেললে সে। দিবসের যখন সেটা আন্তরিক ইচ্ছে নয় তখন দরকার কি।

সীতারাম তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এল।

ওফ্, তফাক সে আপকো দর্শন মিল গ্যয়া। আপ হি কো বাত হম দোনো স্মরণ কর রহে থে।"

দিবসকে টেনে সে উপরে নিয়ে গেল এবং রঙ্গনার বিয়েতে গহনচাঁদের যথাসর্বস্ব বাড়িটি যে সুদখোর মহাজনের হাতে চলে যাচ্ছে তা সবিস্তারে বর্ণনা ক'রে দিবসকে এর উপায় নির্ধারণ করতে বললে। দিবস কি যে বলবে তা ভেবেই পেল না। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললে, "আচ্ছা দেখি কি করতে পারি।"

বিকাশবাবু মনের আনন্দেই ছিলেন। এর অর্থ এ নয় যে তিনি রঙ্গনাকে পাওয়ার স্বপ্নেই বিভোর হয়ে ছিলেন সর্বদা। তিনি তাঁর বেহালা, ক্লাব, টেনিস, মোটর, সমরেশ-জাতীয় বন্ধুর খোশামোদ প্রভৃতি উপাদানে গড়া তাঁর নিজস্ব জগতে নিজেকে নিয়েই কাল কাটাচ্ছিলেন যথারীতি। যে মেয়েটিকে হঠাৎ দেখে পছন্দ হয়েছিল সেই মেয়েটিই বধূরূপে অদূর ভবিষ্যতে তাঁর গলায় মাল্যদান করবে এই ধারণাটা তাঁর আকাশকে কিছুটা রঙীন ক'রে তুলেছিল নিশ্চয়ই কিন্তু তা নিয়ে মনে মনেও তিনি খুব একটা মাতামাতি করছিলেন না। আলতোভাবে উপভোগ করছিলেন পরিস্থিতিটা। জ্যাঠামশাই মত না দিলে যে

উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ত তিনি মত দেওয়াতে তাও হয় নি। কুষ্ঠি নিয়ে একটা গোলমালের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু চুনীলালবাবু বুদ্ধিমান লোক, মাস্টার 'কি'র (key) মতো এমন এক মাস্টার কুষ্ঠি এনে দিয়েছিলেন যে সে কুষ্ঠির সঙ্গে যে কোনও কুষ্ঠীর মিল হতে বাধ্য। রঙ্গনার কুষ্ঠিটা দেখে জ্যাঠামশাই খুব পুলকিত হয়েছেন না কি। কুষ্ঠি ব্যাপারে বিকাশবাবুর নিজের তেমন আস্থা নেই। তাঁর মতে জীবনে যখন প্রতি মুহূর্তে কত অজানাকে মেনে নিতে হবে তখন ভাবী পত্নীর অদৃষ্ট সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেই যে জীবনযাত্রা নিষ্কণ্টক হয়ে যাবে এ বিশ্বাস মূঢ়তারই নামান্তর।

বিকাশবাবুকে দেখলে আধুনিক মনে হওয়ারই কথা। তিনি আধুনিক সময়ে জন্মেছেন, আধুকি শিক্ষা পেয়েছেন, আধুনিক চাল-চলনে চলেন, কিন্তু সত্যিকারের আধুনিকতা, যা প্রাচীন কুসংস্কারকে ভেঙে নূতন পথ সৃষ্টি করে, তা তাঁর নেই। তিনি একালে জন্মেছেন বলেই ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে পাইপ টানেন, সেকালে জন্মালে শাল গায়ে দিয়ে গড়গড়া টানতেন। নির্বিবাদী লোক তিনি, গতানুগতিক ধারায় ঝড়ঝাপটা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নির্বিঘ্ন জীবন যাপন করতেই তিনি অভ্যস্ত। তাই চুনীলালের অনুরোধটা রাখতে পারলেন না। চুনীলাল এসে অনুরোধ করেছিল বিকাশবাবু যদি তাঁর জ্যাঠামশাইকে একটু বলেন পণের টাকাটা হয়তো কম ক'রে দেবেন তিনি।

বিকাশবাবু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—"দেখুন পণের টাকার প্রতি 'পারসোনালি' আমার কোনও লাভ নেই, কিন্তু জ্যাঠামশাইকে পণের টাকা কমাবার কথা আমি বলতে পারব না। কারণ ওটা ওঁর এলাকা, পরের এলাকায় ঢুকে ঝামেলা সৃষ্টি আমি করতে পারব না, আমাকে মাপ করুন।"

চুনীলালকে মাপ করতে হয়েছিল। বিকাশবাবুর কাছে একটা প্রতিশ্রুতি অবশ্য সে আদায় ক'রে নিয়েছিল। বিয়েটা হয়ে গেলেই তিনি তাঁর নূতন বাড়ির জন্য অন্নদা বিশ্বাসের ইলেকট্রিক দোকানের মালপত্রগুলো কিনে নেবেন। চুনীলাল দোকানটাকে অন্নদা বিশ্বাসের দোকান বলেই চালিয়েছিল বিকাশবাবুর কাছে। তার মনে হয়েছিল তাহলেই বিকাশবাবুর কাছে 'অ্যাপীল' করারও সুবিধা হবে, দামের সম্বন্ধেও কোনও গোলযোগ হবে না। মামাশ্বশুরের দোকান জানতে পারলেই ছোকরা 'গয়ং গচ্ছ' করবে, আর দাম যদি কম করতে বলে, 'না' করা যাবে না।

বিশ্বনাথ কথক আসার পরদিনই চুনীলাল বিকাশকে জানিয়ে গেল যে প্রকাশবাবু রঙ্গনাকে দেখার দিন স্থির ক'রে ফেলেছেন। মেয়ে পছন্দ হলে সাতদিনের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যাবে। মেয়ে যে পছন্দ হবেই এ সম্বন্ধে বিকাশের অন্তত কোনও সন্দেহ ছিল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সেদিন স্টেশনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দিবসের বাসে উঠে রঙ্গনা মনে মনে লজ্জায় মরে গিয়েছিল, তার বারবার মনে হয়েছিল যেচে গিয়ে অমন ক'রে গায়ে প'ড়ে আলাপ করার কোনও অর্থ হয় না। মনে হয়েছিল বটে, যাবার লোভ কিন্তু সে সম্বরণ করতে পারে নি। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে এর স্বপক্ষে একটা যুক্তিও সে খাড়া করেছিল অবশেষে। যাকে ভাল লাগে তার কাছে যাবেই না বা কেন? নিজেকেই প্রশ্ন করেছিল সে। আত্মসম্মানহানিকর কোনও আচরণ না করলেই হ'ল।

দ্বিতীয় দিন কলেজ-ফেরত দিবসের বাসার উদ্দেশ্যে সে যখন চলেছিল তখন যে ক্ষোভ তার চিত্তকে মথিত করছিল তা আত্মগ্লানিজনক নয়। তার ভয় হচ্ছিল দেরি হয়ে গেছে, দিবসকে হয়তো বাসায় পাওয়া যাবে না। মালাগুলো কিনতেই দেরি হয়ে গেল তার। আজ সন্ধ্যার পরই কথকতা করবেন বিশ্বনাথ কথক। গহনচাঁদ তাই তাকে কলেজ-ফেরত কিছু ফুলের মালা কিনে আনবার ফরমাস দিয়েছিলেন। বিশ্বনাথ কথক আসবার পর দিবস আর যায়নি একদিনও। তাকে যেতে হচ্ছিল অতসী ক্লিনিকে। 'দিবস কেন যায়নি' এই কৌতূহলটাকে কিছুতেই দমন করতে না পেরে শেষে ছুটো ওজুহাত খাড়া করেছিল রঙ্গনা। দিবসের 'আই উইল্ নট্ রেস্ট' বইটা তার কাছে রয়েছে, এইবার সেটা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। তাদের বাড়িতে কথকতা হচ্ছে এ খবরটাও তাকে দেওয়া উচিত। দ্বিবিধ ঔচিত্য-বোধের তাগিদে সে যেন একটা কর্তব্য সম্পাদন করতে চলেছিল। সেদিন 'বাসে' মনের যে অংশটা কুণ্ঠিত হয়েছিল সে-ই এখন ধমকাচ্ছিল অতি-বিশ্লেষণকারী অংশটাকে। এই অতি-বিশ্লেষণকারী অংশটা

কিন্তু ছিল, তার প্রতিবাদ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল যদিও, তবু সে বলে যাচ্ছিল এ ঠিক হচ্ছে না, যতই ব্যাখ্যা কর, কিন্তু ঠিক হচ্ছে না, আত্মসম্মানে ঘা লাগছে।

রঙ্গনা গিয়ে দেখলে দিবসের ঘরে তালা বন্ধ। সোজা চলে গেল উঠোনে। হাঁসটা বসেছিল একধারে গুটিসুটি হয়ে। তার কাছে গিয়ে রঙ্গনাও বসল। রঙ্গনাকে বসতে দেখে প্রতিবাদ করে উঠল হাঁসটা।

"আঃ আঃ চু চু"—মালার ঠোঙা দেখিয়ে ডাকলে সে হাঁসটাকে। হাঁসটা সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল একবার। খাবার টাবার দেবে না কি সত্যি?

এমন সময় সৌদামিনী এল।

"ও আপনি?"

"দিবসবাবু বেরিয়ে গেছেন বুঝি? তাঁর ঘর বন্ধ দেখলাম।"

"সে গেছে হাসপাতালে বোধ হয়।"

"কেন?"

"পটলির স্বামীকে দেখতে। তাকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে কিনা।"

"ও, খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল বুঝি?"

"খুব। কয়েকটা ইনজেকশন পড়াতে এখন একটু ভালর দিকে।"

সৌদামিনীর সঙ্গেই দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল রঙ্গনা।

সাড়ম্বরে কথকতা সুরু করেছিলেন বিশ্বনাথ কথক।

আবেগভরে কিন্তু যে সুর ধরেছিলেন তিনি—(সেই চিরন্তন সুর যা যুগে যুগে নিত্যনব বেশে ফিরে ফিরে আসছে বারবার)—সেই সুর যে তাঁদের উদ্দেশ্যটাকেই পণ্ড করে দিচ্ছে এ খেয়াল ছিল না তাঁর।

'বিধির নির্বন্ধ' কথাটা প্রথম প্রথম দু'একবার উচ্চারণ করেছিলেন তিনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাবাবেগে তিনি যে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছিলেন তা কোনও রকম নির্বন্ধ দিয়েই সীমাবদ্ধ নয়।

"প্রম এমনই জিনিষ"—বলে চলেছিলেন তিনি—"কুসুমের মতো কোমল অথচ বজ্রের মতো কঠিন, আকাশের মতো সীমাহীন অথচ রত্নের মতো স্বয়ং-সম্পূর্ণ, সৌরভের মতো সূক্ষ্ম অথচ পর্বতের মতো দৃঢ়। স্বয়ং সৃষ্টি-কর্তা যার জন্যে প্রতি জীবের অন্তরে ভিখারী সেজে বসে' আছেন সেই প্রেমই মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্ন, সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য। মানবের সমস্ত কাব্য, সমস্ত পুরাণ তাই প্রেমের মহিমাতেই সমুদ্ভাসিত। বস্তুত এই আমাদের তপস্যা, এই তীর্থেই আমরা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে উত্তীর্ণ হতে চাচ্ছি। প্রেমই ভগবান, প্রেমই শক্তি। এই শক্তিতেই জনক-দুহিতা সীতা তুচ্ছ করতে পেরেছিলেন ত্রিভুবনজয়ী রাবণের ঐশ্বর্য্যকে, বৃষভানুনন্দিনী রাধা সহ্য করতে পেরেছিলেন সমাজের সহস্র অত্যাচার। প্রেম এমনিই জিনিস। তা মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন করায়। প্রেম ঐশ্বর্যের কাঙাল নয়, প্রেম মোহ নয়, প্রেম দিব্য দৃষ্টি। শ্রীরাধিকা মথুরার রাজা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন নি, ভালবেসেছিলেন রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণকে। সীতার প্রেম গাঢ়তর হয়েছিল বনগমনোন্মুখ চীর-ধারী নিঃস্ব রামচন্দ্রকে ঘিরে। রাজকন্যা দময়ন্তীর প্রেম উজ্জ্বলতর হয়েছিল ভাগ্যহত নলের দীনতার অন্ধকারে। এই প্রেমই পথ দেখিয়েছিল সাবিত্রীকে। দরিদ্র বনবাসী স্বল্পায়ু সত্যবানকে বরণ করতেও দ্বিধা করেন নি তিনি। পিতামাতার আদেশ অমান্য করেও বনবাসী সত্যবানের পর্ণকুটিরে গিয়ে বনবাসিনী হয়েছিলেন রাজনন্দিনী সাবিত্রী। প্রেমই তাঁকে সে শক্তি দিয়েছিল।"

গান গেয়ে উঠলেন বিশ্বনাথ কথক—

ওগো প্রেম, বিশ্বমাঝে
তুমিই গতি পরাৎপর
তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু,
তুমিই ভোলা মহেশ্বর,
ভুবন ভরা তোমার আলো
দেয় ঘুচিয়ে সকল কালো
মহাকালের মন ভুলালো
তোমার লীলা কি মনোহর।

তোমার রূপ যে পুষ্পে ফোটে
আকাশ ভরা তারায় জ্বলে
স্বর্গে ওঠে ধরায় লোটে
তরঙ্গিনীর ধারায় চলে।

তোমার জোরে সাগর মাঝে
শঙ্কাহীনা বেহুলা যে
শিবের সতী অমৃতা যে
অরুন্ধতী অনশ্বর।

শুনতে শুনতে রঙ্গনার জন্মান্তর ঘটে গেল যেন। যেটুকু শঙ্কা সংকোচ দ্বিধা সন্দেহ ছিল তা অবলুপ্ত হয়ে গেল একেবারে। কল্পনায় অদ্ভুত এক স্বপ্নলোক সৃজন করতে লাগল সে। দিবসের খোলার ঘরে গিয়ে সে যেন তার ঘরণী হয়েছে। নিষ্ঠুর দারিদ্র্যর সঙ্গে যেন সংগ্রাম করছে অহরহ। দিবসের শরীর যেন ভেঙে পড়েছে। রোগে সে যেন শয্যাশায়ী।

সহসা দ্বারপ্রান্তে একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল। সেই ছায়ামূর্তিকে রঙ্গনা এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলে—'তুমি কে?' ছায়ামূর্তি যেন উত্তর দিলে—'আমি দারিদ্র্য, আমি ওর যম, ওকে গ্রাস করব'। রঙ্গনা বললে—'তা পারবে না। সাবিত্রী যেমন যমের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন সত্যবানকে তোমার হাত থেকে তেমনি আমি উদ্ধার করব আমার স্বামীকে'।

বিশ্বনাথ কথকের গান শেষ হয়ে গেল। তিনি আবার আরম্ভ করতে যাবেন এমন সময় বারান্দা থেকে চুনীলাল উঁকি দিয়ে হেসে বললে, "প্রকাশবাবু খবর পাঠিয়েছেন পরশু দিন রঙ্গনাকে দেখতে আসবেন তাঁরা।"

"তাই না কি?"

গহনচাঁদ উঠে বাইরে গেলেন।

দিবস ফিরল সেদিন অনেক রাত্রে।

পটলির স্বামীর কাসিটা একটু কমেছে, জ্বরটাও কমের দিকে। দিবসের গল্প জমে' উঠেছিল সৌরেন ডাক্তারের সঙ্গে। সৌরেন তার সহপাঠী ছিল বটে কিন্তু তার জীবন কাহিনী সে কিছুই জানত না। ডাক্তারি পাস করে আর পাঁচজনের মতো ডিসপেনসারি খুলে সে ব্যবসা আরম্ভ করেছে এইটুকুই শুধু জানা ছিল তার। এখন সব কথা শুনে সে অবাক হয়ে গেল। শুধু অবাক নয় মুগ্ধ হল। যে যক্ষ্মা ব্যাধিতে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে ও একা দাঁড়িয়েছে, এর বীরত্বটাই শ্রদ্ধান্বিত করে' তুললে তাকে। সাধারণ লোক হলে ও গভর্নমেণ্টের ঔদাসীন্যের উপর সমস্ত দোষারোপ করে' যথারীতি টাকা রোজকারে মন দিত। সৌরেন কিন্তু তা করে নি। সে যথাসাধ্য একাই চেষ্টা করছে কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে। সৌরেনের সংস্পর্শে

এসে তার মন আরও যেন উতলা হয়ে উঠল। মনে হতে লাগল তার কর্তব্য থেকে দূরেই সরে' রয়েছে এখনও সে। কবে তার টাকা জমবে, তারপর সে রিসার্চ লাইনে যাবে, সে তো এখনও বহুদূর। বাবার কাছে ফিরে যাবে আবার? কিরণকে তিনি বলেছেন যে তার আদর্শ অনুসারে তাকে চলতে দেবেন। দেবেন কি সত্যি? কিন্তু না লক্ষ্য-ভ্রষ্ট সে হবে না। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের মেরুদণ্ডের জোরেই উন্নতি করতে হবে। বড় মুখ করে' সকলকে যে কথাটা বলেছে তার মান রাখতেই হবে তাকে।

বাড়ি ফিরে দেখলে সৌদামিনী তার ঘরের মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। দিবসের সাড়া পেয়ে উঠে বসল।

"বড় দেরি হল আজ যে?"

"সৌরেনের সঙ্গে গল্প করছিলাম।"

"ওই আড্ডা দেওয়া স্বভাবটা ছাড়। যা দিনকাল পড়েছে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে ভাবনা হয়।"

টেবিলের উপর ঢাকা দেওয়া বাটিটা দেখিয়ে দিবস জিগ্যেস করলে, "এটা কি?"

সৌদামিনী কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল একটু।

"পেঁয়াজ বড়া ভেজেছিলাম আজ সন্ধে বেলা। ভাবলাম তুমি যদি এসে পড় গরম গরম খাবে দুটো। কিন্তু যা দেরি করলে, এখন কি আর ভাল লাগবে?"

দিবস বাটি খুলে একটা বড়া মুখে পুরে চিবোতে লাগল।

"বাঃ চমৎকার হয়েছে!"

"আসল খবরটি বল এখন। কি বললেন ডাক্তারবাবু?"

"বললেন গয়না বেচে টাকা যোগাড় করবার দরকার নেই। গিরি রোজকার করে' যতটুকু পারে দেয় যেন কিছু কিছু। ওষুধের দাম

টাকাগুলো দিয়ে দেয় যেন আস্তে আস্তে। তোমাদের পীড়ন করে' ও কিছু নিতে চায় না।"

"খুব ভালো লোক তো!"

"দেবতা।"

সৌদামিনী স-স্নেহে চেয়ে রইল দিবসের দিকে। মনে মনে বলতে লাগল তুমি বা কি কম। তারপর তার মনে হল আজকালকার ছেলেরা সবাই ভাল। মেয়েরাও। হঠাৎ মনে পড়ল রঙ্গনার কথা।

"হ্যাঁ ভাল কথা মনে পড়েছে, সেই মেয়েটি এসেছিল আজ বিকেলে। তোমার বইটা দিয়ে গেছে। তাদের বাড়িতে কথকতা হচ্ছে আজ সন্ধ্যাবেলা, তার নেমন্তন্ন করে গেছে। তুমি যা রাত করে' ফিরলে, সকাল সকাল এলে যেতে পারতে।"

"রঙ্গনা এসেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"মেয়েটির মাথায় ছিট আছে একটু, না?"

"কেন বলত?"

"তোমার ওই রাজহাঁসকে নিয়ে কি কাণ্ডই যে করছিল! যাবার সময় শেষে হাঁসের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে গেছে একটা।"

"মালা? মালা এনেছিল নাকি?"

"অনেকগুলো। বাড়িতে কথকতা হবে কি না তাই বোধহয় কিনে নিয়ে যাচ্ছিল।"

হাঁসের গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছে?"

"হ্যাঁ গো, আর তোমার হাঁসও কি তেমনি, মালাটি কেমন পরলে। খানিকক্ষণ পরেই অবশ্য ছিঁড়ে ফেলেছে।"

দিবস ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইল।

কথকতা শেষ করেই বিশ্বনাথ কথককে চলে যেতে হল। গোয়া-বাগানে তাঁর এক বড়লোক আত্মীয় ছিলেন, তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সীতারাম রমজানও চলে গেল। তারা আশা করেছিল যে দিবস কথকতা শুনতে নিশ্চয় আসবে, তখন তার সঙ্গে বাড়ি বাঁধা দেওয়ার সম্বন্ধে আর এক প্রস্থ আলোচনা করা যাবে। দিবস না আসাতে তারা হতাশ হয়েছিল একটু। ঊর্মি যায় নি। সে গহনচাঁদকে ময়ূর নাচটা আর একবার দেখাবে বলে' আবীর নিয়ে বসেছিল। সিনেমার ডিরেকটার কালই তার নাচটা দেখতে চান, যদি পছন্দ হয় ছবিতে কোথাও ঢুকিয়ে দেবেন বলেছেন। নাচটা যদি 'হিট্' করে—ওফ্ তাহলে—আর ভাবতে পারছিল না ঊর্মি। অধীর আগ্রহে সে অপেক্ষা করছিল কথকতাটা কখন শেষ হবে। ঊর্মি ভাবছিল রঙ্গনাকে দিয়েই কথাটা পড়েবে সে। কিন্তু কথকতা শেষ হতেই রঙ্গনা উঠে ভিতরে চলে গেল। ঊর্মি সংকোচ পরিহার করে নিজেই শেষে বললে, "আমি আবীর এনেছি, ময়ূর নাচটা আর একবার আপনাকে দেখাব আজ, কাল একজন সিনেমা ডিরেকটার নাচটা দেখতে চেয়েছেন।"

"বেশ তো! আর একটু আগে বললে সীতারাম রমজানকেও আটকে রাখতাম। আবীর ছড়িয়ে আর দরকার নেই, এমনিই নাচো, যদি ভুল হয় আমি বুঝতে পারব। রঙ্গনা কোথা গেল? সেতারটা বাজাক না। চুনীলাল রঙ্গনাকে ডাক তো।"

চুনীলাল ভিতরের দিকে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বললে, "রঙ্গনা ঘরে খিল দিয়েছে, ডাকাডাকি করলাম কোনও সাড়া দিলে না। আশ্চার্য মেয়ে!"

"সে কি!"—প্রথমে বিস্মিত এবং পরমুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন গহনচাঁদ। নিজে গেলেন। রঙ্গনা কিন্তু কপাট খুললে না। জানলার

ফাঁক দিয়ে গহনচাঁদ দেখতে পেলেন কাঁদছে। বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ক্রন্দনাবেগে সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। আরও দু'চারবার ডাকলেন, অনুনয় করলেন, কিন্তু রঙ্গনা উঠল না। কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়লেন তিনি। বাইরে এসে ঊর্মিকে বললেন, "তুমি একবার দেখ দিকি ওর কি হল হঠাৎ।"

ঊর্মি ভিতরে চলে গেল। চুনীলাল জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। গহনচাঁদ চুনীলালের দিকে ফিরে বললেন, "বুঝলে চুনী, অমার মনে হচ্ছে ওকে দেখতে আসবে এই খবরটা পেয়েই ও—"

কি বলে' যে শেষ করবেন তা ঠিক করতে না পেরে থেমে গেলেন।

"এ খবরে কাঁদবার কি আছে ?"

ঈশান কোণে মেঘ দেখলে জীর্ণ তরীর মাঝি যে ভাবে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকে চুনীলাল সেই ভাবেই চেয়ে রইল খোলা জানলাটার দিকে। সত্যি সত্যি সে যেন আকাশের মেঘটাই খেতে পাচ্ছিল।

"গোড়াগুড়িই এ বিয়েতে ও আপত্তি করছে কি না।"

চুনীলাল এবার ভ্রূকুঞ্চিত করে' গহনচাঁদের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে, "আপত্তি করবারই বা কি আছে। এর চেয়ে ভাল পাত্র কি জুটবে এ বাজারে ?"

"পাত্রর সম্বন্ধে ওর আপত্তি নেই। ও আপত্তি করছে পণের ব্যাপারে।"

"পণ না হলে কি বিয়ে হয় ? আপনি ক্ষেপলেন নাকি ?"

"না, না আমি ক্ষেপব কেন। ও যা বলছে তাই বললাম তোমাকে।"

"ও রকম পাত্রের আজকাল বাজার দর কত জানেন ? টোয়েন্টি থাউজাণ্ড ! আমাদের কাছে তো কিছুই নিচ্ছে না ওরা।"

গহনচাঁদ কি বলবেন ভেবে পেলেন না। অপ্রস্তুত মুখে নীরবে খুতনিতে হাত বুলাতে লাগলেন। রঙ্গনা যা বলছে তা যে যুক্তিযুক্ত,

কোন ভদ্রলোকেরই যে এমনভাবে পণ দাবী করা উচিত নয়, তা তিনি বুঝছিলেন। কিন্তু সমাজের যা অবস্থা তাতে চুনীলাল যা বলছে তাও ঠিক। দু' তরফেই তাঁর মন সায় দিচ্ছে। আসলে তাঁর মনে হচ্ছে কোনও রকমে এখন এই গোলক ধাঁধা থেকে বেরুতে পারলে তিনি বেঁচে যান। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রটাতে সুর বসাবার জন্য মন ছটফট করছে তাঁর। বাজে ঝামেলাটা যে কোন প্রকারে মিটে গেলেই তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন যেন। মিটিয়ে ফেলবার জন্যই তিনি বাড়িটা বাঁধা দিতে ইতস্তত করেন নি। এ আবার কি এক বখেড়া এসে উপস্থিত হল! রঙ্গনা সত্যি সত্যি যদি এ বিয়ে না করতে চায় জোরজবর দস্তি করবারই বা কি দরকার। এ সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে আবার খোঁজা যাক না। আবার যখন পাত্র পাওয়া যাবে এবং সে-ও যদি পণ চায় (চাইবেই গহনচাঁদের ধারণা) তখন পণের ব্যাপারটা রঙ্গনার কাছে চেপে গেলেই হবে। এটা যখন জানাজানি হয়ে গেছে তখন—আড়চোখে তিনি চাইলেন একবার চুনীলালের দিকে। চুনীলাল বাইরের অন্ধকারের দিকেই চেয়েছিল নির্নিমেষে। হঠাৎ তার মনে হল একটি বিড়ি খাওয়া দরকার। বাইরে বেড়িয়ে গেল সে। একা একা গহনচাঁদ কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলেন। ভাবছিলেন উঠে আবার রঙ্গনার কাছে যাবেন কি না। উর্মি যখন ফিরে এল না তখন রঙ্গনা নিশ্চয়ই কপাট খুলেছে। উঠতে যাবেন এমন সময় তাঁর এক ছাত্রী এসে হাজির হল।

"ও আপনি বাইরেই আছেন? দরবারি কানাড়ার গৎটার এক জায়গায় কেমন যেন গোলমাল হচ্ছে। এ দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম ভাবলাম আপনাকে জিগ্যেস করে যাই। অসুবিধা হবে কি এখন?"

গহনচাঁদ যেন বেঁচে গেলেন।

"না, না, কিছুমাত্র না। এস, এস, বস। কোথায় গোলমাল হচ্ছে?"

সেতারটা তুলে তিনি মেয়েটিকে দিলেন।

"বাজাও তো দেখি।"

দরবারি কানাড়া সুরু হয়ে গেল। তাতেই বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটে গেল গহনচাঁদের। এ সময়টুকু এভাবে কাটাবার সুযোগ না পেলে তিনি ঠিক গিয়ে হাজির হতেন রঙ্গনার ঘরে এবং উর্মি-রঙ্গনার আলাপে বাধা সৃষ্টি করে' ব্যাপারটাকে জটিলতর করে তুলতেন। রঙ্গনার ঠিক মনোভাবটা জানবার সুযোগ উর্মিও হয়তো পেত না তখন।

ছাত্রীটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই উর্মি এসে ঢুকল।

"কি বললে রঙ্গনা? ঘরে খিল দিয়েছিল কেন?"

"ওর কোথায় আপনারা বিয়ের সম্বন্ধ করছেন তাতেই ও ক্ষেপে উঠেছে।"

"বিয়ে দিতে হলে' বিয়ের সম্বন্ধ করতেই হবে, তাতে আপত্তি করলে চলবে কেন? আর পণপ্রথাটা এখনও যখন চালু রয়েছে তখন সেটাকেও মানতে হবে।"

"ও সেটা মানতে চায় না।"

"তাহলে বিয়ে হবে না। ও কি বিয়েই করতে চায় না?"

উর্মি খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে বললে, "একটি ছেলের সঙ্গে যদি সম্বন্ধ করেন তাহলে ও রাজি হবে।"

"কে?"

"দিবসবাবু। যিনি আপনার কাছে সরোদ শেখেন—"

"ও, সে তো চমৎকার ছেলে! ওরা কি ব্রাহ্মণ?"

"হ্যাঁ।"

"সে তো চমৎকার হয়! কোথায় যেন চাকরি করে বলছিল। ওদের বাড়িটা কোথায়?"

"ঠিকানাটা আমি ঠিক জানি না, তবে জোগাড় করে' দিতে পারি।

আপনি আগে দিবসবাবুর কাছে কথাটা পেড়ে দেখুন, তিনি যদি রাজি হন আর সব খবর আমি যোগাড় করে' দেব।"

দিবসের খবর ঊর্মি অস্পষ্টভাবে জানত, কিন্তু এখন এর বেশি আর বলা সে সংগত মনে করলে না। দিবস যে খেয়ালের ঝোঁকে বাড়ি থেকে চলে' এসে যা-তা কি যেন করে' বেড়াচ্ছে (কিরণের কাছে আবছা আবছা শুনেছিল সে, কিন্তু নিজের ব্যাপার নিয়েই এত ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে যে পরের ব্যাপারে মাথা ঘামাবার অবসরই নেই তার) এ খবর শুনলে গহনচাঁদবাবু হয়তো ভড়কে যাবেন তাই সে সম্বন্ধে সে কোন উচ্চবাচ্যই করলে না। চুপ করে' রইল।

"বেশ তো, সে এলেই কথাটা আমি পাড়ব তার কাছে। চুনী, ও —"

চুনীলালের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন তিনি।

মেসে গোবর্ধনবাবুও ব্যগ্র হয়ে হরিদাসবাবুর পথ চাইছিলেন রোজ। হরিদাসবাবু 'টুর' থেকে ফেরেন নি। এদিকে উমেশ কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে ধূর্জটিবাবুর সংগীত-চর্চা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সাধারণ-ধৈর্য-বিশিষ্ট গোবর্ধন বেশ কাবু হয়ে পড়েছেন। অথচ ধূর্জটিকে কিছু বলা যায় না। তিনি নিজের বাড়িতে বসে' পত্নীশোক ভোলবার জন্য বেহালা এস্রাজ না বাজিয়ে যদি ক্যানেস্তারাও পিটতেন তাহলেও কারও কিছু বলবার থাকত না। গোবর্ধন আফিস থেকে ফিরে জলখাবার খেয়ে সরে' পড়েন আজকাল খবরের কাগজটি বগলে করে'। পার্কে বসে' পড়েন সেটি। অঘোর অধিকাংশ সময়ই মেসে থাকে না, নিজের ধান্দায় ঘুরে বেড়ায়, সুতরাং সে ততটা ঘায়েল হয় নি। রাত্রি দশটার পর সে যখন ফিরে আসে তখন ধূর্জটিও ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এই ভাবেই চলছিল। চলতও হয়তো আরও কিছুদিন।

কিন্তু একদিন বিকেলে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়াতে সব গোলমাল হয়ে গেল। বৃদ্ধ গোবর্ধন (গোবর্ধনের বয়স প্রায় ষাট, যদিও আফিসের খাতায় তিপ্পান্ন লেখান আছে) পার্কে ভিজে গেলেন আপাদমস্তক। কাশ্মীর সমস্যায় এমনই তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন তিনি যে আকাশের ঘনঘটা তাঁর নজরে পড়েনি। বৃদ্ধ বয়সে বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে গেল তাঁর। পরের দিন আফিসে গেলেন বটে কিন্তু পার্কে যেতে পারলেন না। ধূর্জটির কণ্ঠ-সংগীত এবং যন্ত্র-সংগীতের প্রবল বর্ষণ সহ্য করতে হল তাঁকে ঘরে বসে' বসে'। দৈবাৎ অঘোরও সেদিন বাসায় ছিলেন।

গোবর্ধন বললেন, "ওহে অঘোর, তুমি সেদিন সেই কোন্ এক ওস্তাদের খবর এনেছিলে, সেইখানেই নিয়ে যাওনা ওকে। আর তো পারা যায় না। ভেবেছিলুম হরিদাস এলে যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে, কিন্তু এ যে পাগল করে' তুলেছে!"

"বলে' দেখতে পারি, কিন্তু ও যাবে কি, সেই কাগজটা কোথায় ফেললুম।"

সৌভাগ্যক্রমে কাগজটা পাওয়া গেল। চুনীলালের ছাপানো সেই হ্যাণ্ডবিলটা।

"ও এই যে রয়েছে।"

"যাও যাও, বলে' দেখ একটু"—গোবর্ধনের কণ্ঠস্বরে সত্যিকারের আগ্রহ ফুটে উঠল—"তোমার তো লোক পটাবার ক্ষমতা আছে, ইনসিওরেন্সের দালালি কর যখন—যাও, কাগজটা নিয়েই যাও।"

"দেখি। হরিদাস বললে আরও ভাল হত।"

"তুমি দেখই না চেষ্টা করে'। যদি রাজি হয় কাল রবিবার আছে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারবে।"

অঘোর কাগজটা নিয়ে চলে গেলেন।

ধূর্জটিও বেশ দিশাহারা হয়েছিলেন। সেতার এস্রাজ ম্যাণ্ডোলিন

বেহালা এই চারটে যন্ত্রের কবলে পড়ে' তিনি যে যন্ত্রণা পাচ্ছিলেন তা বাইরে কারো কাছে প্রকাশ করা যায় না। তা ছাড়া তাঁর জেদ চড়ে' গিয়েছিল বলে' বাইরের লোকেরা ঠিক উল্টোটাই ভাবছিল। ভাবছিল ওই চারটে যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর বাগযন্ত্র মিলিয়ে এক নাগাড়ে বেসুরো চিৎকার করে' আনন্দই পাচ্ছেন বুঝি তিনি। আনন্দ তিনি পাচ্ছিলেন না। এ কসরৎ তিনি যদি পরিত্যাগ করতেন তাহলে অন্যায় কিছু হ'ত না। কিন্তু তা তিনি করেন নি, কারণ এই পথেই আনন্দ পাবেন বলে' তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এ যুগের অনেকেরই মতো তাঁরও ধারণা ছিল যে চেষ্টা করলে সবাই সব কিছু করতে পারে, বিশেষত টাকার জোর থাকে যদি। বারংবার ব্যর্থকাম হ'য়ে একজন ওস্তাদের কথা তিনিও ভাবছিলেন। অঘোরবাবু তাঁর ঘরে যখন ঢুকলেন তখন এস্রাজ বাজাচ্ছিলেন তিনি। অঘোর স্মিতমুখে এমন ভাব করে' দাঁড়িয়ে রইলেন যেন মুগ্ধ হয়ে গেছেন।

"কি দেখছেন কি?" বাজনা থামিয়ে মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন ধূর্জটি।

"ভাবছি আপনার যে রকম পার্টস্ আছে, আপনি যদি গহনচাঁদ বাবুর কাছে কিছুদিন শেখেন দিগ্বিজয় করতে পারবেন।"

"গহনচাঁদবাবুটি কে?"

"কাশী থেকে একজন বিখ্যাত ওস্তাদ এসেছেন। অনেককে শেখাচ্ছেন। নিতান্ত আনাড়িও নাকি মানুষ হয়ে যাচ্ছে তাঁর কাছে। আপনার মতো শিষ্য পেলে তো বর্তে যাবেন তিনি।"

"বেশ তো নিয়ে চলুন না আমাকে। কোথায় তিনি?"

"ঠিকানাটা আছে আমার কাছে। দাঁড়ান আনি।"

যদিও ঠিকানাটা তাঁর পকেটেই ছিল তবু তিনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। তখনই তখনই পকেট থেকে কাগজটা বার করলে ধূর্জটির হয়তো সন্দেহ হতে পারে এই আশঙ্কা হল তাঁর। একটু পরে ঘুরে

এসে কাগজটা তিনি ধুর্জটির হাতে দিলেন এবং বললেন, "গোবর্ধন বাবুও বলছেন খুব ভাল ওস্তাদ উনি, নাম আছে।"

"আলাপ আছে না কি আপনাদের সঙ্গে ?"

"না। আলাপ কি ক'রে হবে বলুন, আমরা তো ও পথের পথিক নই, তবে নাম ডাক শুনছি খুব।"

ধূর্জটি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বিজ্ঞাপনটি পড়লেন।

"বেশ চলুন। আপনাদেরও যেতে হবে সঙ্গে কিন্তু।"

"তাতে আর আপত্তি কি? কাল রবিবার আছে। গোবর্ধনবাবুর ছুটি, আমারও তেমন কোনও কাজ নেই, কালই যাওয়া যাক তাহলে।"

"বেশ।"

অঘোর এসে গোবর্ধনকে সুখবরটি দিলেন।

গোবর্ধন বললেন, "আমাকে আবার টানছ কেন? তুমি একাই নিয়ে যাও না।"

"চলুনই না, তাতে হয়েছে কি? আপনি একজন বিজ্ঞ লোক, আপনি সঙ্গে থাকলে ভরসা পাবেন ধূর্জটিবাবু।"

অঘোর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাস্য গোপন করলেন।

"দেখ, তোমরা, আজকালকার ছেলে ছোকরারা, বড্ড বেশি ডেঁপো হয়ে পড়েছ আর সেই জন্যেই ফেল মারছ সব কাজে।"

"ফেল মারছি মানে? গত মাসে নগদ একশ' পঁচিশ টাকা কামিয়েছি তা জানেন?"

"জানি জানি। হাড়ে হাড়ে চিনি তোমাদের।"

স্রোতস্বিনী দিক পরিবর্তন করেছিল আবার। দিবসের যে মন মাত্র কয়েক দিন আগে রঙ্গনাকে ঘিরে স্বপ্ন রচনা করছিল সে মন এখনও স্বপ্ন রচনা করছে, কিন্তু এখন আর রঙ্গনাকে ঘিরে নয়।

নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রির নব নব সম্ভাবনার স্বপ্নে আবার মেতে উঠেছে সে। যে অজানাকে জানবার আগ্রহ মানব সমাজকে চিরকাল দুর্গম পথে টেনে নিয়ে গেছে সেই অজানার রহস্যময় আহ্বান আবার উতলা ক'রে তুলেছে তাকে। বস্তুত অজানাকে জানবার কৌতূহলই তার জীবনের মূল সুর। সে নিজেও কথাটা ভাল ক'রে জানে না হয় তো। বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি তার আছে কি না, সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হতে হলে যে কষ্ট স্বীকার অনিবার্য তার সম্মুখীন হতে সে পারে কি না এই কৌতূহলই তাকে মেসের চাকরে পরিণত করেছিল। রঙ্গনার চরিত্র যতক্ষণ অজানা ছিল ততক্ষণই তা মুগ্ধ করেছিল তাকে। যেই তার মনে হল রঙ্গনা-চরিত্রে রহস্যময় আর কিছুই নেই—সে-ও শাড়ি-ব্লাউস-বিলাসিনী আর পাঁচজন মেয়ের মতো—তখনই তার মোহ কেটে গেল, তার সম্বন্ধে আর বিশেষ কোনও কৌতূহল রইল না। বাবাকে ছেড়ে এসে তার যে ধরণের দুঃখ হয়েছিল রঙ্গনার সম্বন্ধে মোহ-মুক্ত হয়েও তার সেই ধরণের একটা দুঃখ হচ্ছিল অবশ্য। রঙ্গনাকে তার যে আর ভাল লাগছিল না তা নয় কিন্তু তার মধ্যে অতি-প্রত্যাশিত সেই পুরাতনীকে আবিষ্কার করে' সে একটু হতাশ হয়ে পড়েছিল। সে রঙ্গনার মধ্যে প্রত্যাশা করেছিল অপ্রত্যাশিত এমন একটা কিছু যার বিস্ময় পুলকিত ক'রে তুলবে তার অন্তরতম সত্তাকে। কিন্তু তা হল না।

মনের মোড় ফিরে গিয়েছিল তার। সে ঠিক ক'রে ফেলেছিল নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি নিয়েই পড়াশোনা শুরু করবে আবার। মনে হচ্ছিল রোজ সন্ধ্যাবেলা সরোদ নিয়ে অত সময় নষ্ট করার অর্থ হয় না। গহনচাঁদবাবুর কাছে সপ্তাহে একদিন গেলেই যথেষ্ট। নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি বিষয়ক বইও সে জোগাড় ক'রে এনেছিল দু'একখানা। আনতেও দিয়েছে একটা দোকানে। বইগুলো শেলফে রাখতে গিয়ে

রঙ্গনার গতের খাতাটা চোখে পড়ল তার। সেই খাতাটা ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিল সে। রঙ্গনার কথাই ভাবছিল। রঙ্গনার বিয়ে দিতে গহনচাঁদবাবুর যথাসর্বস্ব বিকিয়ে যাচ্ছে সীতারাম-রমজানের মুখে এই সংবাদ শুনে লজ্জায় যেন মাথা কাটা যাচ্ছিল তার সেদিন। কন্যার বিবাহে বহু পিতা সর্বস্বান্ত হচ্ছে এ দেশে, কিন্তু কন্যাদের তরফ থেকে তেমন জোরালো কোন প্রতিবাদ তো শোনা যাচ্ছে না। বাপকে পথে বসিয়ে তারা তো বেশ হাসিমুখে বিয়ে ক'রে যাচ্ছে! সেই বহুকাল আগে স্নেহলতা পুড়ে মরেছিল, আরও হয়তো মরেছে কেউ কেউ···সহসা কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগল সে। সৌরেন ডাক্তারের অতসী ক্লিনিকের ছবিটা ফুটে উঠল চোখের সামনে। তারপর ফুটে উঠল দেশজোড়া একটা শ্মশানের ছবি···।

গহনচাঁদের বাড়িতে সে যখন পৌঁছল তার ঠিক একটু আগেই চুনীলাল 'তবে যা খুসি করুন' ব'লে রেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। দিবসের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করা হোক এতে চুনীলাল এত আপত্তি করছে কেন তা গহনচাঁদের মাথায় ঢুকছিল না। তিনি ভাবছিলেন মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে লোকে পাঁচ জায়গায় তো সম্বন্ধ করেই থাকে। বিকাশবাবুদের পাকা কথাও দেওয়া হয় নি তেমন কিছু। তাঁরা মেয়ে দেখতে আসছেন আসুন না। দিবসের কাছেও কথাটা পাড়া যাক। দিবস যদি রাজি হয় খোঁজ খবর নিয়ে ঠিক করা যাবে কে ভাল পাত্র। চুনীর এতে আপত্তি কেন? গহনচাঁদ ইলেকট্রিক গুডস্, অন্নদা বিশ্বাস এবং হরলাল সিংহির খবর জানতেন না।

দিবস যে সম্ভাব্য পাত্র হইতে পারে এ সংবাদে রমজান সীতারাম উল্লসিত হয়ে উঠেছিল খুব। তাদের মনে হচ্ছিল দিবসই এ সমস্যার সমাধান করে দেবে। দিবস যখন এল তখন অবশ্য তারা ছিল না কেউ। বাড়িতে তখন এক গহনচাঁদ ছাড়া আর কেউ ছিল না।

রঙ্গনাও না। গতরাত্রের ঘটনার পর থেকে রঙ্গনা বাড়ির সবাইকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সকালে উঠেই পড়ার ছুতো করে' এক সহপাঠিনীর বাড়ি গিয়ে বসেছিল। দুপুরে খেতে এসেছিল। একটি কথা বলে নি কারও সঙ্গে। খেয়ে উঠেই বেরিয়ে যাবার আর একটা ছুতো পেয়ে গেল। বিশ্বনাথ কথক তাঁর আত্মীয়ের মোটরে তাঁদের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের নিয়ে চিড়িয়াখানা দেখতে বেরিয়েছিলন। তিনি যাবার মুখে খোঁজ করতে এসেছিলেন রঙ্গনা যাবে কি না। রঙ্গনা এ সুযোগ ত্যাগ করে নি। সম্ভব হলে সে নিজের কাছ থেকেও পালিয়ে যেত।

দিবস আসতেই গহনচাঁদ হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা করলেন।

"ও, তুমি এসেছ, এস এস। কাল থেকেই তোমার কথা ভাবছি। এস বস, হাতে ওটা কি ?"

"রঙ্গনার সেই গতের খাতাটা ফিরিয়ে দিতে এসেছি।"

"ও, আচ্ছা। রঙ্গনা চিড়িয়াখানা দেখতে বেরিয়েছে, দাও আমিই রেখে দিই।"

খাতাটা নিয়ে টেবিলের উপর রেখে দিলেন।

"বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন।"

দিবস বসতে গহনচাঁদও বেশ বাগিয়ে বসলেন এবং বার দুই গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "আচ্ছা তোমরা ব্রাহ্মণ তো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"গোত্র কি তোমাদের ?"

"ভরদ্বাজ। আমাদের আসল উপাধি মুখোপাধ্যায়।"

গহনচাঁদের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"মুখোপাধ্যায়! আরে তাহলে তো আমাদের পালটি ঘরই !"

এর বেশি অগ্রসর হবার কিন্তু আর সুযোগ পেলেন না তিনি। কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই দ্বারপ্রান্তে ধূর্জটি গোবর্ধন আর অঘোর এসে

দাঁড়ালেন। ধূর্জটির এক হাতে বেহালা, আর এক হাতে স্যাণ্ডোলিন। গোবর্ধনের হাতে সেতার, অঘোরের হাতে এস্রাজ। দিবস উঠে দাঁড়াল। এঁদের এখানে আবির্ভাব সে প্রত্যাশাই করেনি।

"আরে, তুমি এখানে যে! গহনচাঁদবাবুর বাড়ি কি এইটেই?"—ধূর্জটি প্রশ্ন করলেন।

"ইনিই গহনচাঁদবাবু।"

দেখিয়ে দিয়ে দিবস বাইরে চলে গেল। কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল তার।

"নমস্কার, নমস্কার।"

নমস্কার বিনিময়ান্তে উপবেশন করলেন তিনজনই।

"দিবু এখানেও চাকরি করে না কি?"—গোবর্ধন প্রশ্ন করলেন।

"না, ও এখানে সরোদ শিখতে আসে।"

"সরোদ শিখতে আসে! বলেন কি!"

"এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?"—একটু বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করলেন গহনচাঁদ।

"আশ্চর্য হবার নেই? ও যে আমাদের মেসের চাকর মশাই।"

"চাকর? মানে? কি করে?

"ঘর ঝাড়ু দেয়, জুতো বুরুষ করে, ফাই ফরমাস খাটে।"

"বলেন কি! দিবস—"

দিবস বারান্দা থেকে নেমে চলে যাচ্ছিল, গহনচাঁদের ডাক শুনে ফিরে এল আবার।

"আমাকে কিছু বলছেন?"

"তুমি এঁদের মেসের চাকর?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাতো জানতাম না।"

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন গহনচাঁদ। দিবস মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেল আবার।

"আপনার ছোঁয়াচ লেগে এইটি হয়েছে"—ধূর্জটির দিকে চেয়ে গোবর্ধন মন্তব্য করলেন।

"খুব সম্ভব"—হেসে সমর্থন করলেন অঘোর।

"আপনারা কি প্রয়োজনে এসেছেন জানতে পারি কি ?"—গহনচাঁদ প্রশ্ন করলেন। হঠাৎ এ কি উৎপাত—মনে হচ্ছিল তাঁর।

"ইনি আপনার কাছে গান-বাজনা শিখতে চান"—ধূর্জটিকে দেখিয়ে গোবর্ধনই পাড়লেন কথাটা।

গহনচাঁদ কেমন যেন বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন এদের উপর।

"মাপ করবেন, আমার সময় নেই।"

"একটু সময় আপনাকে করতেই হবে"—কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করলেন গোবর্ধন।

"উনি কি শিখতে চান ? গান, না বাজনা ?"

"দুই-ই।"

"এই সব বাজনা ওঁর ?"

"সব।"

"সবগুলো উনি বাজাতে পারেন ?"

"চেষ্টা করেন। তবে সবগুলো সড়গড় হয় নি এখনও।"

একবার গোবর্ধন একবার অঘোর গহনচাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন।

"গানও করেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—ধরা গলায় ধূর্জটি উত্তর দিলেন এইবার।

"শুনিয়ে দিন না একটু"—গোবর্ধন বললেন।

ধূর্জটি বেহালার বাক্স খুলে বেহালা বার করতে লাগলেন। গহনচাঁদ

আর মানা করতে পারলেন না। ভদ্রতায় বাধল। গান ধরবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন তিনি এবং মিনিট খানেক পরেই বলতে বাধ্য হলেন—"থামুন, থামুন যথেষ্ট হয়েছে।"

তিনজনেই চাইলেন গহনচাঁদের দিকে।

গহনচাঁদ ধূর্জটিরর দিকে চেয়ে ভদ্রভাবেই বললেন, "গান বাজনা আপনার দ্বারা হবে না। এ পথ আপনার নয়। এ আপনি ছেড়ে দিন।"

গোবর্ধন বিজ্ঞ লোক। তাঁর মনে হল গহনচাঁদবাবু বোধহয় নিজের দর বাড়াচ্ছেন। কিছু না বলে' তিনি চুপ করে' রইলেন।

অঘোর মুচকি হেসে বললেন, "ছাড়তে উনি পারবেন না, অত্যন্ত আগ্রহ ওঁর।"

"আগ্রহ থাকলেই সব জিনিস কি সকলে শিখতে পারে?"

"আপনি শিখিয়ে দিন না, না হয় বেশি কিছু দেব আপনাকে"—ধূর্জটি বললেন একথা শুনে।

'এইবার ওষুধ পড়েছে'—মনে মনে বললেন গোবর্ধন—'এইবার ওস্তাদ ভিজবে। কিন্তু এত চট করে' বেশি টাকার কথাটা পাড়া ঠিক হয় নি'। সুতরাং ধূর্জটির ভুলটা সংশোধন করতে প্রবৃত্ত হলেন তিনি।

"দরকার হলে' বেশি টাকা আপনাকে উনি দেবেন। আপনাকে হোল টাইম রেখে দেবার সামর্থ্যও ওঁর আছে। তবে প্রথমটা দেখুন না চেষ্টা করে' এমনিতেই যদি হয়—"

যে বিরূপতাটা গহনচাঁদ ভদ্রতার আবরণে ঢাকছিলেন এতক্ষণ, সেটা সরে' গেল এবার। বেশ রাগত কণ্ঠেই তিনি বললেন, "আপনার কি ধারণা টাকা খরচ করলে গর্দভও বুলবুল হয়ে যেতে পারে?"—তারপর অর্ধ-স্বগতোক্তি করলেন—"যত সব গাড়োল জোটে এসে!"

গোবর্ধনের মাথায় ডাঙস্ মারলে কেউ যেন। তিনি অনেকদিন ধরে' আপিসের বড়বাবুগিরি করছেন, সবাই সমীহ করে' কথা বলে

তাঁর সঙ্গে, গহনচাঁদের কথায় ক্ষেপে গেলেন তিনি। উঠে পড়লেন এবং ধূর্জটির দিকে চেয়ে বললেন, "উঠুন মশাই। টাকা ফেললে কোলকাতা শহরে ওস্তাদ ঢের পাওয়া যাবে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। এঁরা বোধহয় ওই চাকর ক্লাসকেই শেখাতে পারেন, ভদ্রলোকের জায়গা এ নয়। উঠুন।"

ধূর্জটিও যথেষ্ট অপমানিত বোধ করছিলেন। তিনজনেই উঠে পড়লেন। অঘোর যাবার পূর্বে বক্রোক্তি করে' গেলেন—"কথাটা পাড়বার আগেই আমাদের ভাবা উচিত ছিল উনি দিবুর মাষ্টার।"

সবাই চলে গেলে গহনচাঁদ নির্বাক হয়ে বসে' রইলেন। মুহূর্তের মধ্যে একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল যেন। তিনি যেন সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। প্রত্যেক রসিককেই অনিবার্যভাবে কতকগুলো বেরসিকের সংস্পর্শে আসতে হয় সুতরাং ধূর্জটির দল তাঁকে তেমন বিচলিত করে নি। অর্থের আস্ফালনটাও এ যুগে গা-সওয়া হয়ে গেছে তাঁর। দিবসের খবরটা শুনেই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। দুটো কারণ ছিল। প্রথমত তিনি আশা করেছিলেন যে হয়তো দিবসের সঙ্গে রঙ্গনার বিয়েটা হয়ে যাবে এবং তা হয়ে গেলে তাঁর জীবনের মস্ত বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে একটা। রঙ্গনারই শুধু নয় তাঁরও দিবসকে খুবই ভাল লেগেছিল। চমৎকার ছেলে! কিন্তু একটা মেসের চাকরের সঙ্গে কি করে' মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়? দ্বিতীয় কারণটা তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল তা এই যে দিবসের মতো একজন সংগীত-রসিককে পেটের দায়ে ওই বেরসিকগুলোর দাসত্ব করতে হচ্ছে। এইটেই বেশি মর্ম্মান্তিক হয়েছিল তাঁর পক্ষে। ব্রাহ্মণের ছেলেকে দিয়ে জুতো বুরুষ করায় ওরা! এর থেকে দিবসকে কি করে' উদ্ধার করা যায় এই ভাবনায় উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠলেন তিনি। রঙ্গনার বিয়ের চেয়েও এটা বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে হ'তে লাগল তাঁর কাছে। দিবস যখন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে

তখন সে তো তাঁর পুত্র স্থানীয়। তার এমন সংকটের কথা শুনে চুপ করে' বসে থাকা তো উচিত নয়। খুব সঙ্কটেই সে পড়েছে তা না হলে ও রকম চাকরি নেয়? পরমুহূর্তেই তাঁর মনে হল রঙ্গনাকে সেতার কেনবার সময় ও টাকা দিয়েছিল, তাঁকে মাইনে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল, সেদিন অত দাম দিয়ে একটা আয়না কিনে এনেছে, অর্থ সংকট থাকলে এসব কি করে' করা সম্ভব! প্রশ্নটা মনে জাগবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটাও জাগল। দিলদরিয়া লোকের পক্ষে সবই সম্ভব। এই সব ব্যাপারে টাকা খরচ করতে গিয়েই হয়তো আরও নিঃস্ব হয়ে পড়েছে, বাধ্য হয়ে ওই জঘন্য চাকরি নিতে হয়েছে। নিমি, হরিশ্চন্দ্র, কর্ণ প্রভৃতি কয়েকটা নাম পর পর জেগে উঠল মনে। তারপর সহসা তাঁর মনে হল দিবস হয়তো বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

"দিবস—"

কোন সাড়া এল না। গহনচাঁদ উঠে বেরিয়ে দেখলেন দিবস চলে গেছে।

সূর্যকান্ত ভিতরে ভিতরে খুবই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। রোগীর অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে চিকিৎসক যেমন ভিতরে ভিতরে ভীত হয়ে পড়েন অথচ সে ভাবটা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারেন না, সূর্য চৌধুরির অবস্থা সেই রকম হয়েছিল অনেকটা। তার চেয়েও খারাপ হয়েছিল, কারণ চিকিৎসকের নৈর্ব্যক্তিক ভাবটা তাঁর ছিল না। দিবসের ঠিকানাটা এখনও পান নি তিনি। কিরণ আসে নি, কিরণকে ধরতেও পারেন নি আর। সেদিন নানা কথাবার্তায় আর একটা মস্ত ভুলও হয়ে গিয়েছিল। কিরণের বাসার ঠিকানাটা জেনে নেওয়া হয়নি। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটা আগেও যেমন অথৈ জলে ছিল, এখনও তেমনি আছে। গোবিন্দ সাণ্ডেল তাঁর এক

আত্মীয়ের বিয়েতে বাইরে গেছেন কয়েকদিনের জন্য। সুতরাং দিবসের আলোচনাটাও চাপা পড়ে গেছে। ব্রজও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে। আজকাল বকেও না। সমস্ত বাড়িটা কেমন যেন থম থম করছে। অসুখের ভান করে' পড়ে আছেন তিনি। ডাক্তার সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলে' গেছে। সুতরাং ঘণ্টু নিচে থেকেই মক্কেলদের বিদায় করে' দিচ্ছে। ঘণ্টু প্রাণপণে সেবাও করছে তাঁর। তার মনে যে আশার অঙ্কুর গজিয়েছিল তা বাড়ছিল ক্রমশঃ। শুধু তাই নয়, দিবসের প্রতি শ্রদ্ধাও কমে' আসছিল তার। দিবসের মতো ছেলের বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়াই উচিত এই ধরণের একটা ন্যায়সঙ্গত যুক্তিও মনে মনে খাড়া করেছিল সে। খাড়া করে অদ্ভুত ধরণের সুখও পাচ্ছিল।

…ঘণ্টু ডাক্তারবাবুর কাছে গেছে। একা চুপ করে' শুয়ে আছেন সূর্য চৌধুরি। দিবসের মায়ের কথাটা বার বার মনে পড়ছে। সেই কচি মুখখানা বার বার ভেসে উঠছে মানস পটে। তিনি কি দিবসকে বকে' অন্যায় করেছেন? ছেলেকে শাসন করা কি অন্যায়? দিবসের মতো বুদ্ধিমান ছেলে ওকালতি পাশ করে' এসে তাঁর জায়গায় বসুক এ ব্যবস্থাটা কি খুব খারাপ ব্যবস্থা হয়েছিল? তিনি তাঁকে আই-এস-সি পড়তে দিয়েছিলেন মেডিকেল কলেজে বা ইনজিনিয়ারিং লাইনে ঢোকাবেন বলে'। কিন্তু দিবস এত ভাল করে পাশ করল যে আর মেডিকেল কলেজে ঢুকতে চাইল না। তার কোন্ এক সাহেব প্রফেসার ওকে বুদ্ধি দিলেন যে তুমি এখন কোনও লাইনে যেও না, এম-এস-সি পর্যন্ত পড়ে' যাও। তিনি বাধা দেন নি। হঠাৎ সূর্যকান্তের চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল। নিচে ব্রজ আর নিস্তারিণী তুমুল ঝগড়া বাধিয়েছে। কান পেতে শুনলেন সূর্যকান্ত। কোন্ এক গিরিবালার কাছে যাবার জন্য ব্রজ নিস্তারিণীকে নাকি রিক্সা ভাড়া দিয়েছিল। কিন্তু নিস্তারিণী সে রিক্সা ভাড়াটি খরচ করে' ফেলেছে। ব্রজ

নিস্তারিণীকে রিক্সা ভাড়া কেন দিয়েছিল তা সূর্যকান্ত জানেন। তাঁর একবার ইচ্ছে হল ব্রজকে ডেকে বলেন যে নিস্তারিণী যদি পয়সাটা খরচ করে ফেলে থাকে আবার পয়সা দাও না ওকে, কিংবা না হয় মোটরটা নিয়েই যাক না। কিন্তু পারলেন না। ব্রজর কাছে খেলো হতে পারবেন না তিনি কিছুতে। পাশ ফিরে শুলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল একটা। ব্রজও তাহলে দিবুর ঠিকানা জোগাড় করতে পারে নি!

দিবসের যে ফ্যাকড়াটি গহনচাঁদ তুলেছিলেন তা ফেঁসে যাওয়াতে চুনীলাল নিশ্চিন্ত হয়েছিল। এই সব আর্টিস্ট জাতীয় লোকেদের নিয়ে সবাই কেন যে এমন উন্মত্ত হয়ে ওঠে তা চুনীলাল বুঝতে পারে না। তার তো ধারণা এ রকম অকেজো দায়িত্বজ্ঞানহীন সাংসারিক বুদ্ধি-বিবর্জিত লোকেদের পাগলা গারদে ডবল তালা মেরে রেখে দিলে সংসারের কিচ্ছু ক্ষতি হ'ত না, লাভই হ'ত বরং। আর একটু হলে সব পণ্ড করে দিয়েছিল! উফ্! খবরটা শুনে অবধি রঙ্গনা খুব গম্ভীর হয়ে গেছে যদিও—তা যাক্। দামী গয়না কাপড় পরে' বিকাশবাবুর মোটরে বার দুই চক্কোর মারলেই মুখে হাসি ফুটবে এখন। লভ টভ সব তখন তলিয়ে যাবে। কি হয়েছে আজকালকার মেয়েরা। ছ্যা ছ্যা! একটা সুন্দর চেহারা দেখলেই অমনি বাস—! আর ওই দিবস ছোকরাই বা কি রকম! তুই মেসের সামান্য চাকর একটা, তুই ভদ্রলোকের মেয়ের উপর নজর দিস! এবার বাড়িতে এলে কান ধরে দূর করে' দিতে হবে। সোহাগ করে' আয়না কিনে দেওয়া হয়েছে! রাসকেল কোথাকার! সমাজের অবস্থা দিন দিন হয়ে দাঁড়াল কি! তুই মেসের চাকর, তুই শিখবি সরোদ! উফ্।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে চুনীলাল রুমাল ঘোরাতে ঘোরাতে নিজেকে হাওয়া করছিল আর চিন্তা করছিল। কালকের ঘটনার পর থেকে বাড়িতে

সে বড় একটা থাকছে না। রঙ্গনার সঙ্গে মুখোমুখি হতে কেমন যেন একটা সংকোচ হচ্ছে। রঙ্গনা শুধু গম্ভীরই হয় নি একট' বিষাদের ছায়াও পড়েছে তার মুখে। কি আশ্চর্য! আবার বনবন করে' রুমাল ঘোরাতে লাগল চুনীলাল। এ সময় পদ্মমুখী থাকলে সুবিধা হত। পদ্মমুখীকে সে পাঠিয়েছিল মাণিকলালের কাছে, তার কাছে থেকে যদি কিছু টাকা বাগাতে পারে। পারবে কি না সন্দেহ, কারণ মাণিকলালও ঘুঘু একটি। পিসিমাকে এখনো টাকা পাঠানো হয় নি এ মাসে। ছিরু (তার মামাতো ভাইয়ের ছেলে) দেশে অসুখে পড়েছে, ছিরুর মা টাকা পাঠাতে লিখেছে কিছু। চুনীলালের নিজের যদিও ছেলে পিলে হয় নি, কিন্তু এই ধরণের খুচখাচ খরচ তার লেগেই আছে। রঙ্গনার সমস্ত খরচ সেই তো চালিয়েছে এতকাল! কর্পোরেশনের ট্যাক্সও বাকি পড়ে গেছে। ভাগ্যে বাবা বাড়িটা করে' গিয়েছিলেন তা না হলে কি দুর্দশাই যে হ'ত! ছিরুর মাকে টাকাটা আজ পাঠাতেই হবে। টাকা আছে কিছু, জামাইবাবুর ছাত্রছাত্রীদের মাইনে বাবদ কিছু টাকা জমেছে (মুদির বিলও জমেছে ওদিকে বেশ!) কিন্তু সে টাকাটা আছে রঙ্গনার কাছে। আজকে রঙ্গনার মুখোমুখি হওয়া অসম্ভব। আবার বনবন করে' রুমাল ঘোরাতে লাগল চুনীলাল। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সামনের গলি থেকে অন্নদা বিশ্বাস বেরুল। তার সাদা শুষ্ক মুখ শুষ্কতর হয়েছে মনে হল, গোঁফ যেন আরও ঝুলে পড়েছে।

"এই যে ভাই তোমার কাছে যাচ্ছিলাম। সর্বনাশ হয়ে গেছে—"

"তোমার সর্বনাশের কথা পরে শুনব। আগে আমার একটা কথার জবাব দাও। গোটা দশেক টাকা দিতে পার এক্ষুনি?"

বিস্ময়ে অন্নদা বিশ্বাসের ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেল। জিব দিয়ে শুষ্ক ওষ্ঠাধরকে ঈষৎ সরস করে নিয়ে সে বললে, "টাকা! টাকা তো নেই। আমার যথাসর্বস্ব তো তোমার কাছে আছে ভাই!"

"কালই দিয়ে দেব। আমার এক ভাইপো দেশে অসুখে পড়ে গেছে, আজই তাকে টাকাটা পাঠান দরকার। বাড়িতে টাকা আছে কিন্তু বার করবার উপায় নেই।"

"কেন?"

অসংকোচে মিথ্যে কথা বললে চুনীলাল।

"পরিবার চাবি নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। কাল ফিরবে। অথচ টাকাটা আজই পাঠাতে পারলে ভাল হয়। অসুখের ব্যাপার তো—"

অন্নদা বিশ্বাস চুপ করে রইল।

"এইবার তোমার সর্বনাশের ব্যাপারটা কি শুনি?"

"আমি যে পোস্টাফিস থেকে টাকা বার ক'রে ব্যবসাতে ঢেলেছি তা পরিবার টের পেয়ে গেছে ভাই। আমর ছোট শালাকে কথাটা প্রাইভেটলি বলেছিলুম, সে ফাঁস করে দিয়েছে সব।"

"তাতে আর কি হয়েছে? দিন পনেরো কুড়ির মধ্যে তোমার সব টাকা সুদ সুদ্ধ দিয়ে দেব। বিকাশবাবু দোকানের মালপত্র সব কিনে নেবেন কথা দিয়েছেন। বিয়েটা হয়ে গেলেই—"

"বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে না কি?"

"সেদিন তোমাকে বললাম যে।"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছিলে বটে। সেই রঙ্গনার সঙ্গেই? তুমিই ঘটকালি করলে না কি?"

চুনীলাল ঘাড় নেড়ে স্মিতমুখে চেয়ে রইল কেবল, কোনও কথা বললে না। রঙ্গনা যে তার নিজেরই ভাগ্নি এ কথা অন্নদার কাছে প্রকাশই করেনি সে।

"বাহাদুরি আছে বটে তোমার"—অন্নদার শুষ্কমুখে হাসি ফুটল একটু।

"দিন পনেরো পরেই টাকাটা পাব ঠিক তো ?"

"ঠিক"।

"দেখো ভাই। শুনে অবধি পরিবার তো কাক চিল বসতে দিচ্ছে না বাড়িতে। এমন মাথা খুঁড়েছে যে কপালের মাঝখানটা আবের মতো ফুলে উঠেছে।"

"একটা বাজে বোধহয়, নয় ? টাকাটা আজকে পঠোতে পারলে বড় ভাল হ'ত।"

"কালই দিয়ে দেবে তো ঠিক ? আমাদের আপিসের চাটুজ্যে মশাই মশারির কাপড় কিনবার জন্যে গোটা পঁচিশেক টাকা দিয়েছেন। তার থেকেই দশটা টাকা নাও, মশারির কাপড় পরশু কিনব না হয়।"

"দাও। এগারোটা টাকাই দাও। মনিঅর্ডার করতে তো কিছু লাগবে ? চল সঙ্গে সঙ্গে মনিঅর্ডার করেই দিই।"

"বেশ চল।"

দু'জনে পোস্টাফিস অভিমুখে রওনা হলেন। কিছুদূর গিয়েই মোড়ে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন অন্নদা বিশ্বাস।

"একটা সোডা দাও তো হে।"

"শুধু শুধু সোডা খাচ্ছ কেন ?"—ভ্রূকুঞ্চিত করে' প্রশ্ন করলেন চুনীলাল।

"শুধু শুধু নয়, পেটটা কেমন ঠোস মেরে আছে। আজকালকার তেল তো আর তেল নয়, বিষ।"

আসলে মাঝে মাঝে সোডা খাওয়া অন্নদা বিশ্বাসের একটি বিলাস। এই একটি মাত্র বিলাসই আছে তাঁর। কিন্তু সেটা যে বিলাস তা স্বীকার করতে লজ্জিত হন ভদ্রলোক। এমন কি নিজের কাছেও।

ফেনায়িত সোডার বোতলটা মুখে তুলে অন্নদা বিশ্বাস এমন একটা

মুখভাব করলেন যেন তিনি ওষুধ খাচ্ছেন, বাধ্য হয়ে যেন খেতে হচ্ছে। চুনীলাল ভ্রূকুঞ্চিত করে' তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

দিবস নিজেকে রঙ্গনার কাছে মেসের চাকর হিসেবেই পরিচিত করেছিল, প্রয়োজন হলে গহনচাঁদের কাছেও সে পরিচয় দিতে তার আপত্তি ছিল না, কিন্তু সে পরিচয় যখন দিতে হল তখন গ্লানিতে তার সমস্ত মন যেন ক্লেদাক্ত হয়ে উঠল। এই গ্লানিটার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না, নিজের এই দুর্বলতায় নিজের কাছেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল সে। তার বাহবা-লোলুপ মনোবৃত্তির গালে বিধাতা যেন একটা চপেটাঘাত ক'রে ব'লে দিলেন—তুই বড়লোকের ছেলে, তুই এম-এস-সি পাশ তা সত্ত্বেও তুই আদর্শের জন্যে সামান্য একটা চাকর হয়ে আছিস—এই সম্পূর্ণ খবরটা রঙ্গনা জানতে পেরেছিল বলেই তুই তার কাছে বক্তৃতার পেখম মেলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলি। তোর ইচ্ছেটা ছিল গহনচাঁদ বাবু ও সমস্ত খবরটা জেনে বাহবা দিয়ে উঠুন। কিন্তু তা হল না। তিনি ওর কুৎসিৎ অংশটুকুই জানতে পারলেন শুধু। এর জন্যে তোর যদি গ্লানি হয়ে থাকে বাড়ি ফিরে যা। লোককে তাক লাগিয়ে দেবার অনেক উপকরণ আছে সেখানে। আর একটা ঘটনাও হয়তো ঘটতে পারে, এখনই অত দমে যাচ্ছিস কেন? রঙ্গনার মুখে গহনচাঁদ বাবু হয়তো তোর উজ্জ্বল অংশটারও খবর পাবেন।

এই ধরণের আত্ম-বিশ্লেষণের পর এবং গহনচাঁদের "আরো তুমি তো তাহলে আমাদের পালটি ঘর" এই উক্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে' দিবস ঠিক করে' ফেললে গহনচাঁদের বাড়িতে আর সে যাবে না। আরও ঠিক করলে দ্বিগুণ উৎসাহে মেসের চাকরিটাকেই আঁকড়ে থাকতে হবে তাকে এখন কিছুদিন। নিছক মেসের চাকর হিসাবে লোকসমাজে নিজের পরিচয় দিতে যতদিন না সে গৌরব বোধ করছে ততদিন থাকতে

হবে। যে গ্লানি সে কিছুক্ষণ আগে অনুভব করেছে সে গ্লানির মূলোৎপাটন করে' তবে ছাড়বে। ছাত্রজীবনে এই ধরণের গোঁ তাকে ভর করত মাঝে মাঝে। এক একটা শক্ত অঙ্ক নিয়ে সমস্ত রাত কেটেছে তার। অঙ্কটা যত বেশি জটিল মনে হত জেদও ততই বাড়ত। মেসের কারও কাছে সে নিজের সত্য পরিচয় দেবে না তা-ও ঠিক করে' ফেললে। হরিদাসবাবু যদি ফিরে থাকেন তাহলে তাঁকে মানা করে' দিতে হবে।

তারপর দিন সকালে মেসে গিয়ে সে প্রথমেই নিশ্চিন্ত হল হরিদাস বাবু ফেরেন নি দেখে। পটলির স্বামীর অসুখের জন্য গিরি কয়েকদিন থেকে আসছে না (গিরির নিজেরও জ্বর হচ্ছে মাঝে মাঝে), গিরির কাজগুলো প্রথমেই সে করে' ফেললে। খান কয়েক বাসন মাজতে কতক্ষণই বা লাগে। সেদিন মনের বেগটা প্রবল ছিল বলে' আরও কম সময় লাগল। বাসনগুলো মেজে উনুনে আগুন দিয়ে দিলে সে। তারপর ঝাঁটাটা নিয়ে উপরে উঠল। উঠেই দেখা হয়ে গেল গোবর্ধনের সঙ্গে।

"আসুন, আসুন, ওস্তাদবাবু আসুন। সরোদ শেখা হল কাল? না, আমরা যাওয়াতে রসভঙ্গ হয়ে গেল?"

দিবস কিছু না বলে' ঘর ঝাড়ু দিতে লাগল মৃদু হেসে। উপহাসটা গায়ে মাখলে না।

"সত্যিই তুমি সরোদ বাজাও নাকি হে?"—প্রশ্ন করলেন অঘোর।

"আজ্ঞে হ্যাঁ বাজাই।"

"কালে কালে কতই যে দেখব!"

গোবর্ধনবাবু পাঁজি দেখছিলেন, পাঁজিরই পাতা ওলটাতে লাগলেন। দিবস মুখে মৃদু হাসিটুকু ফুটিয়ে রেখে ঘর ঝাড়ুই দিয়ে যেতে লাগল। মুখের এই হাসিটুকু ফুটিয়ে রাখতে (তার অর্থ, যেন কিছুই হয় নি) যে কি পরিমাণ শক্তি খরচ করতে হচ্ছিল তাঁদের ওই চাকরটিকে তা যদি

গোবর্ধনবাবু বুঝতে পারতেন! গোবর্ধন তাঁর মুখের হাসিটা লক্ষ্যও করছিলেন না তেমন, তিনি সম্পূর্ণ অন্য এক ব্যাপারে নিমগ্ন ছিলেন।

"এই দেখ অলাবু ভক্ষণ নিষেধ, বললুম আমি, এই দেখ"—অঘোরের সামনে পাঁজিটি তুলে ধরলেন তিনি —"তুমি তো এক দিগগজ লাউ কিনে আনলে।"

"কাল খাওয়া যাবে।"

"তাহলে তুমি বাজারে যেও। মাছের মাথা কিংবা চিংড়ি মাছ নিজে দেখে কিনে এনো, লাউ অমনি খাওয়া যায় না।"

"বেশ তাই যাব। এখন ধূর্জটিবাবুকে নিয়ে কি করা যায় বলুন তো? বড়ই দমে গেছেন ভদ্রলোক।"

"হরিদাস আসুক। ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। আজই হরিদাসের আসবার কথা।"

"মিত্তির মশাই আছেন না কি?"—নিচে থেকে হাঁক শোনা গেল একটা।

"সিংহির গলা না? দেখ তো।"

অঘোর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন এবং উঁকি মেরে দেখলেন।

"হ্যাঁ। মিত্তির মশাই আছেন, আসুন ওপরে।"

হরলাল সিংহি এসে যখন ঢুকলেন তখন দিবস তক্তাপোশের নিচে শরীরের খানিকটা ঢুকিয়ে দিয়ে কোণের দিকের ময়লাগুলো টেনে বার করছিল।

"এস এস"—অভ্যর্থনা করলেন গোবর্ধন—"শ্রীরামপুর থেকে আসছ?"

"হ্যাঁ।"

"খবর সব ভাল তো?"

"হ্যাঁ এদিকে ভালোই। কিন্তু সেই চুনীলালের খপ্পর থেকে এখনও উদ্ধার পাই নি ভাই।"

"কি হল?"

"শুনেছিলাম টাকাটা সে দিয়ে দিতে চায়। চিঠি লিখলাম, কোনও উত্তর নেই। তাই আমাদের উকিল সূর্যিবাবুর কাছে যাচ্ছি আর একবার। তিনি কয়েকটা সাক্ষী যোগাড় করতে বলেছিলেন—"

দিবস চৌকির তলা থেকে বেরিয়ে এল। হরলাল সিংহি আকাশ থেকে পড়লেন।

"আরে, দিবুবাবু যে! আপনি এখানে! এ কি!"

কোনও উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে গেল দিবস। এ ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। এ-ও সে নিমেষে বুঝতে পারলে যে মেসের চাকরিটিও ছাড়তে হবে, কারণ একটু পরেই বাবা এসে হাজির হবেন এখানে।

গোবর্ধন বিস্মিত হয়েছিলেন হরলালের ব্যবহারে।

"একে চেন না কি তুমি?"

"চিনি বই কি। সূর্যিবাবু উকিলের ছেলে।"

"বল কি! আমাদের মেসে চাকর হয়ে আছে ক'দিন থেকে।"

"সে কি! চাকর হয়ে আছে?"

হরলাল বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলেন।

অঘোর মন্তব্য করলেন, "আজকাল ভদ্দরলোকের ছেলেদের এই দুর্দশাই তো হবে। পড়াশোনার দিকে মন নেই তো কারও। আমার ছেলেটা তিন বছর ধরে ফোর্থ ক্লাসেই ডিগবাজি খাচ্ছে।"

"না, না দিবুবাবু সে রকম ছেলে নন। এম-এস-সি পাশ করে' ল' পড়ছিলেন। বাপের সঙ্গে তাহলে হয়েছে নিশ্চয় কিছু একটা। খবর নিতে হচ্ছে।"

গোবর্ধনের চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবার মতো হল।

তিনি কিছু বলবার আগেই হরলাল সিংহি দিবসের সঙ্গে কথা কইবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তার আগেই কিন্তু দিবস বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। দিবসকে দেখতে না পেয়ে হরলাল ঘরে ঢুকলেন আবার।

"এম-এস-সি পাশ করে' ল' পড়ছিল!"—গোবর্ধনের মুখে কথা সরল এতক্ষণে।

"হ্যাঁ, হীরের টুকরো ছেলে।"

গোবর্ধন এবং অঘোর দৃষ্টি বিনিময় করলেন। হরলাল সিংহি যদি সঙ্গে সঙ্গে স্থর্যকান্তকে খবর দিতে পারতেন তাহলে হয়তো দিবসের নাগাল পাওয়া সম্ভব হ'ত। কিন্তু তিনি ক্লান্ত ছিলেন। তিনি ভাবলেন একটু পরে যখন স্থর্য চৌধুরির ওখানে যাবেন তখনই ঘটনাটা বলবেন তাঁকে। তা ছাড়া তিনি আশা করছিলেন যে, দিবস যখন এইখানেই আছে তার মুখে ব্যাপারটা শোনা যাক প্রথমে। দিবস যে মেসে আর ফিরবে না ধারণা করতে পারেন নি তিনি।

দিবস রাস্তা ধরে' সোজা হাঁটতে লাগল। কয়েকদিন আগে রঙ্গনার যেমন মনে হয়েছিল তারও তেমনি মনে হ'তে লাগল একটা বেড়াজাল সহসা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে তার চারদিকে। যে দু'টি মুক্তির ক্ষেত্রে সে নিজেকে বিস্তার করছিল তা পর পর রুদ্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। গহনচাঁদের বাড়িতে আর যাওয়া যাবে না, ও মেসেও আর চাকরি করা যাবে না। হরলালবাবুর মুখে খবর পেয়ে বাবা দলবল নিয়ে এসে পড়বেন এইবার। সৌদামিনীর সংস্রবও হয়তো ত্যাগ করতে হবে। রঙ্গনা তার বাসার ঠিকানা জানে। বাবা যদি মেস থেকে গহনচাঁদবাবুর বাড়ি যান (যাবেনই) তাহলে সেখান থেকে তার বাসায় অনায়াসে আসতে পারবেন। তারপর শুরু হবে সেই মামুলি

তর্কাতর্কি, সেই কথা কাটাকাটি, ব্রজ হয়তো কাঁদবে, বাবা গুম হয়ে যাবেন, চিমটি কেটে কেটে কথা বলবেন গোবিন্দ সাণ্ডেল—এই সবের আবর্তে আবর্তিত হতে হতে শেষকালে আবার গিয়ে হয়তো ঠেকতে হবে তাকে ল' কলেজে। তার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। মনে পড়ল একটা বইয়ের দোকানে সে নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রির একটা বই কিনতে দিয়েছিল। বইটা দোকানে ছিল না। দোকানদার দবসের চেনা, (এর দোকান থেকেই দিবস বই কিনে বরাবর) বইটা খুঁজে আনিয়ে রাখবেন বলেছিলেন। হয়তো বইটা এসে গেছে। সোজা দোকানের উদ্দেশ্যেই চলতে লাগল সে। একটি কথাই বারবার মনে হতে লাগল—আত্মরক্ষা করতে হবে। যেমন করে' হোক দৈবের এই প্রতিকূলতাকে জয় করতে হবে। পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়াতে তার অন্তরের অন্তস্থল থেকে একটা ঘুমন্ত শক্তি জেগে উঠেছিল যেন, একটা অভিনব আনন্দও। শক্তি পরীক্ষা করবার আর একটা সুযোগ পেয়ে তার সমস্ত সত্তা যেন উন্মুখ হয়ে উঠেছিল নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্যে। না, কিছুতেই সে দমবে না, কিছুতেই না। নিজে যেচে না গিয়েও অকস্মাৎ বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাতে সে প্রথমটা খুশি হয়ে উঠেছিল একটু, কিন্তু এই দেখা হওয়ার পরিণাম ভাবতে গিয়েই তার মন বিদ্রোহ করে' উঠল। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল এই দুর্বলতার ভাঙন কোথায় গিয়ে থামবে। "না, দুর্বলতাকে কিছুতে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না"—এই কথা ভাবা সত্ত্বেও বাবার মুখটা কিন্তু মাঝে মাঝে ফুটে উঠতে লাগল মনে। বিশেষ করে' সেই ফোটার মুখটা, চোখের সেই প্রসন্ন দৃষ্টি, যার মধ্যে কোন নীচতা নেই।...রঞ্জনার মুখটাও...। একবার একথাও তার মনে হল যে রঞ্জনার চোখের দৃষ্টিতে দু' একবার চকিতে সে এমন আলো দেখেছে যার সঙ্গে তার আচরণের মিল নেই। তার

বাইরের আচরণটা কি তবে আবরণ শুধু? তার আসল সত্তাটার পরিচয়ই সে পায়নি হয়তো। ক্ষণিকের জন্য এই কথাটা মনে হল তার, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যই। দোকানে পৌঁছে সে সব ভুলে গেল। দোকানী বললেন, "বইটা আনতে একটি লোককে পাঠিয়েছি। এখনই সে এসে পড়বে। আপনি একটু অপেক্ষা করে যান।" দিবস দোকানের ভিতর ঢুকে এ বই সে বই উলটে উলটে দেখতে লাগল এবং ক্রমশ তন্ময় হয়ে গেল। হঠাৎ এক সময়ে সে ঠিক করে' ফেলল অন্তত কিছুদিনের জন্য তাকে কোলকাতার বাইরে চলে যেতে হবে। আজই। তা নাহলে বাবা ঠিক ধরে' ফেলবেন তাকে। কোলকাতার বাইরেই কোথাও গিয়ে সে রোজকার করে টাকা জমাবে। আজই এখনই চলে' যেতে হবে। টাকাকড়ি তার সঙ্গেই ছিল। দু'খানা কাপড় আর জামা দুটো বাসা থেকে নিয়ে আসতে পারলে ভাল হ'ত। তখনই মনে হ'ল বাবা যদি ইতিমধ্যে এসে থাকেন সেখানে! তা ছাড়া আর একটা কথাও মনে হল, যে ছেলেটিকে সে অঙ্ক পড়ায় তারও ব্যবস্থা করে' যেতে হবে একটা। অন্ততপক্ষে খবরটা দিতে হবে তাকে। এমন সময় তার বইটা এসে পড়ল। সাগ্রহে বইটার পাতা ওলটাতে লাগল সে। আবার তন্ময় হয়ে গেল। তারপর খেয়াল হল সেই ছেলেটিকে খবর দিতে হবে। নেবে পড়ল রাস্তায়। ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে দেখল এগারোটা বেজেছে। তারপর রাস্তার দিকে চেয়ে সে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখতে পেলে সৌদামিনীকে। সৌদামিনী এক রিক্‌শ করে' চলেছে।

"দিদি কোথা চলেচ?"

এক মুখ হেসে সৌদামিনী বললে, "কালিঘাটে পূজো দিতে গিয়েছিলাম, পটলি মানত করেছিল কি না। সরে' এস এদিকে।"

সরে' যেতেই পূজোর ফুল বেলপাতা দিবসের মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ে

সৌদামিনী বললে, "পেসাদ বাড়ি গিয়েই খেও। মনে করে' খেও যেন।"

"আমি এখন বাড়ি ফিরব না। আমাকে বাইরে যেতে হবে আজ"—হঠাৎ একটা কথা মনে হল দিবসের—"তুমি একটি উপকার করতে পারবে দিদি?"

"কি?"

"আমার কাপড় দুটো, গেঞ্জিটা, আর জামাটা আমার সেই ক্যাম্বিসের থলিতে পুরে এই বইয়ের দোকানে যদি পাঠিয়ে দিতে পার কারও হাত দিয়ে তাহলে আর অমাকে বাসায় যেতে হয় না।"

"তা না হয় দিতে পারি, কিন্তু যাওয়া হচ্ছে কোথা?"

"বর্ধমানে"—হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল দিবসের।

"হটাৎ বর্ধমান?"

"দরকার আছে একটু।"

"ফিরবে কবে?"

"তার ঠিক নেই।"

"তোমার মেসের কাজ কে করবে তাহলে?"

"মেসের কাজ ছেড়ে দিয়েছি। তুমি কাপড় জামা পাঠিয়ে দিও তাহলে—। এদের বলে দি।"

সৌদামিনীর কাছেও বেশিক্ষণ দাঁড়াতে সাহস হচ্ছিল না দিবসের। তাড়াতাড়ি সে তাই বইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ল আবার।

"একজন আমার একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ এখানে দিয়ে যাবে, রেখে দেবেন, আমি একটু পরে এসে নিয়ে যাব।"

"আচ্ছা।"

দোকান থেকে নেমে সৌদামিনীর দিকে চেয়ে দিবস বললে—"আচ্ছা, চলি তাহলে।"

"শোন। পেসাদটুকু খেয়ে যাও।"

রাস্তায় দাঁড়িয়ে আধখানা প্যাঁড়া এবং একটা বাতাসা দিবসকে খেতে হল।

রঙ্গনা বাড়িতে একা ছিল। নিজের সেই কোণের ঘরটিতে বসে ছিল সে। একাগ্র হয়ে প্রতীক্ষা করছিল গহনচাঁদবাবু কি খবর নিয়ে আসেন। গহনচাঁদবাবু চুনীলালকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। রঙ্গনাকে বলে' গিয়েছিলেন বিকাশবাবুর জ্যাঠার কাছে বলতে যাচ্ছেন যে তাঁরা এখন মেয়ে দেখতে যেন না আসেন। চুনীলাল অন্য দিকে চেয়েছিল, কিছুই বলে নি। মৌন সম্মতির লক্ষণ এই প্রবাদ বাক্যানুসারে চুনীলালের তাতে সায় ছিল একথা যদি কেউ মনে করেন তাহলে তাঁরা চুনীলালদের চেনেন না। সে কোনও রকমে বিনা ঝামেলায় রঙ্গনার সান্নিধ্যটা এড়াতে চাইছিল। রাস্তায় বেরিয়েই সে গহনচাঁদকে বললে, "আপনি কি সত্যিই ওদের মানা করতে যাচ্ছেন না কি?"

"রঙ্গনা যখন অত আপত্তি করছে তখন তা করা ছাড়া উপায় কি?"

"রঙ্গনার বিয়ে দিতেই হবে একদিন। এমন সৎপাত্র হাতছাড়া হয়ে গেলে কিন্তু পরে পস্তাতে হবে।"

"কি করতে বল তুমি আমাকে তাহলে—"

গহনচাঁদ অসহায়ভাবে চাইলেন চুনীলালের দিকে।

"ওরা যেমন মেয়ে দেখতে আসছে আসুক। বরং ব্যাপারটা ওরা যাতে তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলে সেই কথাই বলি গে চলুন ওদের। তারপর রঙ্গনাকে বোঝান যাবে। আজ টেলিগ্রাফ করে' দিচ্ছি—পদ্ম চলে' আসুক। মামীকে খুব ভালবাসে রঙ্গনা। পদ্ম বুঝিয়ে বললে সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষই বোঝাতে পারে, ও আপনার আমার কর্ম নয়।"

কথাটা গহনচাঁদের যুক্তিযুক্ত মনে হল।

রঙ্গনা কিন্তু কোণের ঘরটিতে বসে' প্রতীক্ষা করছিল। শুধু গহনচাঁদ কি খবর আনেন তার জন্যেই নয় দিবসেরও একটা খবর সে প্রত্যাশা করছিল। দিবসের প্রকৃত পরিচয় সে গহনচাঁদকে বলে নি। তার মনের খবরটা ভাবে-ভঙ্গিতে উর্মির কাছে প্রকাশ হয়ে পড়াতেই লজ্জায় মাথা কাটা গেছে তার। উর্মি কথাটা বাবার কাছে প্রকাশ করে' দিয়েছে, বাবা দিবসবাবুর কাছে বিয়ের প্রস্তাবও করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ওই মেসের ভদ্রলোকেরা এসে পড়াতে সব গোলমাল হয়ে গেল এ সমস্ত খবরই সে তার বাবার কাছ থেকে শুনেছে। দিবস যে মেসের সামান্য একটা চাকর মাত্র এই বিস্ময়কর খবরটাও গহনচাঁদ সাড়ম্বরে বলেছেন রঙ্গনাকে। তবু রঙ্গনা চুপ করে ছিল, দিবসের প্রকৃত পরিচয় দেয় নি। দিবসের প্রকৃত পরিচয়টা উদ্‌ঘাটন করে' তার হয়ে ওকালতি করতে শুধু যে তার লজ্জা করছিল তা নয়, আত্মপ্রশংসা করতে যে ধরণের একটা সংকোচ হয় সেই রকম একটা সংকোচও হচ্ছিল। সত্যবান রাজার ছেলে—এইটেকে বড় করে' তোলার মধ্যে কেমন যেন একটা ইতরোমি আছে এ কথাও মনে হচ্ছিল তার। তাই সে চুপ করে ছিল। দিবসের বিষয়ে একটি কথাও বলেনি কাউকে। কিন্তু সে প্রতীক্ষা করছিল। কিরণের লেখা গানের লাইনগুলো স্বপ্ন সৃজন করছিল তার মনে—

আঁধার রজনী শেষে
আলোক উজল বেশে
আসিবে সে আসিবে সে
আসিবে সে
জানি আমি জানি আমি জানি গো।

হঠাৎ বাড়ির সামনে মোটর এসে দাঁড়াল একটা। জানলাটা ঈষৎ ফাঁক করে' সূর্য চৌধুরিকেই দেখতে পেল সে প্রথমে। দেখেই চিনতে

পারল। তাঁর ফোটোটা সে দিবসের বাসায় দেখেছিল। সহসা কেমন যেন শঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। নিমেষের মধ্যে সে বুঝতে পেরে গেল দিবসের সন্ধানেই এসেছেন উনি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল দিবসকে উনি যদি ধরে' নিয়ে যান, তাহলে দিবস হয়তো চিরদিনের জন্য তার নাগালের বাইরে চলে' যাবে। খোলার-ঘর-বাসী দিবস তার কাছে সুলভ, কিন্তু প্রাসাদ-বাসী সূর্য চৌধুরির একমাত্র পুত্র দিবস আকাশের চাঁদের চেয়েও দুর্লভ তার কাছে। সূর্য চৌধুরির ঠিকানাও জানা নেই রঙ্গনার। দিবস যদি বাবার কাছে ফিরে যায় তাহলে…।

সূর্য চৌধুরি ছাড়া মোটরে অঘোর এবং হরলাল ছিলেন।

হরলাল নেবে এসে দুয়ারের কড়া নাড়তে লাগলেন। রঙ্গনা বেরিয়ে এল।

"কাকে খুঁজছেন ?"

"দিবসবাবু এখানে সরোদ শিখতে আসেন ?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি কোথায় থাকেন বলতে পারেন ?"

"তাতো জানি না।"

"গহনচাঁদবাবু কোথা ?"

"তিনি বেরিয়েছেন একটু। তিনিও দিবসবাবুর ঠিকানা জানেন না।"

"ও।"

"দিবসবাবু কখন আসেন সাধারণতঃ ?"

"তার ঠিক নেই।"

"-এলে বলে' দেবেন যে তাঁর বাবা তাঁকে নিতে এসেছিলেন। তিনি যেন আজই দেখা করেন তাঁর সঙ্গে।"

"আচ্ছা, আসেন তো বলে' দেব।"

সূর্য চৌধুরির মোটর চলে গেল। নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রঞ্জনা। হঠাৎ যেন তার মনে হল দিবস আর আসবে না। কেন মনে হল তা যদিও সে বলতে পারত না কিন্তু তার মনে হল। দিবস যে ক'দিন থেকে তার সম্বন্ধে একটু উদাসীন হয়ে পড়েছে একথা সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করছিল, কিন্তু মানতে চাইছিল না। সেই অনুভূতিটা এখন যেন কানে কানে তাকে বলে গেল—দিবস আর আসবে না।

দিবসের কিন্তু বর্ধমান যাওয়া হল না। বইয়ের দোকানে সৌদামিনী যে ক্যাম্বিসের ব্যাগটা বসন্তর মারফত পাঠিয়ে দিয়েছিল সেটা যদি সে আগে খুলে দেখত তাহলে হাওড়া পর্যন্ত যাবারও দরকার হত না। বর্ধমানের নামটা যখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল তখন বর্ধমানে যাওয়াই স্থির করেছিল সে। স্টেশনে গিয়ে সে খোঁজ করল বর্ধমানের গাড়ি কখন। দেরি আছে শুনে স্টেশনে ঘোরা ফেরা করল খানিকক্ষণ। হুইলারের দোকানে বই ওলটাল মিনিট পনের ধরে'। এই সময়ে তার সঙ্গে দেখা হলে গেল মহেন্দ্র কুণ্ডুর।

"আরে, আপনি এখানে! আমি যে আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। কোথায় চলেছেন আপনি?"

"বর্ধমান যাব।"

"হাঁসটা ভাল আছে?"

"হ্যাঁ।"

"ওটাকে এসে নিয়ে যাব এবার একদিন। বাসা পেয়েছি একটা।"

"বেশ তো।"

"আসুন।"

সিগারেটের বাক্সটা দিবসের সামনে খুলে ধরলেন কুণ্ডু মশায়।

"আমি তো সিগারেট খাই না।"

"ও।"

কুণ্ডু মশায়ের মুখটা ছুঁচলো হ'ল একটু। তারপর নিজেই একটি সিগারেট নিয়ে ধরালেন সেটি। ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দিবসের দিকে চেয়ে বললেন, "আচ্ছা চলি তবে। এসে হাঁসটা নিয়ে যাব একদিন। আপনি কখন বাড়িতে থাকেন?"

"আমি? প্রায়ই থাকি না। আমি না থাকলেও নিয়ে যাবেন, আপনারই তো হাঁস।"

"বেশ বেশ।"

মহেন্দ্র কুণ্ডু চলে গেলেন।

হুইলারের দোকানে মনোমত কোন বই না পেয়ে দিবস ঠিক করলে এখনই যে বইটা কিনেছে সেইটেই ওলটান যাক ওয়েটিং রুমে বসে' বসে'। বইটা সে ক্যাম্বিসের ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিল। ওয়েটিং রুমে গিয়ে ক্যাম্বিসের ব্যাগ থেকে বইটা বার করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল খামের একখানা চিঠি। চিঠিটা সকালের ডাকে তার বাসায় এসেছিল। সৌদামিনী সেটা তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। কার চিঠি? চেনা হাতের লেখা। লণ্ডনের ছাপ রয়েছে। চিঠিখানা খুলে দিবস অবাক হয়ে গেল। তার জীবনের গতিটাই বদলে গেল যেন হঠাৎ। কল্পনায় যে রঙে সে নিজের ভবিষ্যতের ছবি এঁকেছিল তার চেয়ে শত সহস্রগুণ উজ্জ্বল বর্ণে মহিমান্বিত হয়ে উঠল যেন সে ছবি।

দিবসের চিঠির উত্তরে তার সেই সাহেব প্রফেসার যা লিখেছেন তার বাংলা অনুবাদ এই—

প্রিয় চৌধুরি,

তোমার চিঠি পেয়ে যুগপৎ আনন্দিত ও দুঃখিত হলাম। আমাকে এখনও মনে রেখেছ জেনে আনন্দ পেলাম, কিন্তু তুমি তোমার বাঞ্ছিত পথে চলতে পাওনি শুনে দুঃখ হচ্ছে। তমি যে পরিকল্পনা অনুসারে

কাজ করতে চাইছ তা অভিনব বটে। তবে তার সাফল্য বা অসাফল্য সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না এখন। আমি এখানে একটা ল্যাবরেটারির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছি, তুমি যদি কোনক্রমে এখানে এসে পড়তে পার, তাহলে তোমাকে তোমার গবেষণার পথে চলতে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারব। এখানে থাকার এবং খাওয়ার খরচ অবশ্য তোমাকে নিজেকে উপার্জন করতে হবে। উপার্জনের পথে বাধা বিস্তর, কিন্তু তোমার কাজ করবার শক্তি ও ইচ্ছা যদি প্রবল এবং খাঁটি হয় তাহলে জুটে যাবেই কিছু একটা। উদ্যমশীল মানুষকে কোন বাধাই নিরস্ত করতে পারে না। তুমি যদি এখানে আসতে চাও বেশি দেরি কোরো না, কারণ যে সুযোগ তোমাকে দিতে পারব ভাবছি দেরি করে' ফেললে তা হয়তো পারব না।

আশা করি কুশল সব। আমার স্নেহ গ্রহণ কর। ইতি—

চিঠিটা পড়বার পরমুহূর্তেই তার মনে হল হরিদাসবাবুর কথা। তিনি প্রয়োজন হ'লে অর্থ সাহায্য করবেন বলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বেরিয়ে পড়ল সে।

নিজের বাসার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার ভয় হতে লাগল গিয়ে যদি দেখে বাবা বসে আছেন! বসন্তকে দেখতে পেলে হঠাৎ। বসন্তও তাকে দেখে এগিয়ে এল।

"আপনি বর্ধমান যান নি?"

"না। আমাকে খুঁজতে এসেছিল কেউ?"

"না তো।"

"দিদি কোথায়?"

"বাসাতেই আছে।"

"গিরি এ বেলা কাজে গেছে কি?"

"যায় নি, কিন্তু যাবে বলছিল, ওই যে আসছে।"

গিরিও বেরিয়ে এল।

"তুমি মেসে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। আজ যাবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আপনি চলে গেছেন শুনে যাচ্ছিলাম। কেউ না গেলে বাবুদের যে কষ্ট হবে। ঠাকুরটি যা শ্রীমন্ত!"

"চল আমিও যাই।"

"আপনি বর্ধমান যাননি?"

"না। শোন একটা কাজ করতে হবে তোমাকে।"

"কি?"

"আমি আর মেসে ঢুকব না। আমার আসল পরিচয় জেনে ফেলেছেন সবাই। তবে হরিদাসবাবু যদি ফিরে থাকেন তাঁকে আড়ালে ডেকে একটু বল যে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই একবার বিশেষ দরকারে। আমি মেসের পাশের গলিটাতে অপেক্ষা করব তাঁর জন্যে। গোপনে ডেকে বোলো কিন্তু, জানাজানি না হয়ে যায় যেন।"

"আচ্ছা।"

মেসের কাছাকাছি এসে সৌভাগ্যক্রমে হরিদাসবাবুর সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল। তিনি খানিক্ষণ আগে টুর থেকে ফিরে স্নানাহার সেরে আপিসের দিকেই যাচ্ছিলেন।

গিরি মেসে ঢুকে পড়ল।

হরিদাসবাবু দিবসের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "সব জানাজানি হয়ে গেছে দেখছি। এখন কি করবেন?"

"আপনি যদি সাহায্য করেন একটু লম্বা পাড়ি দেব।"

"কি রকম?"

সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করে প্রফেসারের চিঠিটা হরিদাস

বাবুকে দিবস দেখালে। তারপর বললে—"আপনি যদি টাকা দেন তাহলে—"

দিবসের কথা শেষ করতে না দিয়ে হরিদাসবাবু বললেন, "চলুন এখনই দিচ্ছি। ক'টা বেজেছে?"

"একটা বোধহয়।"

"চলুন তাহলে সোজা পোস্টাফিসের দিকেই যাওয়া যাক।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সে দিন সন্ধ্যার পর দিবস গড়ের মাঠে ঘূড়ে বেড়াচ্ছিল একা। সে আনন্দে যেন বুঁদ হয়ে গিয়েছিল। আনন্দের নেশায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মাতালের মতো। কোন এক অদৃশ্য বিধাতার কথা মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল তার অস্পষ্টভাবে। মনে হচ্ছিল তার হাতে বোধ হয় ইলেকট্রিক সুইচের মতো কিছু একটা আছে। ইচ্ছা মতো আলো বা অন্ধকার করে' দিতে পারেন মুহূর্তের মধ্যে। আলোর রঙও বদলে দিতে পারেন খুশি মতো। খানিকক্ষণ আগেই হতাশার অন্ধকার নেমে এসেছিল চারিদিকে, এখন আবার কি চমৎকার হয়ে গেল। হরিদাসবাবু সমস্ত টাকাটাই দিয়ে দিয়েছেন তাকে। একটা রসিদ পর্যন্ত নিতে চাচ্ছিলেন না। দিবস জোর করে' একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়েছে। কি অদ্ভুত ভদ্রলোক। টাকার প্রতি কোন মমতাই নেই। অথচ তা নিয়ে কোনও আস্ফালনও নেই। অনাড়ম্বর আবরণের তলায় কত মহত্বই যে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে তা আমরা দেখতে পাই না। পরমাণুর মধ্যে যে এত সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল তাই বা কে জানত এতদিন? সহসা একটা কথা মনে হওয়াতে অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইল সে। তার মনে হল প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যেই যেমন বিরাট শক্তি নিহিত আছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেও তেমনি হয়তো নিহিত আছে বিরাট মহত্ব। আমরা প্রত্যেকেই হয়তো হরিদাস বাবু। একটা বিশেষ প্রেরণার সংঘাতে হরিদাসবাবুর মহত্ব প্রকট হয়েছে, অন্য রকম প্রেরণার সংঘাতে আর একজনের মহত্ব হয়তো তেমনি উদ্ঘাটিত হবে। নুণ জলের সংস্পর্শে গলে, শোনা গলে অ্যাকোয়া রিজিয়াতে, কিংবা আগুনের তাপে সোহাগার স্পর্শে।

সব জিনিসই গলে, সব জিনিসই বাষ্প হয়। সব মানুষও তেমনি হয়তো মহত্ত্বে বিকশিত হতে পারে···হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ল। বিলেত চলে' যাওয়ার আগে বাবার সঙ্গে দেখা করে গেলে কেমন হয়? কিন্তু যদি তিনি বাধা দেন। অসম্ভব নয়। গোবিন্দ সাণ্ডেলের মুখটা মনে পড়ল। মনে পড়ল ব্রজকে। এরা বাধা দেবেই। তাছাড়া সে তো নিজের পায়ে দাঁড়ায় নি এখনও। নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে সে ফিরবে না বাড়িতে। নিজের পৌরুষের অমর্যদা সে করবে না। জোর গলায় যে কথাটা সে প্রচার করেছে তা রাখতেই হবে। বিলেতে পৌছে বাবাকে একটা খবর দিলেই হবে। আবার সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আলোকোজ্জল চৌরঙ্গিটা ইন্দ্রপুরীর মতো মনে হতে লাগল দূর থেকে। মনে হ'ল মাটির পৃথিবীতে অন্ধকার রাত্রে এই ইন্দ্রপুরী সম্ভব হয়েছে মানুষের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে। নির্ণিমেষে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সে। মনে হল মানব-মনীষার জয়যাত্রার মিছিলে সেও চলেছে।

······ইচ্ছে করেই বেশি রাত্রে বাড়ি ফিরল। বাবা যদি ইতিমধ্যে খোঁজ নিতে এসে থাকেন রাত্রি বারোটা পর্যন্ত বসে' থাকবেন না নিশ্চয়। ঘরের সামনে এসেই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। ঘরের কপাট খোলা কেন? সৌদামিনীর কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে, সেই শুয়েছে নাকি এসে? বাবা অপেক্ষা করছেন না কি! নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে ক্ষণকাল। তারপর ঘরে ঢুকল। ঢুকে যা দেখল তা সে প্রত্যাশা করেনি, কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল প্রত্যাশা করেছিল, অতি সংগোপনে অন্তরের অন্তস্থলে! খাটের উপর রঙ্গনা বসে' আছে।

"এ কি, তুমি হঠাৎ এ সময়ে?"

"অনেকক্ষণ থেকে বসে আছি। চারটে থেকে।"

"কেন?"

"পালিয়ে এসেছি বাড়ি থেকে। আমাকে দেখতে এসেছিল আজ একদল লোক। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে' আমার বিয়ে দেবে মনে করেছে ওরা। চলে এসেছি তাই।"

আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল দিবসের সর্বাঙ্গ।

"বেশ করেছ। চারটে থেকে বসে আছ? খেয়েছ কিছু?"

"না। খিদে নেই।"

দিবসের মুখ হস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"খাবার আছে আমার। মোহন ঠাকুর দিয়ে যায় নি বুঝি এখনও? দেখি—"

"দিয়ে গেছে, ওই যে কোণে রেখে দিয়েছি ঢাকা দিয়ে।"

"ওইটেই দু'জনে ভাগ করে' খাওয়া যাবে। ব্যাপারটা সব খুলে বল দিকি। আমার কাছে এলে যে হঠাৎ? আমি কি করতে পারি?"

রঙ্গনা মুচকি হেসে বললে, "তা আপনি জানেন। বিপন্ন নারীকে উদ্ধার করতে আপনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন বলেছিলেন একদিন। সেই ভরসাতেই এসেছি।"

"বলেছিলাম না কি?"

"বলেন নি? সেই যে হাওড়া স্টেশনে!"

দিবসের মনে পড়ল। কিন্তু সে একটু বিব্রত হল। সত্যিই তো কি করতে পারে সে এ অবস্থায়!

"আপনাকে অসুবিধায় ফেলতে চাই না তা বলে'। আমাকে আশ্রয় দিতে বা সাহায্য করতে যদি না পারেন এখনই আমি চলে যাচ্ছি।"

"না, না, চলে যাবে কেন? কি করে' তোমায় সাহায্য করতে পারি তাই ভাবছি। আচ্ছা, এস আগে খেয়ে তো নেওয়া যাক।"

"সত্যি খেতে ইচ্ছে নেই আমার একটুও। তার চেয়ে বরং

শোওয়ার ব্যবস্থা করুন একটা। সোদামিনার ঘরে জায়গা হবে না একটু ?"

"সৌদামিনীর ঘরে কেন ? এইখানেই শোও না। তুমি খাটে শোও, আমি মেঝেতে সতরঞ্চিটা পেতে শুচ্ছি। চেষ্টা করলে একটা খাটিয়া পাওয়া যাবে হয়তো। তার দরকার নেই।"

"এক ঘরে শোব বলছেন ? সেটা কি ভাল দেখাবে ?"

"তুমি যে এমন ভাবে পালিয়ে এসেছ সেটাই কি ভাল দেখাচ্ছে ? কুসংস্কার যখন ভাঙবে ঠিক করেছ তখন ওসব নিয়ে আবার খুঁতখুঁত করছ কেন ? এক সঙ্গে ঘরে শুলে সত্যিই তো আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। আমাদের কারও মনে যখন কোনও পাপ নেই তখন লোকে কি বলবে এই ভেবে—"

"বেশ, বেশ তাই শোব, আপনাকে আর বক্তৃতা করতে হবে না।"

ছদ্ম কোপের ঝলকে অপরূপ হয়ে উঠল তার চোখ দু'টি।

"সৌদামিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?"

"হয়েছিল। সেই তো চাবি খুলে দিয়ে আমাকে অপেক্ষা করতে বললে। সৌদামিনী কিন্তু হাসপাতালে গেছে পটলিকে কালীঘাটের প্রসাদ দিতে। বলে গেল আজ হয়তো ফিরবে না।"

"গিরি এসেছিল ?"

"না। সে-ও সেখানে যাবে।"

"ও, আচ্ছা বেশ। এস খাওয়া যাক তাহলে।"

"সত্যি বলছি খিদে নেই।"

"আমার আরও নেই। আমি একটা চায়ের দোকানে পেট ভরে' খেয়েছি একটু আগে। তুমিই বরং সবটা খাও।"

"কি যে এক জিদি লোক আপনি। বলছি খিদে নেই—"

খুব ভোরে রুদ্ধ দ্বারে টোকা পড়ল।

দিবস ঘরের একপ্রান্তে মেজেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, তার ঘুম ভাঙল না। রঙ্গনা কিন্তু উঠে বসল ধড়মড় করে'। সে দিবসের খাটেই শুয়েছিল। আর একবার টোকা পড়তেই সে উঠে গিয়ে কপাট খুলে দিলে। তাকে দেখেই কিরণ সবিস্ময়ে পিছিয়ে গেল একটু। রঙ্গনা বারান্দায় বেরিয়ে এল।

"আপনি এখানে?"

সহসা এ প্রশ্নের উত্তরে রঙ্গনা কিছু বলতে পারল না। তার কানের পাশটা লাল হয়ে উঠল। মুখে ফুটে উঠল অপ্রতিভ হাসি।

"দিবস কোথা?"

"ঘুমুচ্ছেন। ডেকে দেব কি?"

"না থাক! পরে আসব এখন।"

কিরণ আর দাঁড়াল না, চলে গেল। সে অপমানিত বোধ করছিল। তার মনে হচ্ছিল দিবস তাকে প্রতারণা করেছে। সমস্ত নারীজাতির প্রতি সে কেমন যেন বিরূপ হয়ে উঠল সহসা। সোজা চলে গেল সূর্য চৌধুরির বাড়িতে। সূর্য চৌধুরিকে অবশ্য রঙ্গনার কথা বললে না কিছু। দিবসের ঠিকানাটা দিয়ে চলে এল কেবল। হাঁটতে হাঁটতে কেবলি তার মনে হতে লাগল, ঠিকানাটা আরও আগে দিয়ে আসা উচিত ছিল। তার মনে হচ্ছিল সে যেন সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। দিবসের চরিত্রে অবিশ্বাস করতে হবে এ কথা তো সে স্বপ্নেও ভাবে নি। দিবসের সঙ্গে কয়েকদিন দেখা হয় নি, তাকে ধরবে বলে তাই খুব ভোরেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। কিন্তু এসে একি দেখলে সে! একসঙ্গে বাস করছে! কই ঊর্মি তো কিছু বলে নি। হঠাৎ মনে পড়ল ঊর্মি কাল তাকে সন্ধ্যার পর বাসায় থাকতে

অনুরোধ করেছে। সেই ডিরেকটারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে না কি।

ঘাড় হেঁট করে' ভাবতে ভাবতে গলির পর গলি পার হতে লাগল কিরণ। দিবসের উপর বিশ্বাস হারিয়ে কেমন যেন দুর্বল বোধ করতে লাগল সে। নিজের অজ্ঞাতসারে দিবসের বলিষ্ঠ চরিত্রের উপর সে যেন অনেকখানি নির্ভর করেছিল। তার মনে হয়েছিল যে হতাশার অন্ধকারে সে পথ দেখতে পাচ্ছে না, দিবসের প্রাণবন্ত চরিত্র টর্চের মতো সে অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে' পথ আবিষ্কার করতে পারবে হয়তো। কিন্তু দিবস···।

কিরণ যখন দিবসের ঠিকানাটা সূর্য চৌধুরিকে দিয়ে গেল তখন নিচের ঘরে তিনি একাই ছিলেন। ঠিকানাটা দিয়েই কিরণ চলে গেল। সূর্য চৌধুরি চুপ করে' বসে রইলেন খানিকক্ষণ। অন্য লোক হলে হৈ চৈ করত কিন্তু তিনি নিঃশব্দে বসে' রইলেন। অকারণ হৈ চৈ করা স্বভাব নয় তাঁর। ঘণ্টু উঠুক তখন তাকে পাঠালেই হবে অসুখের খবরটা দিয়ে। ব্রজ বা গোবিন্দ সাণ্ডেল কাউকে কিছু বলবেন না ঠিক করলেন। উঠতে যাবেন এমন সময় হরলাল প্রবেশ করলেন এসে।

"দিবুবাবুর খবর পেলেন ?"

"পেয়েছি।"

"যাক বাঁচা গেল।"

এর বেশি কিছু বলতে হরলাল আর সহসা করলেন না।

তারপর নিজের কথা পাড়লেন।

"আমি কি করব তাহলে বলুন। চুনীবাবু চিঠির যখন কোনও উত্তর দেন নি তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করলে কি লাভ হবে কিছু ? আপনি

যে সাক্ষী যোগাড় করতে বলেছিলেন তা আমি করেছি, কেসটা ফাইলই করে' দেবেন না কি তাহলে ?"

গোবিন্দ সাণ্ডেলও ঢুকলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

"আবার কোর্টে বেরুচ্ছ না কি তুমি ?"

"না। তুমি একটি কাজ কর দিকি ভাই। চুনীবাবু তো তোমার পরিচিত লোক বলছিলে। এঁর সঙ্গেই তাঁর মকোদ্দমা হবার উপক্রম হয়েছে। এখনও টাকাটা দেন নি তিনি! ভদ্রলোক সত্যি যদি টাকাটা দিয়ে দিতে চান তাহলে আর মকোদ্দমার হাঙ্গামা করতে হয় না। তুমি একবার বলে' দেখ না তাঁকে। হরলালবাবুকে সঙ্গে নিয়েই যাও তুমি।"

গোবিন্দ সাণ্ডেল জাতীয় বেকার লোকেদের স্বকীয় কোন কাজ থাকে না। তাঁরা ক্রমাগত বনের মোষ খুঁজে বেড়ান তাড়িয়ে সময়-ক্ষেপ করবার জন্য। দিবসের পুরাতন প্রসঙ্গটা নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন বলেই তিনি এসেছিলেন। এই নূতন ব্যাপারটিতে সংশ্লিষ্ট হ'তে পেরে তিনি খুশি হলেন। হরলালবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "বেশ চলুন তাহলে। আমার ধারণা চুনী আপনার টাকা দিয়ে দিয়েছে। এখনও দেয় নি ?"

"আজ্ঞে না। আমি চিঠি লিখেছিলাম তার উত্তর পর্যন্ত দেয় নি।"

"কালটি যে কলি, সেটি খেয়াল আছে!"—চোখ নাচিয়ে হরলালের দিকে চাইলেন তিনি—"চলুন, দেরি করলে আবার সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বে হয়তো।"

"চলুন।"

দু'জনে চলে যাওয়াতে সূর্য চৌধুরি মনে মনে আরাম বোধ করলেন।

দিবসের সন্ধান পাওয়া গেছে শুনে ঘণ্টু আনন্দিত হল না। সে একটু বিস্মিত হ'ল, দমেও গেল। ইতিমধ্যে তার আকাশ কুসুমে

অনেক রঙ অনেক সুষমা বিস্তার করেছিল। জটিল গাঙুলীর সঙ্গে তার দেখাও হয়েছিল আরও বার কয়েক। দিবস আর আসবে না এইটে ধরে' নিয়েই মনে মনে সে প্ল্যাস্‌টিকের প্রকাণ্ড কারবার-কাব্য ফেঁদে বসেছিল। দিবসের সন্ধান পাওয়া গেছে এই খবরটাতে তার কাব্যে বেশ ছন্দ-পতন হ'ল। জটিল গাঙুলীর উপদেশ মনে পড়ল তার। মামার টাকার উপরই যদি তাকে নির্ভর করতে হয় তাহলে তার চেষ্টা করা উচিত দিবস যাতে আর না আসে। কিন্তু সে চেষ্টা যে কি করে' করবে তা সে ভেবে পাচ্ছিল না। যাই হোক মামার আদেশে দুর্গা-নাম স্মরণ করে' সে বেরিয়ে পড়ল দিবসের উদ্দেশে। রাস্তায় যেতে যেতে ভাবতে লাগল দিবুদাকে এমন কি বলা যেতে পারে যাতে সে আসবে না। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল একটা।

…দিবস আর রঙ্গনা চা খাচ্ছিল গরম সিঙাড়া-সহযোগে।

দিবস বলছিল—"তুমি যে পালিয়ে এসেছ, পালিয়ে আসতে পেরেছ, এতে আমি যে কত খুশি হয়েছি তা তোমাকে বলে' বোঝাতে পারব না। এই তো চাই। নাকে কাঁদলে পণ প্রথা উঠবে না, কোনও কুপ্রথাই উঠবে না। তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে হবে।"

"দাঁড়িয়েছি তো। এইবার কি করব বলুন ?"

"কাজ কর। নিজের পায়ে দাঁড়াও এইবার।"

"থাকব কোথায় ?"

"কেন, এইখানে।"

"আপনার সঙ্গে ?"

"তাতে ক্ষতি কি! মেয়েদের সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যে অশুচি ধারণা আছে তা দূর করবার দায়িত্ব তো তোমাদেরই। সকলের

চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দাও যে যে-কোনও অবস্থায় আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার ক্ষমতা তোমাদের আছে।"

"তারপর?"

"একটা কাজ যোগাড় করে' রোজকার করতে লেগে যাও।"

"কি কাজ?"

"যে-কোনও কাজ। সৌদামিনী একটা ঝি-গিরি যোগাড় করে' দিতে পারবে।"

"ও কাজ আমি পারব না।"

"পারবে না কেন? সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের ঘরে-ঘরে মেয়েরা ঝি-গিরিই তো করছে। তোমার যদি গরীবের ঘরে বিয়ে হয় ঝি-গিরিই তো করতে হবে তোমাকেও। পারবে না কেন?"

"না, আমি পারব না। অন্য কিছু ভাবুন একটা।"

মেয়েদের পক্ষে কি কি কাজ করা সম্ভব ভাবতে গিয়ে সৌরেন ডাক্তারের কথা মনে পড়ে গেল দিবসের।

"হয়েছে"—সোৎসাহে বলে উঠল দিবস।

"কি?"

ঠিক এই সময়ে ঘণ্টু এসে হাজির হল দ্বারপ্রান্তে।

"দিবুদা আছেন?"

"আরে, ঘণ্টু যে, কি খবর?"

ঘণ্টু আড়চোখে রঙ্গনার দিকে চেয়ে একটু সংকুচিত হয়ে পড়ল। মনে মনে বলল—ও বাবা, এ কি কাণ্ড! সারাটা পথ সে যে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এসেছিল সেটা এখানে প্রকাশ করা সংগত হবে কি না দ্বিধা জাগল তার মনে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে হল, 'না এই তো ঠিক হয়েছে, এইখানেই ও সুর জমবে ভাল'। দিবসের প্রতি তার শ্রদ্ধাটা হঠাৎ যেন হু হু করে' কমে গেল। মিথ্যা কথা বলে'

দিবসকে ঠকাতে এসেছে এটাও আর তত অন্যায় বলে' মনে হল না।

মৃদু হেসে ঘণ্টু বললে, "আপনাকে ডাকতে এসেছি।"

দিবস রঙ্গনা দু'জনেরই মুখ শুকিয়ে গেল।

"কে ডাকছে?"

"মামাবাবু।"

"কেন, কিছু বলেছেন?"

ঘণ্টু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আপনার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে এক জায়গায়"—বলেই আবার হাসলে সে।

"তাই না কি?"

"হ্যাঁ। মোটা পণ দেবে তারা। মেয়েটি কিন্তু ঘোর কালো।"

রঙ্গনার দিকে আড়চোখে চাইলে সে একবার। রঙ্গনার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। দিবস চুপ করে' রইল। অপমানে তার মাথা নুয়ে পড়ছিল। তার বাবা…আর ভাবতে পারছিল না সে।

"বাবাকে বলে দাও গিয়ে যে আমি যাব না।"

ঘণ্টু আবার একটু হেসে বললে, "তা আমি জানতাম। যাওয়া উচিতও নয়। তাহলে আপনি এক কলম লিখে দিন। না হলে মামাবাবু হয়তো ভাববেন যে আমি খবর দিই নি আপনাকে। বেশি কিছু নয়—ঘণ্টুর মুখে সব শুনলাম, আমি যাব না, আমাকে ক্ষমা করবেন। বাস্।"

দিবস উঠে গিয়ে খস খস করে' ঐ কথাগুলোই লিখে দিলে একটা কাগজে। কাগজটা নিয়ে ঘণ্টু বেরিয়ে গেল। ঘণ্টু চলে যাবার পর একটা নিবিড় নীরবতা ঘনিয়ে এল ঘরটার মধ্যে। চুপ করে' বসে রইল দু'জনে।

"আমাদের কিন্তু এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়, আপনার বাবা হয়তো এসে পড়বেন এখনই"—রঙ্গনাই কথা কইলে প্রথমে।

"পড়লেনই বা। আমরা এমন কোনও অন্যায় কাজ করি নি যার জন্যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে।"

"তিনি এসে যদি জোর করে' ধরে' নিয়ে যান ?"

"তা তিনি পারবেন না।"

রঙ্গনা চুপ করে' রইল।

"আমি এখন কি করি বলুন তো ? কি যে একটা বলছিলেন—"

"নার্স হতে পারবে ? তাহলে সৌরেনের ক্লিনিকে ঢুকিয়ে দিতে পারি তোমাকে। যক্ষ্মা রুগীর সেবা করতে হবে।"

"আমার বড্ড ভয় করে ও সব রোগকে।"

"বাসন মাজতে পারবে না, নার্স হতে পারবে না, কি পারবে তাহলে !"

ধমক খেয়ে অপ্রতিভ হয়ে পড়ল রঙ্গনা। তার অপ্রতিভ মুখ অসহায় চোখের দৃষ্টি নীরব আর্ত ভাষায় যেন বলে উঠল—বোকো না অমন করে' বোকো না, সত্যিই বড় দুর্বল, বড় অসহায় আমি। রঙ্গনার মুখের দিকে চেয়ে দিবসের কেমন যেন কষ্ট হতে লাগল। অবর্ণনীয় একটা কষ্ট। তার মনে হ'তে লাগল ক্ষতবিক্ষত বাণবিদ্ধ একটা পাখিকে ধমক দিয়ে সে যেন আকাশের মহিমা বোঝাতে চাইছে। আকাশের মহিমা ও জানে, কিন্তু ওর পক্ষ যে অবশ। ও উড়তে চাইছে, কিন্তু পারছে না।

"কোনও স্কুলে শিক্ষয়িত্রী হ'তে পারি। আপনার জানাশোনা যদি কেউ থাকে—"

"মনে তো পড়ছে না। আচ্ছা দেখি ভেবে। সৌরেনের ক্লিনিকে কিন্তু ঢুকলে পারতে। সে লোক খুব ভাল। পঁচাত্তর টাকা করে' মাইনেও দেবে। যক্ষ্মাকে এত ভয় কেন ? যক্ষ্মার বীজাণু তো সকলেরই ভিতর আছে ডাক্তাররা বলে।"

"তাই না কি ?"

"বলে তো। না-ও যদি থাকত তাহলেই বা ভয় কি? মরতে তো হবেই একদিন। আর্তের সেবা করতে গিয়ে যদি মরেই যাও, তাতেই বা কি। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নাম শুনেছ? নকর কুণ্ডুর? তুমি যে ওদের দলে যেতে ভয় পাবে এ আমার কল্পনার অতীত ছিল।"

রঙ্গনা হেসে বললে, "আপনাদের কল্পনা কল্পনা-বিলাস। যা কল্পনা করে' সুখ পান তাই কল্পনা করেন। আমাদের সুখ দুঃখের কথা সত্যি যদি ভাবতেন ও রকম উদ্ভট কল্পনা করতেন না।"

অপ্রত্যাশিত আঘাতটা পেয়ে দিবস একটু বিস্মিত হল। রঙ্গনার যে অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত দেওয়ার ক্ষমতা আছে তার পরিচয় আগেও পেয়েছিল সে। আহত হয়েই তার সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছিল তার। এখন রঙ্গনার কথাটা শুনে তার মনে হল তাই কি? নিজের কল্পনাকে পুলকিত করবার জন্যেই কি সে তাকে মারাত্মক যক্ষ্মারোগের মুখে ঠেলে দিতে চাইছে? ওর শুভাশুভের চেয়ে নিজের আত্ম-বিনোদনটাই কি বড় হয়ে উঠেছে না কি! রঙ্গনা একটা মহৎ আদর্শের জন্যে যদি নিজেকে বলি দেয় তাতে সত্যিই তার আত্মবিনোদ হবে না কি? হবে। কেন হবে ভাবতে গিয়েই কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল এবং গোলমাল হয়ে গেল বলেই এর পর যা সে বলল তা এলোমেলো গোছের শোনাল।

"আমার সুখ দুঃখের সঙ্গে তোমার সুখ দুঃখটা কেমন যেন জট পাকিয়ে গেছে মনে হচ্ছে। তাই নিজে আমি যা করে' সুখ পেতাম তোমার জন্যেও তাই ব্যবস্থা করছি। হয়তো সেটা ভুল—"

যে কথাটা জানবার জন্যে রঙ্গনার অন্তরাত্মা এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল তার আভাস পেয়ে রঙ্গনার মুখের চেহারা বদলে গেল।

"বেশ বেশ তাই হবে। সৌরেনবাবুর কাছেই চলুন। তিনি যদি নার্সের চাকরিটা দেন তাই করব।"

অপূর্ব হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ।

"উঠুন। বসে আছেন যে!"

"সত্যিই যেতে চাও, না রাগ করে' বলছ?"

"সত্যিই যেতে চাই। কি মনে করেন আপনি আমাকে? ঠাট্টা করে' একটা কথা বললুম আর অমনি সেটা সত্যি বলে' ধরে' নিলেন! চলুন, যাওয়া যাক।"

"চল। আমাকে বাজারেও ঘুরতে হবে একটু। কাপড় চোপড় কিনতে হবে কিছু।"

"এখন কাপড় চোপড় কিনবেন?"

"হ্যাঁ। ও, একটা কথা তোমাকে বলিনি এখনও। দু'একদিনের মধ্যেই আমি লম্বা পাড়ি দিচ্ছি।"

"কোথায়?"

"লণ্ডন।"

রঙ্গনার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল আবার।

"লণ্ডন? মানে?"

"চল রাস্তায় যেতে যেতে বলছি। প্রায় আরব্য উপন্যাসের গল্পের মতো।"

দু'জনে বেরিয়ে পড়ল।

সূর্য চৌধুরির মুখটা ঠিক পাথরের মুখের মতো মনে হচ্ছিল। দিবসের চিঠিটার দিকে তিনি নির্নিমেষে চেয়ে ছিলেন। সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ঘণ্টু। চিঠি থেকে চোখ তুলে ঘণ্টুর দিকে চাইলেন তিনি আবার।

"আমার অসুখের কথা বলেছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

আবার চিঠির দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

"ঘরে যে মেয়েটি বসেছিল কত বয়স হবে তার ?"

"আঠার উনিশ।"

ঘণ্টু স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আবার একটু বললে, "মনে হল একসঙ্গে বাস করছে ওরা।"

"আচ্ছা তুমি যাও।"

ঘণ্টু চলে গেল। নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন সূর্য চৌধুরি। দিবু না আসতে পারে—কিন্তু ওই মেয়েটি কে? হয়তো পাড়ার কেউ। আজকালকার মেয়েরা তো……। সোরগোল করতে করতে গোবিন্দ সাণ্ডেল এসে ঢুকলেন।

"ওহে শুনছ, চুনীর মুখে যা শুনলুম তাতো ভয়ানক !"

"কি ?"

"চুনীর ভাগ্নীটিকে নিয়ে দিবস না কি সরেছে।"

"কি রকম ?"

"চুনীর ভগ্নীপতির কাছে দিবস সরোদ শিখতে যেত—"

সমস্ত ঘটনাটা সাড়ম্বরে বর্ণনা করতে লাগলেন সাণ্ডেল মশাই।

সূর্য চৌধুরি নিস্তব্ধ হয়ে শুনে গেলেন সব। গোবিন্দ সাণ্ডেলের সমস্ত শ্লেষ সহ্য করলেন নীরবে। একটি কথাও বললেন না। বক্তব্য শেষ করে' নানারকম উপদেশ দিয়ে গীতার বচন আউড়ে সাণ্ডেল মশাই চলে গেলেন অবশেষে। সূর্যকান্ত ধীরে ধীরে উঠে বাইরে এলেন। ড্রাইভারকে বললেন মোটরটা বার করতে। নিজের চোখে না দেখলে এ অবিশ্বাস্য কথা বিশ্বাস করবেন না তিনি।…দিবসের বাসায় এসে কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। দিবস তখনও বাজার থেকে ফেরে নি! খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে সূর্য চৌধুরি আবার বাড়ি ফিরে এলেন।

ঊর্মির আগ্রহে মেট্রোতে আসতে হয়েছিল কিরণকে। সেইখানেই

সিনেমা ডিরেকটারের সঙ্গে কিরণের আলাপ হল। সিনেমাও দেখতে হল।

সিনেমার পর উর্মি বললে, "চলুন মাঠে গিয়ে বসা যাক একটু।"

কিরণ যন্ত্রচালিতবৎ উর্মির অনুসরণ করছিল। উর্মির মুখে রঙ্গনার অন্তর্ধানের কথা শুনে (এবং সকালে রঙ্গনাকে দিবসের বাসায় দেখে) তার সমস্ত সত্তা যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। উর্মির সংসর্গে নিজের অনুরূপ অধঃপতনের আশঙ্কায় তার অন্তরাত্মা সজাগ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কিছুতেই সে নিজেকে উর্মির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারছিল না।

একটু নির্জন স্থান দেখে উর্মি বললে, "আসুন এইখানে বসা যাক।"

"বাড়ি ফিরলে হত না?"

"বসুনই না একটু!"

কিরণ বসে পড়ল।

উর্মি বললে, "সেই যে সেদিন আপনাকে বলছিলাম হাতীবাগানে ছোট্ট বাসার সন্ধান পেয়েছি একটা, কাল চলুন সেটা দেখে আসা যাক, আশি টাকা ভাড়া চাইছে, তা আমাদের দু'জনের আয় মিলিয়ে দিতে পারব না? এই ছবিটা যতদিন চলবে ততদিন আমি একাই চালাতে পারব সমস্ত, আপনার মাইনেটা জমিয়ে রাখা যাবে, কি বলেন? চমৎকার বাসাটি, দক্ষিণ দিক খোলা, সদর রাস্তা থেকে দূরেও আছে বেশী গোলমাল নেই, আপনার কবিতা লেখার সুবিধে হবে"—উর্মি থামতে চাইছিল না কিছুতে, তার ভয় হচ্ছিল থামলেই কিরণ প্রতিবাদ করবে, তা কিছুতেই হতে দেবে না উর্মি, কিরণকে তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সে, ওই এঁদো গলিতে খোলার ঘরে কিছুতেই সে থাকতে দেবে না কিরণকে—"আপনার যদি পছন্দ না হয় আর একটা বাড়িও দেখে রেখেছি আমি বেহালা অঞ্চলে, বড্ড দূর হবে সেটা কিন্তু, নয়?"

কিরণ চুপ করে' বসেছিল।

"কথা বলছেন না যে?"

"একটা কবিতা ভাবছি।"

"কবিতা পরে ভাববেন আগে আমার কথার উত্তর দিন। কাল সকালে হাতীবাগানের বাসাটা দেখবেন তো?"

"কবিতাটা শোন আগে"

"বলুন।"

"যে ফুল ফোটেনি কভু স্বপ্নে তারে চাও
যে গান গাহে নি কেহ স্বপ্নে তাহা গাও
কল্পনার কুস্কুমে
বাস্তবের ধূলি ধূমে
কেন সখি বৃথাই লুটাও
আকাশ-কুসুম দল
আকাশেই সমুজ্জ্বল
আকাশ-মর্যাদা তারে দাও"

"এর মানে কি—"

"আমি উঠলুম।"

হঠাৎ আত্মস্থ হয়ে কিরণ উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ যেন নিজেকে ফিরে পেল সে।

"হাতীবাগানের বাসাটা দেখবেন না কাল?"

"না।"

"কবে দেখবেন?"

"আমার দেখবার দরকার কি? তুমি থাকবে তুমিই দেখ।"

"এক সঙ্গেই থাকি চলুন না ছ'জনে।"

"তা হয় না। সবাই দিবস নয়। আমি চলি।"

কিরণ চলতে শুরু করল। এর পর উর্মির চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হাস্যদীপ্ত হয়ে উঠল।

"কিরণ দা একটা কথা শুনে যান।"

কিরণ ফিরে দেখলে একটা অদ্ভুত হাসিতে উর্মির সমস্ত মুখ ঝলমল করছে।

"আপনি দিবস নন তা জানি বলেই আপনার সঙ্গে থাকতে চাচ্ছি। অন্য রকম মনে করলে চাইতাম না। আপনি আমাকে এত খোলা মনে করলেন কেন বলুন তো?"

কিরণ ক্ষণকাল তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর হঠাৎ ঘুরে চলতে শুরু করে' দিলে। উর্মি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কিরণ চলে যাচ্ছে। ক্রমশ ভিড়ে মিলিয়ে গেল সে। আর তাকে দেখা গেল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যদিও সূর্যকান্ত কিছু বলেন নি তবু ব্রজ টের পেয়ে গেল যে দিবসের ঠিকানাটা পাওয়া গেছে। ঘণ্টুই বলেছিল তাকে। ঘণ্টুর উদ্দেশ্য ছিল ব্রজর কাছে দিবসের কুকীর্তি ঘোষণা করে' ব্রজকে নিজের দলে টানা। কিন্তু হয়ে গেল অন্য রকম। ব্রজর মনে হল দিবসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে একটা। সূর্যকান্তর সঙ্গে এ সম্বন্ধে হেস্তনেস্ত করবার জন্যে হন হন করে' দোতালায় উঠে গেল সে। কপাট ঠেলে ঘরে ঢুকতে গিয়ে কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। ঘরের ভিতরে গোবিন্দ সাণ্ডেল এবং সূর্যকান্ত দিবসের বিষয়েই কি বলছে যেন। ব্রজ আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল।

গোবিন্দ সাণ্ডেল বলছিলেন—"আমি যা বলছি তাই করে' দেখ না। ওকে খবর দাও যে অবিলম্বে না ফিরে এলে বিষয় সম্পত্তি সব ঘণ্টুকে দিয়ে দেব।"

"উইল করেছি আমি একটা"

"ওই খবরটি এবার পাঠাও তার কাছে।"

"বেশ, ঘণ্টুকে আবার পাঠাই তাহলে!"

ব্রজ ঘরে ঢুকল নাটকীয় ভাবে।

"এবার ঘণ্টু যাবে না, আমি যাব।"

ব্রজ গিয়ে পৌছবার আগেই রঙ্গনা চলে গিয়েছিল অতসী ক্লিনিকে। দিবস একটা সুটকেসে জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল।

"দিবু, দিবু, ও দিবু, দিবু"—ডাক শুনে দিবস চমকে উঠল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পরদিন হরিদাসবাবুর মনে হল যাত্রার প্রাক্কালে দিবসকে একটা ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু তখনই আবার মনে হল দিবসের ঠিকানাটা তো তিনি জানেন না। দিবস তাকে যে হ্যাণ্ডনোটটা লিখে দিয়েছিল সেটা খুলে দেখলেন, তাতে তার বাড়ির ঠিকানাটা দেওয়া রয়েছে। কেয়ার অফ সূর্যকান্ত চৌধুরি যখন লেখা আছে তখন ওটা বাড়ির ঠিকানাই। ও ঠিকানায় কি দিবস আছে? থাকবার কথা নয়, তবু একবার চেষ্টা করা উচিত।

সূর্য চৌধুরি নিচের ঘরেই বসেছিলেন। হরিদাসবাবু এসে প্রবেশ করলেন।

"দিবসবাবুর কি এই বাড়ি?"

"হ্যাঁ। দিবস কিন্তু বাড়িতে নেই। কি দরকার আপনার?"

"আজকের প্লেনে তাঁর বম্বে যাবার কথা, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। বম্বে থেকে তিনি বিলেত যাবেন।"

ইচ্ছে করেই খবরটা দিলেন হরিদাসবাবু। তাঁর মনে হল খবরটা পেলে অকারণ দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবেন ভদ্রলোক। সূর্য চৌধুরি যে দিবসের বাবা তা চেহারা থেকেই অনুমান করেছিলেন তিনি।

"বিলেত যাবে? আজকের প্লেনে বম্বে যাচ্ছে?"

আকাশ থেকে পড়লেন সূর্য চৌধুরি।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ঠিক জানেন আপনি?"

"ঠিক জানি।"

ক্ষণকাল চুপ করে' থেকে সূর্যকান্ত বললেন, "ক'টায় প্লেন ছাড়বে জানেন ?"

"তা ঠিক জানি না। এরোড্রোমে গিয়ে সে খবরটা নিতে হয়।"

"চলুন তাই যাওয়া যাক।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলেন গোবিন্দ সাণ্ডেল গহনচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে।

সাণ্ডেল মশাই পরিচয় করিয়ে দিলেন, "ইনিই দিবসের ওস্তাদ। এঁর কাছেই দিবস সরোদ শিখত। সব কথা ওঁকে বলেছি আমি।"

"দিবু এই প্লেনেই বিয়েত যাচ্ছে না কি। চল তার সঙ্গে দেখাটা করে আসি। ক'টায় ছাড়ছে তাও তো জানি না। আচ্ছা চলতো, কোথাও থেকে ফোন করে' জেনে নিলেই হবে! আমার ফোনটা খারাপ হয়ে গেছে তা নাহলে এখান থেকেই ফোন করা যেত।"

দেখা কিন্তু হল না।

অনেক ঘোরাঘুরির পর সূর্যকান্তর মোটর যখন এরোড্রোমে পৌঁছল ঠিক তার একটু আগেই দিবসের প্লেনটা উড়েছে। অপস্রিয়মান প্লেনটার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। আবার পুত্রগর্বে তাঁর বুকটা ভরে' উঠল।

সমাপ্ত